হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাস-চিন্তা

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ☐ কলকাতা-৯

HARAPRASAD SHASTRIR

ITIHAS CHINTA

by Nikhileswar Sengupta

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ❑ ২০০০

প্রকাশক

শ্রীতপনকুমার ঘোষ

সাহিত্যশ্রী

৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড

কলকাতা - ৯

মুদ্রাকর

রামকৃষ্ণ প্রিন্টার্স

৬ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা - ৯

বর্ণ সংস্থাপন

মেরী প্রিন্টার্স

নৈহাটি

মা ও বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়সূচি

কুঞ্চিকা

স্মারকগ্রন্থ	*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ*, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৭৮
হ-র-সং-১	*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮০
হ-র-সং-২	*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮১
হ-র-সং-৩	*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮১
হ-র-সং-৪	*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*, চতুর্থ খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী ও নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৮১
As. Res.	*Asiatic Researches*
E.I.	*The Epigraphia Indica*
IA	*The Indian Antiquary*
IHQ	*The Indian Historical Quarterly*
JASB	*The Journal of the Asiatic Society of Bengal*
JBORS	*The Journal of the Bihar and Orissa Research Society*
Progs. ASB	*Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*

ভূমিকা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) সংস্কৃত-বিদ্যাজীবী রক্ষণশীল পণ্ডিত বংশের সন্তান। তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও পাশাপাশি সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা ছিল তাঁর প্রধান বিষয়। সৃজনমূলক রচনাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। হরপ্রসাদের সৃজনমূলক ও গবেষণাধর্মী রচনার মূল লক্ষ্য ছিল দেশ, সমাজ ও মানুষের পরিচয় অনুসন্ধান। এশিয়াটিক সোসাইটি ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র। তাঁর তত্ত্বাবধানে সেখান থেকে নানা বিষয়ের বহু প্রাচীন পুঁথি — যা ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গ্রাহ্য — আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া তিনি সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাকর্ম তাঁর সমসাময়িককালে যে নিরঙ্কুশ সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করেছিল তা নয়। উত্তরকালেও তাঁর গবেষণার ধারা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত তথ্যের ব্যাখ্যা অনেকেই মানেন নি। কিন্তু তাঁর গবেষণাকর্মকে একেবারে অস্বীকার করে পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদ্‌রা এগিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

ইংরেজদের তৈরি করা ছাঁচে হরপ্রসাদের রচনা আবদ্ধ থাকে নি। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল ঔপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের স্বপ্ন। ফলে তৈরি হয়েছিল উপনিবেশবাদী ইতিহাসের ছাঁচ। হরপ্রসাদ বারবার এই ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। এর মূলে ছিল তাঁর জাতীয়তাবোধ। তাঁর কালে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তার সঙ্গে হরপ্রসাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। তবে তাঁর রচনাবলীতে দেশীয় সমাজ ও মানুষের মূলানুসন্ধানের প্রয়াস লক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ রাজনীতির আওতার বাইরে থেকেও তিনি স্বদেশ ভাবনা ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা চালিত হয়েছেন। সেই সময়ের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্‌দের মতো তিনিও এশিয়াটিক সোসাইটির সীমবদ্ধতার বাইরে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে ইতিহাস-চর্চায় স্বাতন্ত্র্য গড়তে চেয়েছেন। এই ব্রিটিশ ছাঁচের ও প্রশাসনিক আওতার বাইরে কাজ করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ (১৩০০ ব.)। এখানে তাঁর কাজের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা।

ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার পর্বপর্বান্তরের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির যে নিরন্তর রূপান্তর ঘটেছে তাতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্‌দের লক্ষণীয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে অনেক নতুন তথ্যের আবিষ্কার ও অনুপুঙ্খ নতুন ব্যাখ্যা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ ইতিহাসবিদ্‌দের রচনা আজও গুরুত্ব হারায় নি; তেমনি হরপ্রসাদের ইতিহাস-চিন্তার গুরুত্বও আজ অস্বীকার করা

যায় না। তিনি তাঁর সমসাময়িককালেও স্বীকৃতি পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভারততত্ত্ববিদ্গণ তার কাছে নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন বারবার।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাষা ও সাহিত্যের অন্বেষণ, ব্যাকরণের ইতিহাস-চর্চা, বৌদ্ধ বিদ্যা-চর্চা — সমস্ত কিছুই তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। সামাজিক ইতিহাস অন্বেষণই তাঁর লক্ষ্য। বৌদ্ধ বিদ্যা-চর্চা করতে গিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, বাংলা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের দেশ।

হরপ্রসাদের সমসাময়িক কাল জাতীয়তাবাদী চেতনার কাল। সেই সময় গড়ে উঠেছে স্বদেশি আন্দোলন, বিস্তার লাভ করেছে স্বাধীনতা আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যখন গোটা দেশ উত্তাল, সে সময় হরপ্রসাদ সরকারি চাকুরি করেছেন। সরকারি নানা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছেন, প্রত্যক্ষ রাজনীতির বাইরে থেকেছেন। তিনি তাঁর সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী রচনার মধ্য দিয়ে স্বদেশের সেবা করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্চার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকেছি। 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাস-চিন্তা' অভিসন্দর্ভটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত (১৯৯১) হয়। এই কাজে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান বইটি উক্ত অভিসন্দর্ভের পুনর্লিখিত রূপ। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই । এই সঙ্গে স্মরণ করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রয়াত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে, যিনি এই বইটির জন্য নিয়তই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানাই । কৃতজ্ঞতা জানাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদারকে। বন্ধু অধ্যাপক গৌতম নিয়োগী, ড. বিজলি সরকার ও শ্রী উদয়শঙ্কর কবিরাজ নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র টাউন লাইব্রেরি, নৈহাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই সংস্থাগুলির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ সাহিত্যশ্রী-র কর্ণধার শ্রীতপনকুমার ঘোষ এবং বর্ণসংস্থাপক মেরী প্রিন্টার্স-র প্রতি।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত
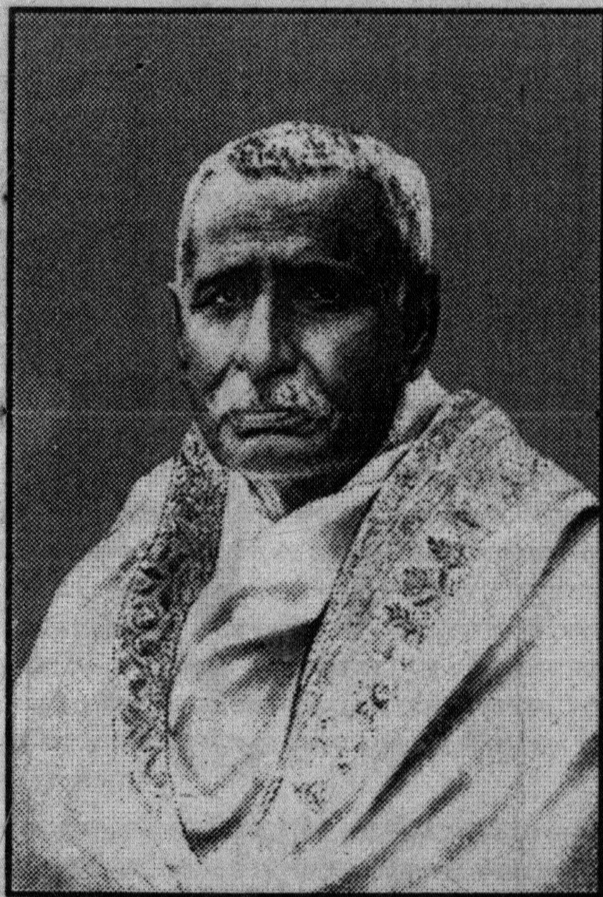
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ❏ ১৮৫৩-১৯৩১

প্রথম অধ্যায়

জীবন-কথা

প্রশাসনিক কাজের স্বার্থে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে দেশীয় পণ্ডিত সমাজের একাংশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, মাণিক্য তর্কভূষণ প্রমুখ। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম জোন্সের অনুরোধে ব্যবহার শাস্ত্রের নানা মতের সামঞ্জস্যসাধন করে *বিবাদ ভঙ্গার্ণব* (১৭৯২) নামে একটি বই লেখেন। এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ — *এ ডাইজেস্ট অব হিন্দু ল অন কনট্রাক্ট অ্যান্ড সাকসেসন* (১৭৯৮) — করেন হেনরি টমাস কোলব্রুক। মাণিক্য তর্কভূষণের সঙ্গেও জোন্সের যোগাযোগ ছিল। তিনি জোন্সকে হিন্দু আইন বিষয়ে সাহায্য করতেন।[১]

এই ভাবে বিভিন্ন কাজ ও প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের সঙ্গে প্রশাসন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক তৈরি হয়। যোগাযোগ তৈরি হয় পশ্চিমি ভারততত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের। কারণ, টোলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্য ছাড়া সাহেব পণ্ডিতদের এগোনো সম্ভব ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একসময় বলেছিলেন যে, এ দেশের হতভাগ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মেধাকে পুঁজি করে তাঁরা প্রাচ্যতত্ত্বের বড়ো বড়ো পণ্ডিত হয়েছিলেন।[২] বিপুল পরিমাণে আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত সংস্কৃত পুথি পাঠ এবং বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় মেথডলজি প্রয়োগ করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে ইতিহাস চর্চার তত্ত্ব। কিন্তু সেই তত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাস-চর্চার পদ্ধতি দেশীয় পণ্ডিতদের অজানা ছিল। তাই হরপ্রসাদ বলেছেন, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উপযোগী করে তুলতে হবে। আর তাঁদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে ইতিহাস বোধ।[৩]

প্রাচ্যকে জানার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। ভারত তথা এশিয়ার সম্পদের খোঁজ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়া শক্ত করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রটির। এই উদ্দেশ্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত জোন্সের বক্তৃতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অর্থনৈতিক শোষণের ভিত্ দৃঢ় করার জন্য হিতবাদী (Utilitarian) দর্শনকে হাতিয়ার করে এগিয়েছে জেমস মিল প্রমুখ ইতিহাসবিদ্‌রা। মিল *হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া* (১৮১৭)-তে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসকে বিকৃত করে এঁকেছেন। তার পাশাপাশি তিনি দেখিয়েছেন ব্রিটিশ শাসনের মহত্ত্ব এবং ইংলন্ডের সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা। এই চিন্তার মূলে ছিল শিল্পবিপ্লবজাত ব্রিটিশ পুঁজির দাপট। হব্‌স্‌বম্ লিখেছেন যে, সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি ব্রিটেনের উপর নির্ভর করে

গড়ে উঠেছিল। সমসাময়িক বিশ্ব অর্থনীতিতে এর প্রভাব ছিল গভীর এবং অবস্থান ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক উঁচুতে ।[৪] বেন্থাম অনুগামী মিল ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভুত্বের যৌক্তিকতা তাঁর ইতিহাস বইয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এবং এই বইয়ের প্রভাব ইংরেজ আমলাদের উপর পড়েছিল। ইংরেজ-প্রভুত্ব প্রতিস্থাপনের নানা পন্থা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই রকমই একটি পন্থা মেকলের শিক্ষানীতি। তাঁর *মিনিটস্ অন এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া* (২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫)-তে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির দীন-হীন অবস্থা জোর করে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এই *মিনিটে* প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দম্ভ। কিন্তু তাঁর শিক্ষা-নীতির ওপর নির্ভর করেই ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষা-নীতি সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মনীষীরাও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমি আধুনিকতার স্রোত এ দেশে প্রবাহিত হোক। প্রাচ্যশিক্ষার গণ্ডির মধ্যে দেশ আবদ্ধ থাকুক, তা তাঁরা চান নি। এ দেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের সহায়তায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর মেকলের যুগান্তকারী মিনিটের আগেই এ দেশের মানুষের জন্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নব্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ (১৮১৭) তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতিতে ঝড় তুলেছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের যুক্তিবাদী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। ইয়োরোপীয় দর্শন সেকালের ছাত্রদের প্রভাবিত করেছিল। ফলে ঐতিহ্যবাহী অনড় হিন্দু-সমাজ মানসে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব পড়ল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রশাসনিক প্রচেষ্টা ছাড়াও সেকালের কিছু দেশি-বিদেশি পণ্ডিত পাশ্চাত্য সাহিত্য-ইতিহাস- দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করে তুলেছিলেন।

২

ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এলেন। তাঁর মননে লাগল আধুনিকতার স্পর্শ। তাঁর ইতিহাস দৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হলো। এর পিছনে তাঁর পারিবারিক দান কতটা, সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর চিন্তাধারাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তাও দেখা দরকার। সংস্কৃত বিদ্যাজীবী পণ্ডিতবংশে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো প্রবেশ করায় সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন ঘটে গেল। ফলে হরপ্রসাদের মধ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজি এই দুই শিক্ষাধারা তাঁর যুক্তিবাদী মনন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশিষ্টতা দান করেছে — তাঁকে ভারততত্ত্ববিদ হতে সাহায্য করেছে।

হরপ্রসাদের পূর্বপুরুষ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যালংকার খুব বড়ো শাস্ত্রজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। যশোহর জেলার নলডাঙার রাজা তাঁকে সভাপণ্ডিত করেছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যালংকারের সময় থেকেই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বাড়তে থাকে।[৫]

খুলনা জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) কুমিরা গ্রাম থেকে হরপ্রসাদের প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ উত্তর চব্বিশ পরগনার নৈহাটিতে এসে বসতি স্থাপন (১৭৫৭) করেন।[৬] কুমিরা গ্রামের জমিদারদের দেওয়া ভূসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কলকাতার কাছাকাছি নৈহাটি চলে আসার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে ? আধুনিক ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার উত্থানের জন্য ? নাকি সংস্কৃত বিদ্যাজীবী এই পরিবারটি কোনো জমিদারের আমন্ত্রণে এসেছিলেন ? কারণটি স্পষ্ট নয়। তবে মাণিক্যর এখানে চলে আসার ফলেই তাঁর উত্তর পুরুষেরা কলকাতার শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন।

মাণিক্য নৈহাটিতে টোল প্রতিষ্ঠা করেন। নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পঠন-পাঠনে এই টোলের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এখানে পাঠ নিতে আসতেন। খরচ চালানোর জন্য ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি দিয়েছিলেন হালিশহরের সাবর্ণ সন্তোষ রায়চৌধুরী এবং কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।[৭]

মাণিক্য তর্কভূষণের সঙ্গে কোম্পানি-সরকারের ঘনিষ্ঠসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, কারণ তিনি নিয়মিত হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা করে ইংরেজ বিচারকদের সাহায্য করতেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এবং বিশিষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলিয়ম জোন্সের সম্পর্ক ছিল।[৮] অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের

রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য; অর্থাৎ আর্থিক লাভালাভের প্রশ্ন। জ্ঞানচর্চা ছাড়াও ওয়ারেন হেস্টিংস এই দিকটির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। এ দেশের সম্পদ ব্রিটিশ বণিকদের আকৃষ্ট করেছিল। তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কুঠি নির্মাণ করে। তাদের সমস্ত কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ দেশে প্রতিষ্ঠিত নব্য শাসনতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং এদেশ থেকে আহরিত সম্পদ ব্রিটেনে চালান করা।[৯] আর সম্পদের বিষয়টি তো জোন্সের চোখে অনেক আগেই ধরা পড়েছিল, তাই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন, "....you will investigate whatever is rare in the stupendous fabric of nature, will correct the geography of *Asia* by new observations and discoveries ; will trace the annals, and even traditions, of those nations, who from time to time have peopled or disolated it ; and will bring to light their various forms of government, with their institutions civil and religious ; ....To this you will add researches into their agriculture, manufactures, trade ; and, whilst you enquire will pleasure into their musick, architecture, painting and poetry, will not neglect those inferior arts, by which the comforts and even elegances of social life are supplied or improved."[১০] সম্পদ বলতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ নয়; ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্মীয়, শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সমস্ত রকম সম্পদই হবে অনুসন্ধানের বিষয়।[১০] এই বিস্তৃত আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে যাঁরা পুরোধা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত পণ্ডিত ঘরের সন্তান মাণিক্যর নিত্য সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। সে যুগে তাঁর মতো গোঁড়ামি মুক্ত পণ্ডিত বিরল।[১১]

মাণিক্যর ছেলেরা নৈহাটির টোলে নব্য-ন্যায়ের চর্চা করতেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীনাথ তর্কালংকার প্রখর মেধাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীনাথ ৩০/৩২ বৎসর বয়সে দস্যু হাতে মারা যান। "বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রের অতর্কিত মৃত্যুতে ২/১ মাসের মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীনাথের স্ত্রীও পতিশোক সহ্য করিতে না পারিয়া চার বছরের একটি ছেলে রাখিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।[১২]

শ্রীনাথ তর্কালংকারের একমাত্র ছেলে রামকমল ন্যায়রত্ন তাঁর কাকা-জ্যেঠাদের যত্নে পড়াশুনো করেন। এবং তিনি সেকালের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হয়েছিলেন। "He had a phenomenal memory and by his extraordinary scholarship he could mercilessly controvert the tenet of the other sastras from the point of view of Navyanyaya."[১৩] তাঁর সঙ্গে শ্রীনাথের সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু রামমাণিক্য বিদ্যালংকারের মেয়ে চন্দ্রমণির বিয়ে হয় (১২ বৈশাখ, ১২৩৩ ব.)। রামমাণিক্য সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।[১৪] রামমাণিক্যর সঙ্গে আধুনিক

শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনের যোগাযোগ ছিল। প্রথমে বরিশালের কলসকাঠি গ্রামে এবং পরে বরাহনগরে টোল স্থাপন করে তিনি অনেক ছাত্র পড়িয়েছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয় সংস্কৃত কলেজের অভিজ্ঞতা। "১৮৪৫ সালের মে মাসে তিনি ঐ পদ [অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি] পান এবং ১৮৪৬ সালের বারুণীর দিন ২৬ মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়।"[১৫]

রামকমলের ছয় ছেলে—নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু, রঘুনাথ, যদুনাথ, শরৎনাথ (হরপ্রসাদ), মেঘনাথ—বিদ্যাচর্চায় নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে "হেমনাথ অবিবাহিত অবস্থায় ১৬/১৭ বৎসরে মারা যান।"[১৬] নন্দকুমার ছাড়া অন্যান্য ছেলেরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী টোল শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে তাঁরা নিজেদের আর আবদ্ধ রাখেন নি। নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুকে "বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ও বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ রায় প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিবর্গ ন্যায়চুঞ্চু উপাধির পরিবর্তে তর্করত্ন উপাধি দিয়াছেন।[১৭]

নন্দকুমার খুব অল্প বয়সেই শ্রীরাম শিরোমণি, গোলকচন্দ্র ন্যায়রত্ন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাস্ত করে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কিন্তু একবার একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে তিনি বর্ধমান রাজের সভা পণ্ডিতি ছেড়ে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, বর্ধমানের মহারাজা মহাতব চাঁদ একবার ন্যায়শাস্ত্রের বিতর্কে অংশ গ্রহণের জন্য নন্দকুমার ও নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণিকে আহ্বান করেন। বিচারক নিযুক্ত হন রামকমল ন্যায়রত্ন। তাতে নন্দকুমারের আপত্তি ছিল এবং প্রকাশ্যে তিনি প্রতিবাদও করেছিলেন। শ্রীরাম শিরোমণি ইতোপূর্বে নন্দকুমারের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই সভাতেও নন্দকুমার অকাট্য যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করলেও রামকমল শ্রীরাম শিরোমণিকেই জয়ী বলে ঘোষণা করেন। নন্দকুমার রামকমলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভাতেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেন। এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতির পেশা পরিত্যাগ করেন।[১৮]

নন্দকুমার বর্ধমান-রাজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্ধমান ত্যাগ করেন এবং প্রথমে সংস্কৃত কলেজ ও পরে কান্দি স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষক হন। তাঁর এই চাকুরি দুটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় তিনি ইংরেজিও শিখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৫১-৫৮) তখন "তিনি বুঝিতে পারেন যে পূর্ব্বেকার শিক্ষা-পদ্ধতিতে আর জীবিকা অর্জন সম্ভব হইবে না।"[১৯] সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৪) আগেই ১১ ডিসেম্বর ১৮২৩ সালে রামমোহন রায় বড়ো লাট আমহার্স্টকে একটি দীর্ঘপত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন যে, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার অন্যতম পরিকল্পিত ব্যবস্থা হলো এই দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখতে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা। দেশীয় জনসাধারণের উন্নতি করাই যদি সরকারের লক্ষ্য হয় তবে

জ্ঞানদীপ্ত মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই সঙ্গত হবে। গণিত, দর্শন, রসায়ন, অঙ্গবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান পড়তে হবে। এই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বইপত্র ও শিক্ষার আধুনিক সরঞ্জাম।[২০] রামমোহনের যুক্তি সরকার তখন গ্রহণ করেনি। সংস্কৃত-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু কয়েক বছর পর মেকলের শিক্ষা নীতিই সরকারি শিক্ষানীতি হিসাবে গৃহীত হলো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচিতে আধুনিক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের আর্জি জানিয়েছিলেন (১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০) কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর সেক্রেটারি এফ. জে. মউয়াটকে। শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য -অলংকার-প্রাচ্যদর্শন চর্চার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো অত্যন্ত জরুরি মনে করেছিলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো আধুনিক মনস্ক মানুষেরা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইংরেজি শিখেছেন কখনো শুধুই বিদ্যাচর্চার জন্য, আবার কখনো সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সংস্কৃতসেবী পণ্ডিত বংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলত বিদ্যাজীবী পণ্ডিত হিসেবে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের মতো আধুনিক মনস্ক কুসংস্কারমুক্ত মানুষের সঙ্গে নন্দকুমার ও হরপ্রসাদের সম্পর্ক তাঁদের পরিবারে কিছুটা মুক্ত আলো এনে দিয়েছিল। রামকমল ও নন্দকুমারের মৃত্যুতে আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। অর্থ সংস্থানের উপায় ও নতুন যুগের প্রতি আকর্ষণে এই পরিবার পাশ্চাত্য ভাবধারার দিকে ঝুঁকেছিল। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ১৮৬২ থেকেই এই পরিবারের পাশ্চাত্যমুখীনতার সূত্রপাত। পরিবারের সদস্যদের নতুন নতুন চাহিদা বাড়তে থাকে। তাঁরা আর তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতো ধুতি-চাদর-খড়ম নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠা চাহিদা মেটাতে তাঁরা ইংরেজি-শিক্ষার পিছনে ছুটলেন, ধুতি চাদরের জায়গায় এল কোট, প্যান্ট, টুপি ও জুতো। [২১] রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের "নিকট লেখকের কাজও করিয়াছিলেন।"[২২] পরে তিনি দেরাদুন টি কোম্পানি, সেখান থেকে দেরাদুন সেটেল্‌মেন্টের হেডক্লার্ক (১৮৮৬), এবং টিহিরি এস্টেটের 'সেক্রেটারি টু দ্য দরবার' পর্যন্ত হয়েছিল।[২৩] আর রামকমলের তৃতীয় পুত্র যদুনাথও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং তিনি দেরাদুন-এ নাহান এস্টেটের চৌহরপুরে চা বাগানের ম্যানেজার হন। [২৪] ছোট ছেলে মেঘনাথ হুগলি কলেজ থেকে বটানি সহ বি.এ.পাশ করেন। জয়পুর মহারাজা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করতেন। [২৫] একটি প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিত পরিবারের রূপান্তর ঘটে গেল। এই রূপান্তরের অন্যতম শরিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নন্দকুমার যখন কান্দি স্কুলের হেড পণ্ডিত তখন হরপ্রসাদ সেখানে নিচু ক্লাসে ভর্তি হন। বাষট্টি বছর পর তিনি এক বার সেই স্কুলে গিয়েছিলেন। "ইস্কুলে আসিয়া

অ্যাডমিসান রেজিস্টার দেখিলাম তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য; সেই নামেই আমার ভর্তি হইতে হইয়াছিল।" [২৬] হরপ্রসাদের "...প্রকৃত নাম শরৎনাথ। একবার এক কঠিন পীড়াতে হরের প্রসাদে আরোগ্য লাভ করেন বলিয়া হরপ্রসাদ নাম চলিয়া যায়।"[২৭] ১৮৬২ সালে নন্দকুমার মারা গেলে, তাঁরা সকলে কান্দি থেকে নৈহাটিতে ফিরে আসেন। হরপ্রসাদ নৈহাটির অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া টোলে পড়াশুনা শুরু করেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। প্রথমে তিনি বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে চার-পাঁচ মাস ছিলেন, পরে বহুবাজারের গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকেন। সেখানে ঐ বাড়ির ছেলেদের পড়াতেন এবং নিজে রান্না করে খেতেন। [২৮]

হরপ্রসাদ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, ১৮৭৩ - এ সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এফ. এ. এবং ১৮৭৬ সালে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. পাশ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের বি.এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্লাস প্রেসিডেন্সি কলেজে করায় আইনত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ বলে গণ্য হন। ১৮৭৭ - এ কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং শাস্ত্রী উপাধি পান। [২৯] আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্র ভূমি কলকাতাতেই তাঁর শিক্ষা-জীবন গড়ে ওঠে।

ছাত্রজীবন থেকেই হরপ্রসাদ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর শিক্ষক। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৬৪ - ৭৬)। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেও তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত শিক্ষা ও আধুনিক ইংরাজি শিক্ষার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলার মাধ্যমে পশ্চিমি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ব্যপারেও তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

প্রসন্নকুমারের পর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৭৬ - ৯৫) হন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড বাইল্স্ কাওয়েল তাঁকে ১৮৬৪ সালে সংস্কৃত কলেজে অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। মহেশচন্দ্রের মধ্যেও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত শিক্ষা ও আধুনিক ইংরাজি শিক্ষার সম্মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। নানা বিষয়ে, বিশেষ করে ভারততত্ত্ব আলোচনায় কাওয়েল তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। হরপ্রসাদ মহেশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন। তিনিই পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করিয়ে দেন। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তাঁহার [মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন] খুব সদ্ভাব ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার নিকট আমার উল্লেখ করেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে দেখিতে চান। পণ্ডিত মহাশয় একদিবস আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'হরপ্রসাদ, রাজেন্দ্রলাল তোমাকে দেখিতে চাহেন, একদিন তাঁহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ

কর ।' ... একদিন রাজেন্দ্রলালের সহিত দেখা করিতে গেলাম।"[৩০]

মহেশচন্দ্র এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংস্পর্শে এসে হরপ্রসাদের মনে ভারততত্ত্ব বিষয়ে প্রথম আগ্রহ জন্মায়। দ্বারকানাথ *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন সমাজ ও তার ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রতিফলন দেখা যায় *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায়। হরপ্রসাদের সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের প্রভাব অনস্বীকার্য। বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও এক সময় *সোমপ্রকাশের* সম্পর্ক ছিল, পরে তিনি দ্বারকানাথের উপর পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাহিত্য বিষয়ে হরপ্রসাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন সংস্কৃত কলেজেরই আর-একজন বিখ্যাত অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন । রামনারায়ণ নাট্যকার ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বাংলা ভাষা প্রসারে তাঁর উৎসাহ ছিল।

হরপ্রসাদের মানসিক গঠন তৈরি হয়েছিল অনেকটাই সংস্কৃত কলেজের আঙিনায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে তিনি পড়েন নি; কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই গভীর সম্পর্ক ছিল। চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

হরপ্রসাদের লেখক হওয়ার সূত্রপাতও সংস্কৃত কলেজেই। ১৮৭৪ সালে তিনি যখন বি.এ. ক্লাসের ছাত্র, তখন মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনে আসেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের রচনা লেখার জন্য তিনি পুরস্কার ঘোষণা করেন। সঙ্গে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনিই বিষয় ঠিক করে দেন — "On the highest ideal of women's character as set forth in ancient Sanskrit writers." মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নির্দেশে হরপ্রসাদ *ভারত মহিলা* নিবন্ধটি লিখে পুরস্কৃত হন (১৮৭৬)। পরীক্ষক ছিলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং উমেশচন্দ্র বটব্যাল । *আর্যদর্শন*-এর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণকে হরপ্রসাদ তাঁর পত্রিকায় *ভারত মহিলা* নিবন্ধটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিবন্ধটিতে প্রকাশিত লেখকের মতামত সম্পাদকের পছন্দ না হওয়ায় তা *আর্যদর্শনে* ছাপা হয়নি। সেকালের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হরপ্রসাদকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।[৩১] বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন*-এ ভারত মহিলা প্রকাশ (মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ১২৮২ ব.) করেন। এইটিই হরপ্রসাদের প্রথম প্রকাশিত রচনা। এর পর তিনি *বঙ্গদর্শনের* নিয়মিত লেখক হন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীরতর হয়। হরপ্রসাদ এক সময় লিখেছেন, "তিনি জীবনে আমার Friend, Philosopher and Guide ছিলেন।"[৩২] ইতিহাস বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসে তাঁর আগ্রহ জন্মায় বঙ্কিমচন্দ্রেরই চেষ্টায় । বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, বাংলার প্রকৃত ইতিহাস তখনও লেখা হয়নি। তিনি বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন, উজ্জ্বল অতীত অন্বেষণ করেছেন; কিন্তু তাঁর হাতে বিশেষ উপকরণ ছিল না। বাংলার ইতিহাস বুঝবার জন্য তিনি জাতিপ্রথা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়া আরও অনেকগুলি

জীবিকা ভিত্তিক জাতি বাংলায় ছিল, যার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে।[৩৩] এই বিষয়টি হরপ্রসাদকেও ভাবিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর ইতিহাস-চর্চার অন্যতম বিষয় হচ্ছে জাতিপ্রথা নিয়ে গভীর এবং তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা। জাতিপ্রথা বিষয়ে তাঁর অন্বেষণ অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাংলার ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ অনেক বেশি উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি সে সুযোগ বিশেষ ভাবে পেয়েছেন এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালা থেকে। তাছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্রর সংস্পর্শও তাঁকে ইতিহাস-চর্চায় উদ্দীপিত করেছিল। রাজেন্দ্রলালের ভারততত্ত্ব বিষয়ক কাজকর্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন , বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হরপ্রসাদের মধ্যে ইতিহাস বোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

রামগতি ন্যায়রত্নের *ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস* -এ (১৮৭৪) স্বল্প পরিসরে প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক ভারতের নর্থব্রুকের শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বইটি লিখতে গিয়ে তিনি সমসাময়িক কালে লেখা ইংরাজি ও বাংলা বইপত্র দেখেছেন এবং তাঁর নিজস্ব ইতিহাস ভাবনা সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ একই বছরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* প্রকাশিত হলে চারদিকে সারা পড়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বাগত জানিয়েছিলেন।[৩৪] এই পুস্তিকাটি ছাড়াও রাজকৃষ্ণ বাংলার রাজ-সমাজ-অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যের ইতিহাসের নানা ছবি লিখেছেন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। বাংলার গৌরবময় অতীতকে তুলে ধরতে তিনি বিদ্যাপতিকে বাঙালি কবি বলেছেন।[৩৫] কিন্তু গ্রিয়ার্সন বলেছেন, মৈথিলি কবি।[৩৬] আর হরপ্রসাদ বলেছেন, বাঙালি-মৈথিলি কবি।[৩৭]

সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন হরপ্রসাদকে ভারততত্ত্ব-চর্চার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র দত্ত[৩৮] প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁর মধ্যে ইতিহাসবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু ভারততত্ত্ব ও ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের যোগ্য শিষ্য ছিলেন হরপ্রসাদ। "এশিয়াটিক সোসাইটিতে হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের ভূমিকায় হরপ্রসাদের কাছে বিশেষ ঋণ স্বীকার এবং অশেষ প্রশংসা করেছেন। সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ও তালিকা সম্পাদনের কাজ রাজেন্দ্রলালের অবর্তমানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর এসে পড়ে।"[৩৯] *বিচিত্রা*-য় (পৌষ, ১৩৩৮ ব.) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, " আমার মনে এই দু জনের চরিত্রচিত্র মিলিত হয়ে আছে।"[৪০]

পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে যে বিস্তৃত গবেষণা

করেছিলেন তারও মূলে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব।

হরপ্রসাদের সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যে মেল বন্ধনে সাহায্য করেছে। দেশীয় পণ্ডিত তো বটেই, ইয়োরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌রাও প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ বা চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতেন। কত সমস্যা তিনি সমাধান করে দিতেন।[৪১]

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫-তে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য এবং ফিললজিকাল কমিটির সদস্য হন। শুধু তাই নয়, *বিবলিওথেকা ইন্ডিকার* কাজেও মনোনিবেশ করেন। ১৮৯১-তে তিনি ডিরেক্টর অব দ্য অপারেশন ইন সার্চ অব ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট ' নিযুক্ত হন।

১৮৭৮ সালে হরপ্রসাদ হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হন। ২৪ জানুয়ারি ১৮৮৩ পর্যন্ত তিনি সেখানে চাকুরি করেন। হেয়ার স্কুলে চাকুরি করার সময়েই ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তের মাসের ছুটি নিয়ে লখ্‌নউ ক্যানিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৩ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে রামনারায়ণ তর্করত্ন অবসর নিলে হরপ্রসাদ সেই পদে নিযুক্ত হন — "Asstt. Professor of Rehtoric and Grammar (Class VI) at Rs. 100 per month. Transferred from Hare School and joined in the forenoon of the 25th January 1883."[৪২]

১৮৮৬ -তে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরিতে যে সমস্ত বই জমা পড়ত সেগুলির উপর মন্তব্যসহ তিনি বার্ষিক প্রতিবেদন রচনা করতেন।

১৮৮৮-তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন, এবং ঐ বছরই তিনি সেন্ট্রাল বুক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

হরপ্রসাদ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫-তে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। ১৮৯৬ থেকে সংস্কৃতে এম. এ. পড়ানো শুরু হয় তাঁরই তত্ত্বাবধানে।

৮ ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং বাংলায় সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ হিসেবে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সালে তিনি ঐ পদ থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁকে ব্যুরো অব ইনফরমেশনের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৪৩]

শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি পুরোপুরি গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু আবার তাঁকে নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য ১৯২১ সালে আহ্বান করা হয়। হরপ্রসাদ সেখানে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রর মৃত্যুর পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়োডর অফ্রে ১১ই মার্চ ১৮৯৩

-র একটি চিঠিতে হরপ্রসাদকে লেখেন, "Trust you will successfully continue the work Late Lamented Rajendralala had done up to the end of the 9th Vol." [৪৪] এইটি ছিল *নোটিসেস অব স্যানস্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্ট* । পরবর্তীকালে তিনি *নোটিসেস* এবং *ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ ক্যাটালগ অব ম্যানাস্ক্রিপ্ট স্* সম্পাদনা করেন। তাঁর পুথি সংগ্রহের প্রতিবেদনগুলি শুধু মূল্যবানই নয়, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আকর।

১৮৯২ সালে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির জয়েন্ট ফিললজিকাল সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন। বিবলিওথেকা ইন্ডিকার কাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। তিনি সমস্ত পুথি, এমন কি ব্যাকরণ ও অলংকারের পুথিতেও সামাজিক কার্য-কারণ খুঁজেছেন। সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপাদান এই সমস্ত পুথিপত্রে ছড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র সংস্কৃত ও পালি পুথি চর্চায় হরপ্রসাদ নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি; অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, যেমন বাংলা, হিন্দি, অবহট্ট, মৈথিলি, গুজরাটি এবং রাজস্থানি পুথি নিয়েও চর্চা করেছেন। তাঁর পুথিপত্র পাঠ ও ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত রয়েছে ইতিহাস-চেতনা। ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ রূপায়িত করার জন্য তিনি লিপি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প এবং লোক-সংস্কৃতিতেও উপকরণ খুঁজেছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদও (প্রতিষ্ঠা ১৮৯৪) ছিল তাঁর আর-একটি কেন্দ্র। কিন্তু এই দুটি প্রতিষ্ঠানের চরিত্র ছিল ভিন্ন। এশিয়াটিক সোসাইটি ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান। এর কার্যকলাপ ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। অপর পক্ষে, বাংলার একদল বুদ্ধিজীবী স্বাধীনভাবে দেশীয় শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁরা চিন্তার স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। হরপ্রসাদ-বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে গবেষণার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলানুসন্ধান করেছেন। উদীচ্য বৌদ্ধ-ধর্মের অন্যতম আবিষ্কারক ব্রায়ান হটন হজসনের পথ অবলম্বন করে তিনি নেপালে পুথি সংগ্রহের অভিযান করেন; কারণ, তাঁর ধারণা ছিল নেপালে রক্ষিত পুথিপত্র থেকে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

সাহিত্য পরিষদে জাতিয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী , হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ সাহিত্য পরিষদ -কে জাতীয় চেতনার পীঠস্থানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ডন সোসাইটি (প্রতিষ্ঠা ১৯০২), বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫), জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (প্রতিষ্ঠা ১৯০৬) প্রভৃতির প্রভাবে স্বদেশী আন্দোলনের যেমন বিস্তৃতি ঘটেছিল তেমনি সাহিত্য পরিষদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে জাতীয় চেতনা ও স্বদেশ-প্রীতির জন্ম হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাতির প্রতি সাহিত্য পরিষদের কর্তব্যের কথা রবীন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন* - এ (আশ্বিন ১৩১২ ব.) লিখেছেন, — "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-কে বাংলার ঐক্য সাধন যজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। এই পরিষৎ-কে জেলায় জেলায় আপনার শাখা

সভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে — এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।"[৪৫] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্য দিয়ে দেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতির ঐক্যবদ্ধ রূপ সংগঠনের প্রয়াস লক্ষিত হয় এবং তার মধ্য দিয়েই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে। হরপ্রসাদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে (৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ব.) বলেছেন, "ইহা খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গলের জন্য জন্মিয়াছে এবং খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গল করিতেছে। ... এখানে হিন্দু - মুসলমান ভেদ নাই, আচরণীয় ভেদ নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ নাই। ইহার উদ্দেশ্য, বাংলার সীমার মধ্যে মানুষ যাহা করিয়াছে, সেইগুলি বাহির করা এবং তাহার একটি উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়া।"[৪৬] তৎকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন সেখানে দেশ ও দেশবাসীর গৌরবের কথা বলেছেন, ইতিহাস ও ভাষা-সাহিত্যের মূলানুসন্ধান করেছেন, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর স্বদেশানুরাগ।

১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০৭ এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ নেপাল যান। প্রথমবার তিনি সিসিল বেন্ডালের সঙ্গে গিয়ে অনেকগুলি প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করেন। নেপালের দরবার লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান সুব্বা বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তিনি বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে হরপ্রসাদকে সাহায্য করেন এবং *সরোজবজ্রের দোহাকোষ* ও *অদ্বয়বজ্রের টীকা* নামে দুটি পুথি উপহার দেন। নেপালে তিনি যে সমস্ত তথ্য- উপকরণ দেখেছিলেন তা থেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, বাংলার সমাজে বৌদ্ধ প্রভাব আজও রয়েছে। তিনি লেখেন *ডিসকভারি অব লিভিং বুদ্ধিজম্ ইন বেঙ্গল* (১৮৯৭) নামক পুস্তিকা। এই পুস্তিকায় তিনি বলতে চেয়েছেন, বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ হচ্ছে ধর্মঠাকুর।

১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ নেপাল থেকে বাংলার প্রচীন তালপাতার পুথি আবিষ্কার করেন। "The Collection of songs, entitled Charyacharyavinischyaya or more probably Charyagiti, belongs to the Darbar Library of Nepal. The first of the two collections or kosas of Doha was presented tc me by late lamented friend Subba Visnu Prasad Rajbhandari, Librarian, Darbar Library, Nepal. The Second collection of Dohas was copied and presented to me by the Library staff. The Dakarnava also belongs to the Darbar Library."[৪৭]

তাঁর নেপাল যাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি বিশ্লেষণ

করে হরপ্রসাদ প্রমাণ করেন যে বাংলাভাষা হাজার বছরের পুরানো।[৪৮] এছাড়া সে যুগের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিত্র এই পুথি থেকে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, হরপ্রসাদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই পুথির লেখকরা ছিলেন বৌদ্ধ।

১৮৯৮ সালে সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১১ - য় উপাধি দেওয়া হয় 'কম্পানিয়ন অব দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার'।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বোধগয়া মন্দির সম্পর্ক কমিশন নিযুক্ত হলে তার সদস্য হিসেবে মন্দির পরিদর্শনে যান এবং জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের সঙ্গে যুগ্ম প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি অধ্যাপক আর্থার এ. ম্যাকডোনেল-কে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ম্যাকস্‌ম্যুলর স্মৃতি সংগ্রহে'র জন্য পুরানো পুথি সংগ্রহে সাহায্য করেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে রাজস্থান ও গুজরাটের ভাট এবং চারণদের পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়। তিনি ঐ সমস্ত জায়গায় ঘুরে দুটি রিপোর্ট — *রিপোর্ট অব এ ট্যুর ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন সার্চ অব ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট স্‌ অব বার্ডিক ক্রনিক্‌ল্‌স্‌* (১৯০৯) এবং *প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অন দ্য অপারেশন ইন সার্চ অব ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌ট্‌ স্‌, বার্ডিক ক্রনিকল্‌স্‌* ১৯১৩ (১৯১৩)— পেশ করেন। এই রিপোর্ট দুটিতে চারণদের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কেই শুধু বলা হয়নি, চারণদের সমকালের সামাজিক চিত্রও ফুটে উঠেছে।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো হন।

১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচিত সভাপতি।

হরপ্রসাদ বারো বছর (১৯১৩-১৫, ১৯১৯-২৩ এবং ১৯২৫-২৯) বঙ্গীয় সাহিত্য -পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। তিনি ঐ পদে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে সভাপতি হন। ঐ সভায় তিনি প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ফাঁকি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "At the present moment there is a large body of men who go as Sanskrit Scholars without Knowing a letter of Sanskrit."[৪৯] তাঁরা দেশীয় টোলের পণ্ডিতদের সাহায্যে পণ্ডিত। "Such Oriental scholarship should be discouraged."[৫০] দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের যদি আধুনিক বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হতো তবে আমাদের দেশের পণ্ডিতরাই লিখতেন এ দেশের প্রকৃত ইতিহাস। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের পরিবারে পাশ্চাত্য বিদ্যার স্পর্শ নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু প্রথম পেলেও প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদই প্রথম যিনি আধুনিক বিদ্যাচর্চার প্রণালী আয়ত্ত করেছিলেন।

১৭ নভেম্বর ১৯৩১ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়।

৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলন লক্ষ করা যায়। বাড়িতে ছিল সংস্কৃত শিক্ষার আবহাওয়া। অধীত বিষয় ছিল ন্যায়শাস্ত্র। এক শ' বছর ধরে তাঁদের নৈহাটির বাড়িতে টোল ছিল। কিন্তু এই পরিবারে পরবর্তিকালে ইংরোজি শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটে। হরপ্রসাদ নিজে কিছু দিন টোলে পড়াশুনো করেন, পরে তাঁর অধ্যয়নের ক্ষেত্র হয় সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। তাঁর বিদ্যাচর্চার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল দেশি-বিদেশি পণ্ডিত মণ্ডলীর সংস্পর্শে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে তৈরি হয়েছিল তাঁর সংস্কারমুক্ত মন।[৫১] বঙ্কিমচন্দ্র - রাজকৃষ্ণ - রমেশচন্দ্রের প্রভাবে তিনি ইতিহাসে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ ব্যপারে সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর গবেষণা, ইতিহাস বোধ এবং ভারততত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অবদান যথেষ্ট। এই সমস্ত বিষয়ে তিনি হরপ্রসাদকে শিক্ষিত করে তোলেন। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ, যেমন, সিলভ্যাঁ লেভি, সিসিল বেন্ডাল, য়ুলিউস য়োলি, ফিদর ইপ্পোলিতোভিচ্ শ্চেরবাটস্কোই, আলফ্রেড ইড্‌লে ক্রফট, জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন প্রমুখ ভারততত্ত্ব বিষয়ে নানা প্রশ্নের সমাধান তাঁর কাছে চাইতেন।[৫২] বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদও তাঁদের কাছ থেকে অনেক শিখেছেন। পরস্পরিক সম্পর্ক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

হরপ্রসাদের বহুমুখী বিদ্যাচর্চা তাঁর ইতিহাস চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির নিপুণ অনুশীলনে সমাজ - মুখীনতা লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে পেতে চেয়েছেন। স্বদেশকে বুঝতে চেয়েছেন। স্বদেশের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। সেখানে তিনি শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নন, পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞান তাঁর দৃষ্টিকে শানিত করেছে, আধুনিক করেছে। তাঁর মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিলন ঘটেছিল। প্রকাশ পেয়েছে তাঁর যুক্তিবাদী মানস-চরিত্র। এ ব্যপারে বঙ্কিমচন্দ্র বা অন্যান্যদের যুক্তিবাদী মননের সঙ্গে তাঁর মানসলোকের মিল পাওয়া যায়, কারণ, "It was thus that element of rationalist thought imbibed from a Western style education..."।[৫৩] উপনিবেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক প্রেক্ষিত এবং শিক্ষা যে ইতিহাসতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে, হরপ্রসাদের ইতিহাসতত্ত্ব তাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে বলা যায় না। কারণ, তাঁর ইতিহাস ভাবনায় স্বদেশি সমাজ, সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং দেশের লুপ্তরত্নোদ্ধারই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বদেশি ভাবনা-সমৃদ্ধ ইতিহাস-চর্চার নজির উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই লক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই স্বদেশি আন্দোলনকে উপলক্ষ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা দেশীয় ইতিহাসবিদ্‌রা করেছেন।[৫৪] রমেশচন্দ্র দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রজনীকান্ত গুপ্ত, যদুনাথ

সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে স্বদেশ ভাবনার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা চলে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্দেশনায় হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে সমস্ত গবেষণাধর্মী কাজ শুরু করেছিলেন তা তিনি রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরেও চালিয়ে যান। তিনি পুথির ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন। দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন। সেই সমস্ত ভূমিকায় তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া, এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, প্রসেডিংসে গৃহীত তাঁর নানা বিষয়ের বিস্তর আলোচনা এবং জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে ইতিহাস চর্চার নজির ছড়িয়ে আছে। আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল; কিন্তু তার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্য পরিষদের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন, "....বাংলা দেশবাসী দশজন লোক একত্র হইয়া, বাংলা সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।"[৫৫] শুধু সাহিত্যের আলোচনা নয়, " পুথি খোঁজাও সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কাজ।" [৫৬] আর এই পুথির মধ্যে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের অনেক তথ্য। এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনেক পুথি সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সংগৃহীত পুথির তালিকাভুক্তিকরণ এবং সম্পাদনার কাজে হরপ্রসাদ নিরলস পরিশ্রম করলেও প্রাচীন বাংলা পুথি সংগ্রহ এবং বাংলার বহুমুখী বিদ্যাচর্চার জন্য সাহিত্য পরিষদকেই তিনি উপযুক্ত স্থান মনে করতেন।[৫৭] রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজ বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে সতেজ করে রেখেছিলেন।"[৫৮]

প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে হরপ্রসাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী যেমন রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের আলোড়িত করেছে, হরপ্রসাদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। তাঁর স্বাদেশিকতা, স্বদেশ প্রেম ছিল অন্য রকম। তিনি বাংলার গৌরবের কথা বলেছেন, বাংলার বৌদ্ধধর্মের মূল অনুসরণ করেছেন, আদিতে বাঙালি কী ছিল, তাদের জাত-পাত-অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। এ সমস্ত তাঁর পুরাবৃত্ত চর্চার অন্তর্ভুক্ত। এই চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজের দেশকে জানার আগ্রহ। হরপ্রসাদের ইতিহাস চর্চার পিছনে রয়েছে স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ এবং স্বদেশানুরাগ। প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, বক্তৃতা বা প্রবন্ধ রচনা না করলেও তাঁর গবেষণার ধারায়, রচনাবলীতে এবং ছোটো ছোটো প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে তাঁর দেশপ্রীতি ও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৯]

হরপ্রসাদের ইতিহাস-দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে জন্ম নিলো কী করে? তপন রায়চৌধুরীর মতে, "By

the 1880 the need for Hindu-Muslim unity was familiar feature of nationalist propaganda."[৬০] ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "হিন্দু ও মুসলমান যে মিলিবে, তাহার সূত্রপাত অনেকদিন হইতেই হইয়া আসিতেছে।"[৬১] তিনি রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের সন্তান। ভূদেবের পিতা-পিতামহ "ছিলেন বিশাল পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ কিন্তু ইংরেজীর সঙ্গে সম্পর্কহীন।"[৬২] হিন্দু শাস্ত্রে তাঁরা ছিলেন "ডাকসাইটে পণ্ডিত। ইংরাজি জানতেন না। ইংরাজি শেখা দুনিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করতে পারলে যে দুই একটি সুবিধা পাওয়া যেত, সেগুলিও নিতেন না।"[৬৩] ঐ পরিবারে ভূদেব প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত। হরপ্রসাদদের সনাতন রক্ষণশীল পরিবারেও রামকমল ন্যায়রত্নের সব ছেলেরাই ইংরেজি শিখেছিলেন প্রথম। এই প্রজন্মেই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু হরপ্রসাদের প্রপিতামহ মানিক্য তর্কভূষণের সঙ্গে কর্মোপলক্ষে হেস্টিংস্-জোন্সের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ভূদেব ও হরপ্রসাদদের পরিবারে গভীর শাস্ত্র চর্চা হয়েছে। ভূদেব নিজেও জীবন যাপনে হিন্দু নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন। অথচ "His assessment of the Muslim contribution to the Indian heritage was overwhelmingly positive. His visions of India's future emphasized a share destiny for the two communities." [৬৪] ভূদেবের সমসাময়িক এবং হরপ্রসাদের "Friend, philosopher and Guide"[৬৫] বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারও ছিল রক্ষণশীল হিন্দু। তিনি তাঁর লেখায় গৌরবময় হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত করেছেন। "Bankim treated Muslims as foreigners and identified nationalism or Indianhood or indigenousness with Hindus." [৬৬] শুধু তাই নয়, মিনহাজ্উদ্দীন সম্পর্কে বঙ্কিমের অদ্ভুত মন্তব্য— "... সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিত চিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস"[৬৭] থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ধরা পড়ে। "Like many of his contemporaries he also thought of the long period when Muslim dynasties ruled over India as a period of oppressive alien rule."[৬৮]

হরপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য লিখেছেন, "....তিনি [হরপ্রসাদ] ব্রাহ্মণোচিত সব রকম ক্রিয়াকর্ম করতেন। তবে সেগুলি Law of Medes বা Persians - এর মত অবশ্য পালনীয়, না করলে অধর্ম হয়, এ কথা তিনি স্বীকার করতেন না। শেষ বয়সে তিনি প্রায় সবই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ... শেষ বয়সে একান্তে নিত্যপূজা, জপতপ, এমন কি সন্ধ্যা আহ্নিকও তিনি করতেন না। তীর্থ ভ্রমণ, সাধুসঙ্গ, দেবস্থানে মানত, মাদুলী ধারণ— এসব কিছুই তিনি করতেন না।" [৬৯] এই সংস্কারমুক্ত মননের শিক্ষা তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেই সম্ভবত পেয়েছিলেন। আর, নিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রর কাছে থেকে। এই দু-জন তাঁর চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

হরপ্রসাদের কাছে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর মতে "বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি মাত্র"।[৭০] তিনি *বিভা* - তে

(ফাল্গুন ১২৯৮ ব.) প্রকাশিত 'মুসলমানি বাংলা: শুজ্জু উজাল বিবির কেচ্ছা' প্রবন্ধে লিখেছেন, " বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় অর্ধেক। ... কিন্তু দুঃখের মধ্যে হিন্দুরা মুসলমানদিগের বড়ো একটা খবর রাখেন না। এই সকল মুসলমানেরা বাঙালি, বাংলার উপর হিন্দুদিগের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোন মতেই কম নহে।" ১১ মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। হরপ্রসাদ ১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাসে *প্রসেডিংস অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*-এ একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'এনসিয়েন্ট বেঙ্গলি লিটারেচার আন্ডার মুহামেডান পেট্রোনেজ' লিখেছিলেন।

হরপ্রসাদ তাঁর সমগ্র বিদ্যাচর্চা ও অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে সমস্ত কিছুর মূলে যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নিহিত থাকে তা উদ্ধার করতে চেয়েছেন। অভিভাষণ, প্রবন্ধাবলী, উপন্যাসের মতো সৃজনশীল রচনা এমন-কি পুথির ক্যাটালগের ভূমিকাতেও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। মানবিকী বিদ্যার সমস্ত বিভাগেই ছিল তাঁর অনায়াস যাতায়াত। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তিনি অনেক পুথি সংগ্রহ করেন। সেই সমস্ত পুথির তালিকা প্রস্তুত ও সম্পাদনা করেন। তার বিভিন্ন রচনায় উপাদান হিসাবে সেই সমস্ত পুথি ব্যবহার করেছেন। *এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে, প্রসেডিংসে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়* এবং তাঁর সময়ের নামীদামি বাংলা পত্র-পত্রিকা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত অ্যাকাডেমিক জর্নালে বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রাজবৃত্তের ইতিহাস-চর্চায় সাধারণ মানুষের পরিচয় ও সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস অনেকটাই মেলে না। কিন্তু সমস্ত কিছুর মূলেই যে মানুষ এবং তার সমাজ, এই সত্যই তার কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিনিয়ত তিনি সমাজ-সংস্কৃতির মূলানুসন্ধান করেছেন। ঐতিহ্যকে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কৃত চর্যাপদ বা সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* শুধু সাহিত্য বা ভাষাতত্ত্ব নয়, ইতিহাসের উপাদান হিসেবেও নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। নিছক সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সময় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ধরতে চেয়েছেন। ধর্মকে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবেই ব্যবহার করেছেন।

হরপ্রসাদ ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। যেমন, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এর বস্তুগত দিকটির প্রতিই বেশি নজর দিয়েছেন এবং সেইটিকে হাতিয়ার করে ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এমন কি হরপ্রসাদ যখন '*এ ডেসক্রিপ্টিভ ক্যাটালগ অব স্যানস্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন দ্য কালেকশন অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি*'-র ষষ্ঠ খণ্ডের ব্যাকরণ পুথির ৩৩৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা লেখেন, তখন সেখানে তিনি দেখাতে চান কোন্ কোন্ অঞ্চলে কোন্ কোন্ ব্যাকরণ পড়ানো হতো

বা চর্চা হতো এবং তার পিছনে কোন্ ধর্মীয় বা সামাজিক কারণ নিহিত ছিল। সেটিকে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব তাঁর হাতে ইতিহাস রচনার উপকরণ হয়ে উঠেছে। রাজেন্দ্রলালের তত্ত্বাবধানেই হরপ্রসাদের বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার সূত্রপাত। তাঁর সারা জীবনের বৌদ্ধ অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক তথ্য উদঘাটিত হয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাসতত্ত্ব বুঝবার জন্য তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, দেশ-কাল, সমাজ-শিক্ষা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামগ্রিক ভাবে বুঝতে হবে। ই.এইচ.কার যথার্থই বলেছিলেন, "ইতিহাস অনুধাবন করার আগে ঐতিহাসিককে অনুধাবন"[৭২] করতে হবে। শুধু তাই নয়, "ঐতিহাসিককে অনুধাবন করার আগে তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুধাবন"[৭৩] করা উচিত। কোন পরিবেশে এবং কোন পরিস্থিতিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল তা যেমন বিবেচ্য বিষয়, তেমনি দেখা দরকার ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক ভাবনা-চিন্তা ও অবদানগুলি। তাঁর নিরন্তর অন্বেষণ বাংলা তথা ভারত ইতিহাসে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করেছে।

সূত্রনির্দেশ

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'রামমাণিক্য বিদ্যালংকার' (*সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৮ ব.) প্রবন্ধে লিখেছেন, "মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণের তখন খুব নাম। সার উইলিয়ম জোন্সের বিচারালয়ে তাঁহার কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় তাঁহার নাম খুব পড়িয়া গিয়াছিল।" বিনয়তোষ ভট্টাচার্য *Our Ancestry* (Baroda, 1943)-তে লিখেছেন, "Manikya later saw Warren Hastings as the Governor General and Sir William Jones as the chief of Supreme court. Sir William had great regard for Manikya and always respected his views on intricate questions of Hindu law." (p.13).

২. Haraprasad Shastri, *Sanskrit Culture in Modern India* (Presidential Address, Fifth Indian Oriental Conference), Lahore, 1928, p.42.

৩. 'The Sastris should be trained for Oriental scholarship. A historical sense should be awakend in their mind." *তদেব*, পৃ. ৪২।

৪. Hobsbawm, E.J, *Industry and Empire*, the Pelican Economic History of Britain, Volume - 3, England, 1969, p. 13.

৫. মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, *নৈহাটির ভট্টাচার্য বংশ*, (for Private circulation), নৈহাটি, ১৩৫২ ব., পৃ. ৬ ; B. Bhattacharyya, *Our Ancestry*, (For Private circulation), Baroda, 1943, pp. 10-11.

৬. মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮।

৭. *তদেব*, পৃ. ৯।
৮. 'রামমাণিক্য বিদ্যালংকার', *হ-র-সং* ৩, পৃ. ১৪০ ; B. Bhattacharyya, *Our Ancestry*, Baroda, 1943, p. 13.
৯. Sibdas Chaudhuri (ed.) *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. I, Calcutta, 1980, p. [23]
১০. ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দিন উইলিয়াম জোন্সের বক্তৃতা। দ্র. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।
১১. দ্র. B. Bhattacharyya, *Our Ancestry*, Baroda, 1943, pp. 13-14.
১২. 'রামমাণিক্য বিদ্যালংকার', *হ-র-সং*-৩ , পৃ. ১৪২।
১৩. B. Bhattacharyya, *Our Ancestry*, Baroda, 1943, p. 16.
১৪. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৫৫ ব., পৃ. ৪৫।
১৫. 'রামমাণিক্য বিদ্যালংকার', *হ-র-সং*-৩, পৃ. ১৪৪।
১৬. মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, *নৈহাটির ভট্টাচার্য্য বংশ*, নৈহাটি, ১৩৫২ ব., পৃ. ৩১।
১৭. *তদেব*, পৃ. ২৩।
১৮. B. Bhattacharyya, *Our Ancestry*, Baroda, 1943, pp. 16-17.
১৯. মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, *নৈহাটির ভট্টাচার্য্য বংশ*, নৈহাটি, ১৩৫২ ব. পৃ. ২০।
২০. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৫৫ ব. পৃ. ৭০।
২১. B. Bhattacharyya, *Our Ancestry*, Baroda. 1943, p. 17.
২২. মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, *নৈহাটির ভট্টাচার্য্য বংশ*, নৈহাটি, ১৩৫২ ব., পৃ. ২৭।
২৩. *তদেব*, পৃ. ২৮।
২৪. *তদেব*, পৃ. ৩০।
২৫. *তদেব*, পৃ. ৩৭-৩৮।
২৬. 'পুরানো বাংলার একটি খণ্ড', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৯০।
২৭. মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, *নৈহাটির ভট্টাচার্য্য বংশ*, নৈহাটি, ১৩৫২ ব., পৃ. ৩১।
২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*, সপ্তম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৭।
২৯. *তদেব*, পৃ. ৮।
৩০. ননীগোপাল মজুমদার, 'চল্লিশ বৎসর পূর্বেঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র'; *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৮৫।
৩১. 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়; *হ-র-সং*-২, পৃ. ১৭।

৩২. 'বঙ্কিমচন্দ্র', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৪৬।

৩৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৪২-৬৭।

৩৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৬।

৩৫. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'বিদ্যাপতি', *বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ ব.।

৩৬. Grierson, G. A, *An Introduction to the Maithili language of North Bihar Containing a grammar, Chrestomathy and vocabulary*, 2 parts, Asiatic Society, Calcutta, 1881-82.

৩৭. 'বিদ্যাপতি', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৭৬১-৮১।

৩৮. রমেশচন্দ্র দত্তকে *ঋগ্বেদ* অনুবাদে হরপ্রসাদ সাহায্য করেন। রমেশচন্দ্র ভূমিকায় লিখেছেন, "তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরুকার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।" *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, কলকাতা, ১৮৮৫-৮৭।

৩৯. অলোক রায়, *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১৬।

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতি পুস্তকের জন্য', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১৭৭।

৪১. 'চিঠিপত্র', *তদেব*, পৃ. ৪-৮২।

৪২. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*, ৭ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৭ ব., পৃ. ১১।

৪৩. *তদেব*, পৃ. ১২।

৪৪. চিঠিটির অংশ বিশেষ ননীগোপাল মজুমদারের 'চল্লিশ বৎসর পূর্বেঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র'-তে উদ্ধৃত। (*নারায়ণ*, ফাল্গুন, ১৩২৩ ব.)। দ্র. *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৯৯।

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অবস্থা ও ব্যবস্থা", 'আত্মশক্তি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী (সুলভ সং), ১৩৯৩ ব., পৃ. , ৬৮২।

৪৬. 'সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৪৫৬।

৪৭. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩২৩ ব. , পৃ. ১।

৪৮. *তদেব*।

৪৯. Haraprasad Shastri, *Sanskrit Culture in Modern India*, (Presidential Address, Fifth Indian Oriental Conference), Lahore, 1928, pp. 41-42.

৫০. *তদেব*, পৃ. ৪২।

৫১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরপ্রসাদদের পরিবারের সম্পর্ক গভীর ছিল। স্কুলে পড়ার সময় হরপ্রসাদ বেশ কিছু দিন বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবাসে ছিলেন। পরবর্তীকালে নানা বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মশায়ের উপদেশ মেনে চলতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনধারা দ্বারা তাঁর জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্র প্রভাবিত হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। দ্র. হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী 'ভূমিকা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে*, কলকাতা, ১৩৩৮ ব. ; Benoytosh Bhattacharyya, Our *Ancestry*, Baroda. 1943 ; মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, *নৈহাটির ভট্টাচার্য্য বংশ*, নৈহাটি, ১৩৫২ ব.।

৫২. 'চিঠিপত্র / এক', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৪-৬৩।

৫৩. Ranajit Guha, *An Indian Historiography of India : A Nineteenth century Agenda and its Implications*, Calcutta, 1988, p. 67.

৫৪. বিপান চন্দ্র, 'ইতিহাসের ব্যবহার', *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৩২ ।

৫৫. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ: ১৩২১', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৩০৯।

৫৬. *তদেব*, পৃ. ৩১১।

৫৭. দ্র. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ: ১৩২১', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৩০৬ - ৪১।

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা-র দ্বিতীয় ভাগে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' নামক প্রবন্ধ লেখেন। দ্র. *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১৭৫।

৫৯. হরপ্রসাদ লিখেছেন, পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ্‌গণ " আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন না; দুই-দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন।" ('আমাদের ইতিহাস', *হ-র- সং*-৪, পৃ. ৩২৭)। তাঁর *Sanskrit Culture in Modern India,* Presidential Address, Fifth Indian Oriental Conference, Lahone, 1924 অবশ্য দ্রষ্টব্য। তাঁর *ভারতবর্ষের ইতিহাস* -এর সংস্করণের সময় একটি অধ্যায় 'ভারতে ইংরেজ শাসনের সুফল'-এর জায়গায় 'ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ফল' লিখে স্তাবকতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। (দ্র. কালীপদ সেন, 'স্মৃতিচারণ', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১৫৯)।

৬০. Tapan Ray Chaudhuri, *Europe Reconsidered Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, Delhi, 1989, p. 42.

৬১. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *সামাজিক প্রবন্ধ*, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১২ ।

৬২. অশীন দাশগুপ্ত, 'বিস্মৃত ব্রাহ্মণ', *বিষয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য বিষয়*, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৪।

৬৩. *তদেব*, পৃ. ৬৪।

৬৪. Tapan Ray Chaudhury, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬।

৬৫. হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন। দ্র. 'বঙ্কিমচন্দ্র', *মাসিক বসুমতী*, শ্রাবণ এবং ভাদ্র ১৩২৯ ব.।

৬৬. Bipan Chandra, *Communalism in India*, New Delhi, 1987, p. 142.

৬৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', *বঙ্গদর্শন*,

অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ ব.।

৬৮. Tapan Ray Chaudhuri, *প্রগুক্ত*, পৃ. ১৮৮।

৬৯. মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, 'আমার জ্যাঠামশাই', *স্মারকগ্রন্থ*, ১৯৭৮। পৃ. ১৩২।

৭০. 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ৫৭৭।

৭১. 'মুসলমানি বাংলা: শুজ্জু উজাল বিবির কেচ্ছা', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৫৬৮।

৭২. কার, ই. এইচ., *কাকে বলে ইতিহাস ?* কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩৯-৪০।

৭৩. *তদেব*, পৃ. ৪০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমকাল

উনবিংশ শতাব্দীতে দেশি-বিদেশি বুদ্ধিজীবীরা ইয়োরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতের প্রত্ন-মহিমা অনুসন্ধানে ব্রতী হন। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা চলে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ধর্ম-চর্চার চেহারাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা চলতে থাকে। নতুন নতুন গবেষণার দ্বারা আজও শূন্যস্থান ভরাট হচ্ছে। নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে ব্যাখ্যার ধারাও যাচ্ছে পাল্টে । ভুল সংশোধনও হচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা ও সঠিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার পেছনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল । প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য তো ছিলই এবং সেই উদ্দেশ্যের সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে ক্রমশই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে চলেছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে ভারতীয় প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ কিভাবে গ্রাস করা যায় সেই চেষ্টা তারা চালিয়ে যেতে থাকে। এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধারের জন্য চলতে থাকে নিরন্তর গবেষণা। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি (১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪)। প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন স্যার উইলিয়ম জোন্স । সাহায্য করেছিলেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস । ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন এবং প্রত্নবিদ্যা চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁরা এই দেশ ও দেশবাসীকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। হারিয়ে যাওয়া অতীতকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের সভায় উইলিয়ম জোন্স 'Discourse on the Institution of a Society, for inquiring into History, Civil and Natural, the antiquities, Arts, Sciences and Literature of Asia'[১] শিরোনামে যে বক্তৃতা দেন তা থেকে জানা যায় যে, এই বিদ্যাচর্চার পিছনে গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজে বের করাই হবে এর অন্যতম উদ্দেশ্য।[২] তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকাই অগ্রগণ্য।[৩]

এশিয়াটিক সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক ওয়ারেন হেস্টিংস "was more interested for encouraging oriental learning for the efficient administration of territories of the E. I. Company."[৪] এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি জোন্স ভারততত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। জোন্স "was more interested in the advancement of learning for his instable desire to acquire knowledge and love for classical litera-

ture without however neglecting the interest of the Company. ... It was Jones who gave birth to Asian Studies."[৫] একথা অনস্বীকার্য যে, ইংরেজরা ভারতীয় বিভিন্ন বিষয় সমূহের চর্চা করেছেন এবং তাদের সংস্পর্শে এসে এ দেশের মানুষ সুযোগ পেয়েছে। তাদের ঐতিহ্যের নিরন্তর অনুসন্ধানের ফলে তাদের ইতিহাসের জ্ঞান উদ্দীপিত হয়েছিল।[৬] ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের মেথডলজি অনুসরণ করে এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে চলতে থাকে ভারততত্ত্বের চর্চা। তাঁদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটি ছিল বিস্তৃত এবং বহুমুখী। এ কথাও তো ঠিক যে, প্রাচ্যতত্ত্বের চর্চা হয়েছিল প্রতীচ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। এড্ওয়ার্ড সইদ তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতীচ্য-প্রাচ্যের শাসক-শাসিত সম্পর্ক এবং বোঝাপড়া জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে জটিলতারই সৃষ্টি করেছে।[৭]

জোন্সের ভারতবর্ষে আসার (১৭৮৩) বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই কয়েকজন পশ্চিমী পণ্ডিত এই দেশে উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম শুরু করেন, যা ভবিষ্যৎ ভারততত্ত্বচর্চার জমি তৈরি করেছিল। এই পণ্ডিতদের মধ্যে অন্তত তিন জনের নাম করা যেতে পারে — ১. স্যার চার্লস উইলকিন্স, ২. জোনাথন ডানকান এবং ৩. নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড । এঁরা এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্টউইলিয়ম কলেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।[৮]

উইলকিন্স *এ গ্রামার অব স্যানস্ক্রিট* (১৭৭৯) লিখেছিলেন, অনুবাদ করেছিলেন *ভাগবদ্গীতা* (১৭৮৫)। সংস্কৃত ছাড়াও তিনি পারসিক ও বাংলা ভাষা শিখেছিলেন এবং একটি বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। হেস্টিংস চেয়েছিলেন, বাংলার মানুষের ব্যবহারের জন্য এটি মুদ্রিত হোক। কিন্তু বাংলা টাইপ না থাকায় পরিকল্পনাটি বাতিল হয়। [৯]

পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় উইলকিন্স তৈরি করিয়েছিলেন বাংলা অক্ষরের টাইপ [১০] যার দ্বারা হালহেডের *বোধপ্রকাশ শব্দ শাস্ত্র বা এ গ্রামার অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ* (১৭৭৮) ছাপা হয়েছিল। হালহেড উইলকিন্স সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, এই দূর দেশে ইয়োরোপীয় শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় তিনি নিজেই ধাতুবিদ্যা, অক্ষর খোদাই ও ঢালাই এবং মুদ্রকের কাজ করেছেন। আবিষ্কারের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়েছেন।[১১]

ব্যাকরণ ছাড়াও তাঁর *এ কোড অব জেন্টু লজ*, সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদ ও চর্চা থেকে তাঁর ইতিহাস বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। [১২]

১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশিত *এশিয়াটিক রিসার্চেস*-এর খণ্ডগুলিতে তথ্যবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়।[১৩] এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত পুথিগুলিও অনেকাংশেই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশনারিরা এদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্* (১৮০৮), রামরাম বসুর *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১), মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালংকারের *রাজাবলী* (১৮০৮) এবং কেরীর *ইতিহাসমালা* (১৮১২)।

ভারতের ইতিহাস ও প্রাচীন নিদর্শন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় — (এক) ইংরেজরা এই দেশকে জানার এবং বোঝার জন্য ক্রমাগত প্রাচীন নিদর্শন ও তথ্যের সন্ধান করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাচীনত্বের সন্ধান পাওয়ায় তারা এখানে শাসন ব্যবস্থার দৃঢ় ভিত্তি ভূমি প্রস্তুত করতে উৎসাহী হয়। অবশ্যই তাদের লক্ষ্য ছিল এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা। (দুই) এদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজদের সঙ্গে মিলিতভাবে নানা বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন নিজেদের জানার জন্য। তাঁরা ইতিহাস চেতনায় আলোকিত হয়ে ওঠেন। এরই অন্যতম ফল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ।[১৫]

বুদ্ধিজীবীদের জাগরণের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ দেখা দিয়েছিল। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী চেহারা তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলায় প্রথম দেখা যায়। ফলে দেখা দিয়েছিল জাগরণ যা নবজাগরণ নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৬] নবজাগরণ সম্পর্কে সচেতনতা দেখা গিয়েছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। তাঁরাই অনুভব করেন ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা।

এশিয়াটিক সোসাইটিই ভারততত্ত্ব ও ইতিহাস-চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ভারতীয় সদস্য ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।[১৭] তাঁর ভারততত্ত্ব চর্চা এ দেশের ইতিহাস চর্চাকে সম্প্রসারিত করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক কালের অন্যান্য দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের গবেষণার ফসল তো আছেই।

২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারততত্ত্ব বিষয়ে প্রথম শিক্ষা পান রাজেন্দ্রলাল মিত্রর কাছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁকে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন[১৮] এবং হরপ্রসাদ দীর্ঘদিন তাঁর অধীনে এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজ করেন। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "নেপাল হইতে যে বৌদ্ধ সংস্কৃত পুথিগুলি সোসাইটিতে আসিয়া স্তূপাকার হইয়াছিল মিত্র মহাশয় তাহার একটা ক্যাটালগ প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত পণ্ডিতেরা পুঁথিগুলির Summary করিয়া দিত, সেই সকল Summary ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ভার পড়িল আমার উপর।"[১৯] তা ছাড়াও তিনি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রর *দি স্যানস্ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব নেপাল* বইটির প্রস্তুতিতে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তার স্বীকৃতি হিসেবে রাজেন্দ্রলাল ঐ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন যে, ঐ কাজের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে হরপ্রসাদ ষোলটি বড়ো সারাংশের

অনুবাদ করে সহযোগিতা করেছিলেন। সময় মতো ঐ কাজ করে দেওয়ায় রাজেন্দ্রলাল তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত ও আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে গভীর জ্ঞান এই কাজে তাঁকে যোগ্য করে তুলেছিল। রাজেন্দ্রলাল তাঁর কাজে খুশি হয়েছিলেন।[২০] হরপ্রসাদের বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ক কাজের সূত্রপাত এইভাবে রাজেন্দ্রলালেরই হাতে হয়েছিল।

রাজেন্দ্রলাল ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাসের নানা দিক, পুথি বিশ্লেষণ, এমন-কি শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্পর্কেও মূল্যবান কাজ করেছেন।[২১] তাঁর কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *নোটিসেস অব স্যান্‌স্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপটস্* খণ্ড ১-৯ (১৮৭১-৮৮), *ক্যাটালগ অব স্যান্‌স্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপটস্ এক্‌জিস্‌টিং ইন আওধ* (১৮৭২-৮৩), *এ রিপোর্ট অন স্যান্‌স্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্টস্ ইন নেটিভলাইব্রেরিজ ইন বেঙ্গল* (১৮৭৫), *এ ডেস্ক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব স্যানস্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপট্স ইন দ্য লাইব্রেরি অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* (১৮৭৭) ; এ ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে, প্রসেডিংস-এ এবং সমসাময়িক নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ। এই সমস্ত প্রবন্ধগুলি থেকে ভারত-ইতিহাসের নানা দিক উদঘাটিত হয়েছে। গুপ্ত, পাল-সেন যুগ সম্পর্কে নতুন তথ্যাদি আবিষ্কার ও তার ব্যাখ্যা করেছেন।[২২] "রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস লেখেন নি, তবে তাঁর বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যে বহু উপকরণ লুকিয়ে আছে ...।"[২৩]

হরপ্রসাদ তাঁর কর্মধারা অনুসরণ করে ভারততত্ত্ব ও ইতিহাস অনুশীলন শুরু করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর এশিয়াটিক সোসাইটির অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব পড়ে হরপ্রসাদের উপর। হরপ্রসাদ নিজে লিখেছেন, "১৮৮৯ সালে রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার পীড়ার সময় তুমি আমার এই Notice-এর কাজটা কর।' অর্থাৎ তিনি যে *Notices of Sanskrit Manuscripts* করিতেছিলেন, তাহার ভার আমার উপর দিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলালের দেহত্যাগ হইল। সোসাইটির মেম্বরগণ তাঁহার নোটিশ ছাপাইবার ভার আমাকে দিলেন। একটি খণ্ড শেষ হইয়াছিল, সেটি বাহির হইল, আমার নামেই বাহির হইল।"[২৪] নোটিশের এই খণ্ডটি দেখে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থিয়োডর অফ্রে হরপ্রসাদকে ১১ মার্চ ১৮৯৩ সালে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, শাস্ত্রী মশায়ের উপর তাঁর এই আস্থা ছিল যে তিনি প্রয়াত রাজেন্দ্রলালের অসমাপ্ত কাজ যোগ্যতার সঙ্গে শেষ করতে পারবেন। "Trust you will successfully continue the work Late Lamented Rajendralala had done up to the end of the 9 th Vol."[২৫] অফ্রের এই আশা ব্যর্থ হয়নি। হরপ্রসাদ নিজেও বহু পুথি সংগ্রহ করেছেন। পুথি সংগ্রহের জন্য অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। শুধু সংস্কৃত পুথি নয়, এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য হিন্দি, মৈথিলি, প্রাকৃত, বাংলা, ওড়িয়া, রাজস্থানি পুথিও সংগ্রহ করেছেন হরপ্রসাদ। এই সমস্ত সংগৃহীত পুথির বিবরণ লিখেছেন।

"এই উপলক্ষে রাজেন্দ্রলালের মত হরপ্রসাদকেও অনুশীলন করতে হয়েছিল বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন লিপির, যাহার নিদর্শন কেবল পুঁথিতে নয় প্রাচীন শিলালেখেও পাওয়া যায়।"[২৬] তিনি রাজেন্দ্রলালের মতো অনেক শিলালেখের পাঠোদ্ধারও করেছিলেন। অর্থাৎ হরপ্রসাদ হয়ে উঠেছিলেন রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত উত্তরসূরী।

৩

রাজেন্দ্রলালের মতো রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গেও হরপ্রসাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রমেশচন্দ্র *ঋগ্বেদ সংহিতার* অনুবাদ প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ এই গ্রন্থের অনুবাদ ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক কাজ করেন। ভূমিকাতে তার উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও লিখেছেন, "১৮৮৫ খৃস্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের Translation বাহির করিবার উদ্যোগ করেন। আমি তাহার কিয়দংশে লিখিয়া দিব, রমেশবাবু বাংলা দেখিয়া দিবেন এবং ছাপাইবার সমস্ত খরচ-খরচা দিবেন এইরূপ বন্দোবস্তে কাজ আরম্ভ হয়।"[২৭] সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে (১৩২১ব.) হরপ্রসাদ আবার বলেন, "তিনি ঋগ্বেদের বাংলা তর্জমা প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।"[২৮]

রমেশচন্দ্রের এই কাজটি ম্যাক্সমূলর[২৯] এবং ই. বি. কাওয়েলের প্রশংসা পেয়েছিল।[৩০] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও *প্রচার* পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের *ঋগ্বেদ সংহিতা* সম্পর্কে প্রশস্তিমূলক আলোচনা লিখেছিলেন।[৩১]

ভারতীয় ঐতিহ্য ও সভ্যতা বিষয়ক রমেশচন্দ্রের রচনাগুলি ভারত-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ *বেঙ্গল লাইব্রেরি রিপোর্টে* মন্তব্য করেন : রমেশচন্দ্র দত্তর ইংরেজিতে লেখা *হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ার* প্রথম দুটি খণ্ডে বৈদিক ও ভারত ইতিহাসের জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। এই বই থেকে জানা যাবে ভারত ও ইয়োরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতদের গবেষণার ধারা কোন পথে। এই সময়ের এইটিই একমাত্র বই যেখান থেকে সাধারাণ ছাত্ররা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিজ্ঞান -সম্মত ইতিহাসের জ্ঞান আহরণ করতে পারবে। বইটি অত্যন্ত যত্নে লেখা। লিখন পদ্ধতি অনন্য।[৩২]

হরপ্রসাদ সাবিত্রী লাইব্রেরির বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর' প্রবন্ধ পাঠ করেন (৩০ চৈত্র, ১২৮৭ ব.) এবং তা *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "তাঁহার [রমেশচন্দ্রের] গ্রন্থে উৎকৃষ্ট সমাজ চিত্র দেখিতে পাই ...।"[৩৩] সব সময়েই হরপ্রসাদের দৃষ্টি ছিল সামাজিক ব্যাখ্যার দিকে।

রমেশচন্দ্রের এ *হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া* বইটি সম্পর্কে

উইন্টারনিৎজ *Trubner's Record*-এ লিখেছিলেন, বৈদিক যুগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনে মেয়েদের নিয়ে অধ্যায়টি পড়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।[৩৪] আবার গ্রিয়ার্সন রমেশচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "বছরের পর বছর ধরে আমরা যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছি, সুখের বিষয়, তোমার ঋগ্বেদের জ্ঞান সে আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করেছে।"[৩৫]

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস বইটির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত (১৮৯১) হলে হরপ্রসাদ *বেঙ্গল লাইব্রেরি রিপোর্টে* আবার লেখেন : রমেশচন্দ্র দত্তের *প্রাচীন ভারত* বইটির তৃতীয় খণ্ডে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাজের সতর্ক উপস্থাপনা হয়েছে। ব্যবহার শাস্ত্র, আচার-আচরণ, স্থাপত্য শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে রমেশবাবু অনেক খবর দিয়েছেন। এই বইটি ভারত ইতিহাস চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।[৩৬]

ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহের অন্যতম কারণ ছিল ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণা তৈরি করা, এবং সেই ধারণাই তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে ছিল প্রখর ইতিহাস-বোধ। তবে একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, ইউরোপীয় ইতিহাস রচনার পদ্ধতির দ্বারা তিনি চালিত হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে ভারততত্ত্ব এবং ভারত-ইতিহাসের যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল তার ব্যবহার অবশ্যই তিনি করেছিলেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে রমেশচন্দ্রের নিজস্বতা ছিল। তিনি বুঝেছিলেন, জাতীয়তাবাদী মননের বিকাশ ঘটাতে হলে প্রাচীন ঐতিহ্যের উদঘাটন একান্ত প্রয়োজনীয়। সে কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের নিছক অনুকরণ না করে তিনি বরং রাজেন্দ্রলাল মিত্রদের মতো স্বাজাত্যবোধ সম্পন্ন ভারততত্ত্ববিদ্‌দের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি রাজেন্দ্রলালের কাছে ঋণী। সেই ঋণ স্বীকার করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, "I take this opportunity of acknowledgeing my great indebtedness to these volumes in writing my work on civilization in Ancient India."[৩৭] হরপ্রসাদও যে রমেশচন্দ্রের প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য বিষয়ক কাজকর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা তাঁর মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রমেশচন্দ্রের রোমান্টিক অতীতচারিতার সঙ্গে বঙ্কিম-মানসের মিল লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, সাহিত্য রুচির দিক থেকে দু'জন প্রায় একই পংক্তিভুক্ত। স্কটের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কাব্যসমূহ, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি রমেশচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আগ্রহ ছিল। অথচ প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী চিন্তন তাঁদের মনে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে।

রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-বোধের আরও একটি দিক আছে। সেই ইতিহাস-বোধের জন্ম হয়েছে মূলত ইংলন্ডের বাণিজ্যিক-অর্থনীতি ভিত্তিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। অ্যাডাম

স্মিথ, টমাস রবার্ট ম্যালথাস, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের রচনায় বাজার, মূল্যতত্ত্ব, দেশের আর্থিক উন্নতি-অবনতির কারণ প্রভৃতি বিষয় গভীরভাবে আলোচিত। এঁদের, বিশেষ করে মিলের রচনার প্রভাব তাঁর মধ্যে প্রথম দিকে দেখা গেলেও পরবর্তী কালে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। ২৩ আগস্ট ১৯০৫ সালে রমেশচন্দ্র *Wednesday Rivew* - তে লিখেছিলেন: "অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো এবং জন স্টুয়ার্ট মিল আমার কাছে নয়া দুনিয়ার দুয়ার খুলে দিল। লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় আমি প্রায়ই জন স্টুয়ার্ট মিলকে দেখতাম এবং তাঁর কথা শুনতাম। হেনরি ফসেটকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আমার পরবর্তী জীবনে, বাস্তব ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক কাজকর্ম করতে গিয়ে দেখলাম ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের মতবাদের সীমাবদ্ধতা । বড়ো বড়ো ইয়োরোপীয় লেখকরা প্রাচ্যের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। সিসমণ্ডি, লাভেলেই এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় লেখকরা ভারতের ভূমি ব্যবস্থা বুঝতে পারেননি। এমন-কি মিল, যিনি ইন্ডিয়া অফিসে তিরিশ বছর কাজ করেছেন, তিনিও ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও আয়ারল্যাণ্ডের ভূমি ব্যবস্থার কথাই বলেছেন। ভারতীয় সমস্যার কথা তাঁর অর্থনীতিক আলোচনায় কখনোই উল্লিখিত হয় নি। প্রাচ্য অবশ্যই তার নিজস্ব চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতিবিদের জন্ম দেবে।"[৩৮] রমেশচন্দ্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় চালিত হয়েছিল। তাঁর অর্থনৈতিক - ইতিহাস চর্চায় তিনি এদেশের মানুষের আর্থিক দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে; দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণানুসন্ধান করে দেখিয়েছেন কিভাবে ব্রিটিশরা এই দেশকে অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত করেছে। সমকালের অন্যান্য বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে দাদাভাই নৌরজির *পভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া* (১৯০[illegible]) রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক-ইতিহাসের বইগুলির সঙ্গে তুলনীয়। রমেশচন্দ্রের *দি পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল* (১৮৭৪), *ফেমিন্স অ্যান্ড ল্যান্ড অ্যাসেসমেন্টস্ ইন্ ইন্ডিয়া* (১৯০০), *ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া — আর্লি ব্রিটিশ রুল* (১৯০১), *ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ* (১৯০৩) অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তিনি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বাংলার কৃষিযোগ্য জমির আয়তন বাড়লেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ সেখানে রাজস্বের পরিমাণ বাড়েনি ; অথচ মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং উত্তর ভারতে ভূমি রাজস্ব খাতে আয় বেড়েছে। ফলে গোটা ভারতবর্ষে ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় অসমতা। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ কর্মচারী, ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পণ্ডিত রমেশচন্দ্রের ইতিহাস তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার উপর নির্ভর করে। তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রকাশ যেমন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যায় তেমনি তাঁর ছাত্রপাঠ্য বই *ভারতবর্ষের ইতিহাস*-এ (১৮৭৯) জাতীয়তাবাদের বিশেষ একটি দিক আশ্চর্যজনকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই বইয়ের 'মুসলমান বিজয়ের ফল'-এ

তিনি লিখেছেন, "মুসলমান বিজয় হইতে ভারতীয়দিগের ... কোনও উপকার হয় নাই। মাহ্‌মুদ ও সাহাবুদ্দীনের স্বদেশীয় অপেক্ষা হিন্দুগণ অনেক সভ্য ছিল, সুতরাং বিজেতাদিগকে সভ্যতা দান করিয়াছিল, কিছু গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরে যখন তৈমুর বংশজাতগণ ভারতবর্ষ জয় করিল, তখন তাহারাও ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতা লাভ করিল, ভারতবর্ষকে সভ্যতা দান করে নাই। পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত মোগল বিজিত প্রদেশ অপেক্ষা আকবর শাসিত প্রদেশ ও আকবরের রাজধানী ও রাজসভা সভ্য ছিল ; সে সভ্যতা মোগলগণ ভারতবর্ষে আনে নাই, সেটি ভারতবর্ষে উৎপন্ন।"[৩৯] অথচ হরপ্রসাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে (১৩২১ ব.) বলেছেন, "গত ৭০০ সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাংলার কোনো কাজ হইতেছে না।"[৪০]

এমন আরও অনেক উদ্ধৃতি হরপ্রসাদের রচনা থেকে দেওয়া যায় যার দ্বারা প্রমাণিত হয় তাঁর ইতিহাস চিন্তা কখনোই হিন্দুত্ববাদ দ্বারা চালিত ছিল না। রমেশচন্দ্রের ভাবনার ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি তাঁর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা ছিল। এমন-কি হরপ্রসাদের অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী — 'স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষা কর' (১২৮৭ ব.), 'খাজনা কেন দিই' (১২৮৭ ব.), 'নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউ-এর মত' (১২৮৭ ব.) প্রভৃতি — রচনার পিছনে রমেশচন্দ্রের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। এই প্রবন্ধগুলিতে হরপ্রসাদ তাঁর সমসাময়িককালকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তিনি সেই সময়ের অর্থনীতিবিদ্‌দের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের তত্ত্ব এবং হেনরি ফসেটের রচনা হরপ্রসাদের অর্থনৈতিক চিন্তাকে যে উদ্দীপিত করেছিল তা তাঁর অর্থনীতি বিষয়ক রচনা থেকে বোঝা যায়। রমেশচন্দ্রের ইতিহাস ও অর্থনীতি চিন্তাও হরপ্রসাদের চিন্তাধারাকে উস্‌কে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৪

বঙ্কিমচন্দ্রের মননে পাশ্চাত্য-দর্শন বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রভাব রমেশচন্দ্রের মনীষাতেও লক্ষিত হয়। এঁদের দুজনের চিন্তনে মিল লক্ষ্যণীয়। হিন্দুত্ববাদ, রোমান্টিক অতীতচারিতা, "স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা"[৪১] ছিল তাঁদের মনন চর্চার মূল ভিত্তি। সেই সঙ্গে তাঁরা ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেশীয় ইতিহাসের অন্বেষণ করেছেন। বিশেষ করে কৃষি- অর্থনীতিই ছিল তাঁদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। *ক্যালকাটা রিভিউ*-তে (১৮৪৬) প্যারীচাঁদ মিত্রের 'দি জেমিন্দার অ্যান্ড দ্য রায়ত' এবং *ইন্ডিয়া ফিল্ড*-এ (১৬ জুন ১৮৫৯) কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'দি রায়তস অ্যান্ড দ্য জেমিন্দার' প্রকাশিত হয়। তার কয়েক বছর পর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বেঙ্গল রায়তস* (১৮৬৪) এবং রমেশচন্দ্র দত্তের *দি পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল* (১৮৭৪) প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' (*বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৭৯ ব.)

প্রবন্ধের বীজ সঞ্জীবচন্দ্রের বই থেকে নেওয়া। তিনি নিজেই লিখেছেন, "এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় প্রজা' (Bengal Ryat) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমার এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সংকলিত করিয়াছি।"[৪২] উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে রায়ত-জমিদার প্রশ্ন তোলপাড় করেছিল। ভূমি-প্রশ্ন ও কৃষি-অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তন বুদ্ধিজীবী মহলে যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল তাতে খুব স্বাভাবিক কারণেই সমাজ সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র জড়িয়ে পড়লেন। এর পিছনে জেরেমি বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, "ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলার নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দিলেও, তাহাদের ভিতর উক্ত হিতবাদ দর্শনের মূল কথা ক্রমে প্রচারিত হইতে থাকে।"[৪৩]

হিতবাদী চিন্তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্মরণ করা যেতে পারে, তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে সমানাধিকার ও নিম্নবর্গের মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রবণতা যথেষ্ট। সামাজিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "অপ্রাকৃত বৈষম্যের অধিকারই তাহার প্রধান কারণ। ভারতবর্ষে যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট রূপ।"[৪৪] 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধেও বারবার বৈষম্য ও অধিকারের কথাই এসেছে। কৃষকদের দুর্দশা, জমিদারদের অত্যাচার-শোষণ, ভূমি-রাজস্ব নীতির গলদ, প্রশাসনিক বিচ্যুতি — এই সমস্ত ঘটনার একত্র সমাবেশে তৎকালীন বাংলায় একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিস্থিতির স্বরূপ উদঘাটনই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য।

১৭৯৩-র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের সামনে উপহারের ডালি সাজিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু রায়তদের কাছে তা শুধুই বঞ্চনার ইতিহাস। জমিদারের উন্নতি কৃষকের উন্নতি নয়। ক্যানিং-এর রায়ত সংরক্ষণী সার্কুলারও (১৮৫৯) রায়ত-জমিদারদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারে নি। রায়তদের দুর্দশার মূলে ব্রিটিশ সরকার ও জমিদারদের যৌথ ভূমিকা দায়ী। তাই দেখা যায়, সরকারি আইন অগ্রাহ্য করে নাটোরের জমিদার কিভাবে নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে তুলেছিলেন। এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষককুল পাবনায় বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) করতে বাধ্য হয়। কৃষিজীবীর ক্রোধ যে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয় তা বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত পাবনার কৃষক বিদ্রোহের জন্য সরকারি আইন এবং জমিদারদের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারকে দায়ী করে 'অ্যান অ্যাপোলজি ফর দ্য পাবনা রায়তি' লিখলেন।

ভূমি-রাজস্ব এবং কৃষি-অর্থনীতি আলোচনার একটা ধারা তৈরি হয়েছিল সেকালে। এবং সেই প্রভাব যে হরপ্রসাদের উপরও পড়েছিল তা অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে তাঁর 'খাজনা কেন দিই' (*বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ ব.) এবং 'নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউ-এর মত' (*বঙ্গদর্শন*, কার্তিক ১২৮৭ ব.) প্রবন্ধ দুটি উল্লেখ্য। তিনি

বন্দোবস্ত ও জমিদারদের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন। তাঁর 'ইক্ষু'(*আর্যদর্শন*, পৌষ - মাঘ ১২৮৪ ব.), 'এক্সচেঞ্জ' (*বঙ্গদর্শন*, চৈত্র ১২৮৫ ব.) এবং 'স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষাকর' (*বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ ১২৮৭ ব.) প্রবন্ধ তিনটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের যে অর্থনৈতিক আলোচনার ধারা এখানে উল্লিখিত হয়েছে তাতে দেখা যায় "সমাজের অতীত ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যালোচিত হয়েছে।"[৪৫] যেমন বঙ্গদেশের কৃষক "রচনাটিকে ঠিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলা না গেলেও, এতে প্রখর ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় আছে।"[৪৬]

ইতিহাস চর্চার উপর বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য জানার জন্য তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। "রামমোহন রায় বাঙালির মধ্যে যে মনোভঙ্গি জাগাতে চেয়েছিলেন, তা ছিল ভারতমুখী। প্রাচীন শাস্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নবরূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন।"[৪৭] সেই সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী ও জ্ঞানোপার্জিকা সভা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসন্ধান চালিয়েছে। এই সমস্তর পিছনে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রথমত, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এদেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ইতিহাস বোধ এবং নিজের দেশের ইতিহাস জানার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করেছিল। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলি কলেজের স্কুল বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গেতিহাস পড়তে হয়েছিল।[৪৮] কিন্তু উপযুক্ত বই না থাকায় তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। সম্ভবত তিনি পড়েছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যানের *আউট লাইন অব দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (১৮৪০) অথবা চার্লস স্টুয়ার্টের *দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (১৮১৩)। মার্শম্যানের বইটির দ্বিতীয় ভাগের অনুবাদ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মার্শম্যানের বইতে তুর্কিবিজয়ের আগের ইতিহাসের একটিমাত্র পরিচ্ছেদ আছে। আর স্টুয়ার্টের বইতে তুর্কিবিজয় পূর্ব বাংলার কোনও ইতিহাস লেখা হয়নি। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের জন্য আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি লিখেছিলেন, "এক সময় ইচ্ছা করিয়াছিলাম বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।"[৪৯] বঙ্কিমচন্দ্রের 'কয়েকটি প্রবন্ধ' বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। বাংলার ইতিহাসের জন্য বাঙালি ঐতিহাসিক তখন কোথায়? তাঁর মতে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র "স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন"[৫০] কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আরও বেশি সময় দিতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ব.) প্রবন্ধে লিখেছেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। ... সাহেবরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে

জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শমান লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। ... আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।"[৫১] কিন্তু ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দেই একটি বাঙ্গালার ইতিহাস প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ের লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিজ্ঞাপণে লিখেছেন, "বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমান সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্বক, সংকলিত ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ আবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"[৫২] অর্থাৎ মূল উৎসগুলির অনুসন্ধান ও ব্যবহার না করেই 'বাঙ্গালার ইতিহাস' লিখেছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র মার্শম্যান রচিত ইতিহাস গ্রন্থের উপর নির্ভর না করে অন্যান্য লেখকদের বিভিন্ন বই থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালির দৃষ্টিতে বাংলার ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তার অভাব থেকেই গেল। বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন* (মাঘ ১২৮১ ব., পৃ. ৪৪৯) পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন, "মার্শমান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি ; সে কেবল সাধ পূরণ মাত্র।" সেদিক থেকে বিদ্যাসাগর মশায়ের ইতিহাস বইটিও বিশেষ আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

তবে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্নের *ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস* প্রকাশিত হয়। এই বইটির 'প্রিফেস'-এ ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "আমি মনে করি যে এই বইটির ক্ষুদ্র পরিসরে অনেক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। বইটি ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল পরীক্ষার্থী স্কুল ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।" "... I think that the book, condensing as it does much. Information within small compass, will prove acceptable to the students of our schools, who have to make up for the Examinations in Indian History and Geography."[৫৩] সেকালে বাংলা বইয়ে ইংরেজিতে ভূমিকা লেখার চল ছিল। রামগতির বইটি স্কুলের ছাত্রদের জন্য লেখা হয়েছিল। বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছিলেন, "কিছু স্বল্পায়াসে ছাত্রেরা পরীক্ষা প্রদানোপযোগী জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে এই ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ইতিহাসখানি সঙ্কলিত হইল।"[৫৪] স্কুল ছাত্রদের জন্য সংক্ষেপে লেখা বইটিতে লেখকের ইতিহাস দৃষ্টির সম্যক পরিচয় মিলবে। ভূগোল এবং ইতিহাস যে অবিচ্ছেদ্য দুটি বিষয় সেদিকে তাঁর নজর ছিল। সেভাবেই বইটি লেখা। "হিন্দু রাজগণের অধিকার হইতে গভর্ণর জেনারেল লর্ড নথব্রুকের আগমন পর্যন্ত সময়ের স্থূল স্থূল বিবরণ"[৫৫] কালানুক্রমে বিবৃত হয়েছে। বিষয় বিশ্লেষণে তেমন উল্লেখযোগ্য কায়দা না থাকলেও কালের বিচারে এটি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, বইটি বাংলা ভাষায় লেখা। এই বইতে লেখক তাঁর স্বাতন্ত্র্যের দাবীও করেছেন।[৫৬] কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা বাংলার ইতিহাসের জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা সে সময়ে দেখা গিয়েছিল তা রামগতি ন্যায়রত্ন বিশেষ মিটাতে পারেন নি।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে

প্রকাশিত হল। *বঙ্গদর্শনে* (মাঘ ১২৮১ ব.) বঙ্কিমচন্দ্র বইটির দীর্ঘ সমালোচনা লিখলেন। রাজকৃষ্ণের ইতিহাস-বোধকে স্বাগত জানালেন। কৈফিয়ৎ দিলেন, "সকল অধ্যয়নীয় তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না।"[৫৭] এই বই লিখতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে সব বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন তার একটি তালিকাও তিনি দিয়েছেন।[৫৮]

দেখা যাচ্ছে রাজকৃষ্ণকেও মুখ্যত বিদেশি লেখকদের রচনার উপর নির্ভর করেই বাংলার ইতিহাস লিখতে হয়েছিল এবং তিনি পরোক্ষ উপাদানগুলিকেই ইতিহাস লেখার কাজে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর বই বিদেশিদের রচনার সরাসরি অনুবাদ নয়। রামগতি ন্যায়রত্ন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে ইংরেজি বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন, তাদের তথ্য ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু হুবহু নকল বা অনুবাদ বলতে যা বোঝায় তা তাঁরা করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিরাট সম্ভাবনা দেখলেন রাজকৃষ্ণের মধ্যে। তাঁর মতে, "রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন, তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অৰ্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টি ভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। ... ঈদৃশ সৰ্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে ; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"[৫৯] রাজকৃষ্ণের লেখা এই বইটিকে বঙ্কিমচন্দ্র মর্যাদা সহকারে আলোচনা করেছিলেন, কারণ এই বইতে রাজকৃষ্ণের স্বচ্ছ ইতিহাস-দৃষ্টির প্রতিফলন হয়েছিল। তাঁর ইতিহাস-চিন্তা সমাজকে বাদ দিয়ে নয়। ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণাও ছিল তাই । তাঁর অনেক প্রবন্ধে পুরাবৃত্তের অনুসন্ধান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন কি সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কেও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* বা *History of Bengal for beginners* (নামপত্রে বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষায় লেখা আছে) বইটি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। এছাড়া আছে একটি 'উপক্রমণিকা'। ইতিহাস লেখার আগে তিনি বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং লোকসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দেশবাসীর ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "সুবা বাঙ্গালায় প্রায় সাত কোটী লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় দুই কোটী সতের লক্ষ মুসলমান; প্রায় একুশ লক্ষ সাঁওতাল, পাহাড়িয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতি ; প্রায় দেড় লক্ষ খৃস্টান। অবশিষ্ট সাড়ে চারি কোটীর অধিক হিন্দু। সুবা বাঙ্গালায় প্রধানত তিনটি ভাষা প্রচলিত, ১ বাঙ্গালা, ২ হিন্দি, ৩ উড়িয়া। বাঙ্গালা ভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটী ৬৪ লক্ষের উপর, হিন্দী ভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটী ৪৮ লক্ষ, উড়িয়া ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৫৪ লক্ষ।"[৬০] এখনকার

বাংলার সঙ্গে সুবা বাংলার ভৌগোলিক সীমা ও লোক সংখ্যার পার্থক্য দুস্তর। ভাষার ব্যাপারেও অমিল স্পষ্ট। এই হিসেব সমসাময়িক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি 'সুবা বাঙ্গালার'-ই ইতিহাস রচনা করেছেন। অবশ্যই এই ইতিহাস ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত।

রাজকৃষ্ণের বইটি শুধুমাত্র রাজবৃত্তের ইতিহাস নয়। সামাজিক অবস্থাও এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ এবং কন্যা বিক্রয়ের মতো বিষয়। প্রাচীন বাংলার অনেক গৌরবময় অধ্যায়েরও উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সমাজ ও সাহিত্য - সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার ফলে বইটির গুরুত্ব বেড়েছে। তিনি বাঙালি কবি ও পণ্ডিতদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিদ্যাপতিকে বাঙালি কবি বলেছেন। বিদ্যাপতি বাঙালি ছিলেন কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কও হয়েছে বিস্তর। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে *দি ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি*-তে (খণ্ড-১৪) 'বিদ্যাপতি অ্যান্ড কনটেম্পোরারিজ' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। *বঙ্গদর্শন* (১২৮২ ব.) পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটিরও লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে বিদ্যাপতি ছিলেন বাঙালি কবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, "বিদ্যাপতি বাংলার ও মিথিলার একজন আদি কবি ও মহাকবি।"[৬১] রাজকৃষ্ণ বাংলা ও বাঙালির উজ্জ্বল অতীতকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

আধুনিক অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ভূমি ব্যবস্থার গুরুত্ব যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি রাজকৃষ্ণের রচনাতেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে, "মুসলমান শাসন সময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদের ন্যায় ছিলেন ; ইংরেজ রাজত্বকালে তাঁহাদিগের সে অবস্থা গিয়াছে। তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের মত রাজক্ষমতাসূচক সৈন্য, গড় বিচারালয় নাই। নিরূপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নিলাম হইবে, এই নিয়মে প্রাচীন জমিদারদিগের অনেক অপকার হইয়াছে।"[৬২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার ও রায়তদের দুর্দশা আলোচনা করেছেন *বঙ্গদর্শন* (কার্তিক ১২৮৭ ব.) পত্রিকায়। হরপ্রসাদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের অনেক মিল থাকলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তাঁর মতামতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। বিদ্যাসাগরের মতে, "লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজ্যশাসন দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল করিয়াছেন।"[৬৩]

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* ছাত্রপাঠ্য বই, তবু ইতিহাস - দৃষ্টি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের স্বীকৃতি পেয়েছিল। ঐ সময়ে এবং তারও আগে থেকে বেশ কিছু ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছিল।

ইংরেজিতেও লেখা হয়েছিল। লিখেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও। ছাত্রপাঠ্য বইগুলিতে কখনও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য, কখনও জাতীয়তাবোধ-স্বদেশ প্রীতি লক্ষ্যণীয়, রাজবৃত্তের ইতিহাস আলোচনা মুখ্য বিষয় হলেও, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসও কোনও কোনও বইতে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহ ঃ* (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। বইটির আখ্যাপত্রে লেখা আছে, "সৃষ্টির প্রথমাবধি মনু যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ, মহাভারত, রাজাবলী এবং ডাউস হিন্দুস্থান প্রভৃতি হইতে অনুবাদ করিয়া গৌড়ীয় সাধুভাষায় কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য ইতি খ্যাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগ্রহ ঃ।"[৬৪] তাঁর মতে সংস্কৃত পুরাণ, পারসি এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত তথ্যাদি থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা সম্ভব। কিন্তু মার্শম্যানের বইটি কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। তিনি 'গ্রন্থাভাস'-এ লিখেছেন, "... কিন্তু অস্যাদৌ শ্রীযুক্ত মার্সমন সাহেব ইংরাজী ভাষাতে যে এক পুস্তক রচনা করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যে, তিনি হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি ছলক্রমে স্বকপোল কল্পিত কতকগুলিন দোষ দর্শাইয়া হিন্দু বালকদিগকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করিবার মানসে প্রকারান্তরে লিখিয়াছেন যে বেদ আধুনিক ব্রাহ্মণেরা শিথিয়ান দেশ হইতে আনিয়া এ দেশে প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা প্রতারক, এ দেশীয় হিন্দুরা নির্ব্বোধ, এবং অতি নীচ জাতি ; পূর্ব্বে পাহাড়িয়া ধাঙ্গড়ের ন্যায় ছিলেন, হিন্দুরা কস্মিনকালে স্বাধীন ও পরাক্রান্ত একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন না, অত্যল্প স্থানের অধিপতি চিরকাল, খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, খ্রীষ্টিয়ান এবং যবন জাতির চিরকাল প্রাধান্য, এইরূপ কৌশলক্রমে পক্ষপাতাধীন যথেচ্ছা বর্ণনা করিয়াছেন।"[৬৫] তাই বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, পূরাণ প্রভৃতি থেকে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। আবার সেই সঙ্গে বলেন, "... রাজকীয় ব্যাপার ইউরোপীয় অথবা মার্সমন সাহেবের রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ন্যায় যাহা মার্সমেনের তথ্য ইহকালের লোকের বিশ্বাসযোগ্য তাহাই পক্ষপাতশূন্য হইয়া রচনা করিব।"[৬৬]

১৮৪৮ সালেই বৈদ্যনাথের উক্ত বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। অখ্যাপত্রে লেখা হয় "ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহান্তর্গত বৃটিশ ইণ্ডিয়া। ব্রুক জেনরল গেজেটিয়র এবং মার্সমন্স হিষ্টোরি বেঙ্গাল প্রভৃতি হইতে অনুবাদ করিয়া সাধুভাষায় কাচরাপাড়া নিবাসী শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্যেতিখ্যাত কর্ত্তৃক সংগ্রহ।" গ্রন্থকার মার্শম্যানকে চূড়ান্ত সমালোচনা করলেও তাঁর বই অনেকটাই মার্শম্যানের বইয়ের উপর নির্ভরশীল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে নীলমণি বসাকের *ভারতবর্ষের ইতিহাস* প্রকাশিত হয় । আখ্যাপত্রে উল্লিখিত হয়েছে, "অতিপ্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত।" এই বইয়ের 'বিজ্ঞাপন'-এ গ্রন্থকার বলেছেন যে, বর্তমান কালে লিখিত আমাদের দেশের বেশিরভাগ ইতিহাস পাশ্চাত্য লেখকদের লেখা। প্রাচীন হিন্দুদের প্রকৃত ইতিহাস সেখানে অনুপস্থিত।

নীলমনি বসাক লিখেছেন, "এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত নহে, এই জন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরেজি পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এ দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন।" [৬৭]

গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত যেভাবে লিখবেন ঠিক ছিল, তা হল না, কারণ, "যেহেতু আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় নাই, যাহা আছে তাহা অসম্পূর্ণ ও অসত্য গল্প মিশ্রিত, অধিকন্তু তাহা কালসমন্বয়িক বা ধারাবাহিক নহে। এই সকল বিষয়ের বিরোধ সমন্বয় ও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লেখা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে।" [৬৮] তবু তিনি বহু পরিশ্রম করে অনেক তথ্য উদ্ধার করে বইটি লিখেছেন। বইতে তিনি যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা "সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও পারসী অনেক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ... কোন কোন পাঠক বিবরণের মূলানুসন্ধান করিতে পারেন, অতএব লেখা যাইতেছে, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, আসিয়াটিক রিসার্চ, ওয়ার্ড সাহেবের হিন্দু বৃত্তান্ত, ও এলফিনষ্টন, মরে, কিটলী ও ইষ্টুয়ার্ট সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস, এবং ফেরেস্তার লিখিত পারসীগ্রন্থ হইতে এই সকল বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল।" [৬৯]

এই বইতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রাজবৃত্তের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে "রাজ্য কৌশল, যুদ্ধ, বিচার, ঋণ, ক্রয় বিক্রয়, বিবাহ, উত্তরাধিকারিত্ব" [৭০] বিষয়সমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। 'বিদ্যা' নামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় আছে। তাতে আলোচিত হয়েছে, "ভারতবর্ষে বিদ্যার আদি স্থান, সংস্কৃত ও আর ২ ভাষা, জ্যোতিষ, গণিতশাস্ত্র, ত্রিভুজ তত্ত্ব, অঙ্কগণিত, বীজগণিত, দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, আয়ুর্ব্বেদাদি, সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিত্রাদি শিল্পকর্ম্ম।" [৭১] এ ছাড়া আলোচিত হয়েছে "ভারতবর্ষে কি প্রকারে লোকবসতি হয়, ও হিন্দু সন্তানেরা কোথায় কোথায় গমন করেন।" [৭২] তা হলে দেখা যাচ্ছে, নীলমণি বসাক তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তুকে শুধুমাত্র রাজবৃত্তের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেও বিষয়টিকে দেখতে চেয়েছেন। ইতিহাস-চর্চার প্রথম দিকে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

১২৭২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে রাধানাথ বসু সর্ব্বাধীকারীর *ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তসার* প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ২৯। বইটিতে "বালকদিগের পাঠার্থে ভারতের প্রাচীনকাল থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত টানা ইতিহাস বিবৃত হয়েছে ।"

সরকারি স্কুলের শিক্ষক জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বই *ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত* ১২৭৪ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। রামায়ণ মহাভারত থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া মার্শম্যান, গ্যারেট, এলফিনস্টোন, নীলমণি বসাক প্রমুখ লেখকদের বই থেকেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। "দুই এক স্থলে শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে দুই

একটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের অতি প্রাচীনকাল অবধি মোগল সম্রাট্ শাহ্ আলমের সময় পর্য্যন্তের ইতিহাস লিখিত হইল।"[৭৩] এই বইতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এবং নিজ দেশের বীরত্ব ও হিন্দুয়ানির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৪ খ্রি.) *ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* প্রকাশিত হয়। লেখক কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী। ইংরেজ লেখকদের বইপত্রের উপর নির্ভর করে বইটি লেখা। লেখক ইংরেজ শাসনের ভক্ত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ক্যানিং "দয়ালু, শান্ত, ধীর, পরিশ্রমী ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রজার হিতার্থে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ইঁহার সময়ে যে মিউটিনী ঘটে তাহাতে এই মহাত্মার তুল্য বিজ্ঞতম কোন শাসনকর্ত্তা না থাকিলে এ দেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিত তাহা বলা যায় না।"[৭৪] ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের একটি খণ্ড-চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "কানপুরস্থ সৈন্যগণ নানা সাহেব বা ধুন্ধু পন্থের উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া উক্ত নগরস্থ ইংরেজগণকে আক্রমণ করিলে, ইংরেজরা একটী বাটীমাত্র আশ্রয় করিয়া তিন সপ্তাহ বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করত অবসন্ন হন। এখানে বালক বালিকা ও স্ত্রী প্রভৃতিতে ৪৫০ জন ইংরেজ ছিল। তাহারা অতি নিষ্ঠুর রূপে নানা কর্ত্তৃক হত হয়। কেবল ৪ জন মাত্র পলায়ন করেন। অনন্তর জুলাই মাসে হ্যাবলক ও নীল আসিলে নানা পলায়ন করে।"[৭৫] কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী ব্রিটিশ প্রশাসনের সমর্থক ছিলেন তা তাঁর গোটা বইটি থেকে বোঝা যায়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ দুটি উদ্ধৃতি তাঁর বই থেকে ব্যবহার করা হয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (প্রথম শিক্ষা) নামে ছাত্রপাঠ্য একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন। প্রকাশকাল ১৮৭৯ খ্রি.। আখ্যাপত্রে বইটির আলোচ্যকাল সম্পর্কে লেখা আছে, "ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের আগমন হইতে ১৮৭৭ খ্রি. অব্দে মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক ভারতেশ্বরী নাম গ্রহণ পর্য্যন্ত।" বইটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা। লেখকের ইতিহাস দৃষ্টি স্বচ্ছ। রমেশচন্দ্র বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর বইয়ের ইংরেজি 'Preface'-এ লিখেছেন, এই বইটিতে লেখক পাঠকদের জন্য ভারতীয়দের সভ্যতার ক্রমোন্নত, তাদের আচার-আচরণ, জাতীয় জীবন, ধর্ম প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ইতিহাস লিখেছেন।[৭৬] রমেশচন্দ্রের রচনায় রাজনৈতিক ইতিহাস উপেক্ষিত হয়নি, উপরন্তু সতর্কতার সঙ্গে তিনি সামাজিক এবং "intellectual life of the people"-এর যতদূর সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য উপাদান ব্যবহার করেছেন। হিন্দুসভ্যতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সমকালীন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে অনেক তথ্য আহরণ করেছেন। বিশেষ করে বৈদিক সভ্যতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রধানত ম্যুর, ম্যাক্স ম্যূলর এবং কখনো কোলব্রুক, ওয়েবার ও সেকালের অন্যান্য লেখকদের উপর নির্ভর করেছেন।[৭৭] রমেশচন্দ্র সতর্কতার সঙ্গে পুরাণ থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ, এলফিনস্টোনের "the best and most impartial account of Musalman supremacy in India,"[৭৮] আবুল ফজল এবং বার্নিয়েরের-এর রচনা মধ্যযুগের ইতিহাস লিখতে সাহায্য করেছে। জাতীয়

জীবন, বিশেষ করে রাজপুত, মারাঠা এবং শিখদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি টড্, গ্রান্ট ডাফ এবং কানিংহামের রচনাবলী থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন।

যদিও রমেশচন্দ্র এই বইটি ছাত্রদের জন্য লিখেছিলেন তথাপি এটি অন্যান্যদের রচিত ছাত্র-পাঠ্য বই থেকে আলাদা। তিনি শুধু রাজবৃত্তের ইতিহাস না লিখে সামাজিক ইতিবৃত্ত লিখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এখানে দেশের সমাজ, মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ ও সমস্যার প্রতিই লেখকের নজর অনেক বেশি।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৮৫) নামে একটি ছাত্রপাঠ্য বই লিখেছিলেন। এই বইতে তিনি *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-কে ইতিহাস হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। একমাত্র রাজবৃত্তের ইতিহাস ছাড়া অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য এই বইতে লক্ষিত হয় না।

১৮৯৮ সালে আবদুল করিমের *ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত* (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র থেকেই জানা যায়, "Abdul Karim B. A., Assistant Inspector of Schools, Fellow of the Calcutta University, and Member of the Asiatic Society of Bengal." তিনি হিন্দু-মুসলমানের "সম্প্রদায়গত বিদ্বেষভাব ও কুসংস্কার" যাতে দূরীভূত হয় সেই চেষ্টাই এই বইতে করেছেন। তিনি 'ভূমিকা'-তে লিখেছেন, "মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের যে সকল অক্ষয়কীর্ত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্মদ্দেশীয় অনেকেরই অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি মহম্মদ কাসিম ফেরেস্তা ও অন্যান্য পুরাবৃত্তকারদিগের মূল গ্রন্থ হইতে মুসলমান রাজত্বপ্রকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি এতদ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অণুমাত্র প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, যদি এতদ্বারা মুসলমানদিগের বীরত্ব, উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে লোকের অযথা ধারণার কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব হয়, যদি এতদ্বারা মুসলমান পুরাবৃত্ত পাঠে লোকের যৎসামান্য অনুরাগেরও সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই আমি পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"[৭৯]

বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন*-এ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, ... তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখতিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।"[৮০] আবদুল করিমের বিশ্বাস : "বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে স্বীয় সৈন্যদল লুক্কাইত রাখিয়া, কেবল ১৮ জন সিপাহিকে অশ্ববিক্রেতার বেশ লইয়া, রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে কেহ কোনপ্রকার বাধা প্রদান করিল না। লাক্ষ্মণেয় অন্তঃপুরে আহার করিতে বসিয়াছিলেন এমন সময় বক্তিয়ার হঠাৎ রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া, প্রহরীদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। লাক্ষ্মনেয় পূর্ব হইতেই

মুসলমানদিগের আক্রমণের ভয় করিতেছিলেন, হঠাৎ বহির্দ্দেশে ভীষণ কোলাহল শুনিতে পাইয়া ভয়ে আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কম্পান্বিত কলেবরে পতনোন্মুখ হইলেন।"[৮১]

কতকগুলি ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস বই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো। ভারত ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই বইগুলির ইতিবাচক ভূমিকা আছে। এতে ইতিহাসের নানা বিষয়, নানা দিক আলোচিত। বহু মতামত এতে সন্নিবেশিত। তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস-বোধের সম্যক পরিচয় এই বইগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে ; তদুপরি এই সমস্ত বই পড়েই প্রাথমিকভাবে ছাত্রদের মধ্যে চেতনা জেগেছিল। ফলে এই বইগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র তো রাজকৃষ্ণের ছাত্রপাঠ্য বইটি সম্পর্কেই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "মুষ্টি ভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।"[৮২] রমেশচন্দ্র দত্তও উল্লেখযোগ্য ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস বই লিখেছিলেন।

ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস বই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও লিখেছিলেন। ১. *ভারতবর্ষের ইতিহাস / প্রাচীন আর্য্য হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্য্যন্ত* (১৮৯৫); ২. *প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৯২২), (এই বইটি *প্রাথমিক ভারতবর্ষের ইতিহাস* নামে পরিবর্তিত আকারে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়); ৩. *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* (১৮৯৫); ৪. *এ স্কুল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* (১৮৯৯) ; ৫. *বিগিনারস হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য আর্লিয়েস্ট টাইমস্ টু প্রেজেন্ট ডে* (১৮৯৯), বইটির লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং এইচ. সি. চ্যাটার্জী; ৬. *শর্ট হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* (১৯০৭) — এই বইগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসারে লেখা হয়েছিল। বইগুলিতে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষিত হয়।

৫

পাশ্চাত্যের ইতিহাসতত্ত্ব দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চা লালিত হয়েছে। কিন্তু, তবুও এদেশের ইতিহাসপ্রেমী মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও প্রদর্শনের প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁরা কখনো কখনো সচেতন বা অবচেতনে নতুন এবং নিজস্ব স্টাইলে ইতিহাসতত্ত্বের অবতারণা করার চেষ্টা করেছেন। ইয়োরোপীয় ইতিহাসবিদ্‌গণ ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার যে পথ নির্মাণ করেছেন, সেই পথে এদেশীয় পণ্ডিতগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চললেও তাঁদের মধ্যে অনেকেই নতুন পথ বার করার চেষ্টা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যাঁরা ইতিহাস-চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই জাতীয়তাবোধের জন্যই তাঁদের মধ্যে দেখা দেয় অতীতচারিতার প্রবণতা । আর এই জাতীয়চেতনা এবং অতীতচারিতা তাঁদের ইতিহাস-চর্চায় লক্ষ করা যায়। কখনও কখনও ইয়োরোপীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলি আলোচিত হয়েছে, এদেশের মানুষের পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে ওয়াকিফ্‌হাল হওয়ার জন্য

এবং ভারতীয় ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনার মানদণ্ড তৈরির জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ *রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস* (১৮৫৭) এবং *গ্রীসদেশের ইতিহাস* (১৮৫৭) লিখেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিভিন্ন রচনায় ইয়োরোপীয় ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই বারবার এসেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্ব ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রজনীকান্ত গুপ্তর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের লেখকদের মতো জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-চেতনার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। অবশ্যই এই জাতীয়তাবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুত্ববাদ। হিন্দু ধর্ম ও আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা রজনীকান্তর রচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর পাঁচ ভাগে লেখা *আর্য্যকীর্তি* (১৮৮৩-৮৫) বইটি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তিনি লিখেছিলেন *ভারত কাহিনী* (১৮৮৩), *বীরমহিমা* (১৮৮৬), *ভারত প্রসঙ্গ* (১৮৮৮) *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৮৯৯) প্রভৃতি গ্রন্থ। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কীর্তি পাঁচ খণ্ডে রচিত *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস* (১৮৭৯-১৯০০)। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে তিনি সিপাহী যুদ্ধ নিয়ে কাজ করেছেন। এই সময় তিনি অন্যান্য বইপত্রও লেখেন। লেখাই ছিল তাঁর রুজি-রোজগারের উপায়। হরপ্রসাদ ৩০ চৈত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দে সাবিত্রী লাইব্রেরির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর' (*বঙ্গদর্শন*, ফাল্গুন ১২৮৭ ব.)-তে লিখেছিলেন যে, রজনীকান্ত জীবিকা নির্বাহের জন্য সাহিত্যকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নানাবিধ পেশাদারী রচনার মধ্যে ইতিহাস বিষয়ক রচনাই বেশি। অবশ্য এর মধ্যে অনেকগুলি ছিল ছাত্রপাঠ্য বই। রজনীকান্ত ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে প্রাথমিক উপাদান (primary source) ব্যবহার না করে অন্যের রচনার (secondary source) উপরই নির্ভর করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত — আর্যতত্ত্ব থেকে শুরু করে সমকালীন ইতিহাস পর্যন্ত। আগেই উল্লেখ করেছি, *সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস*-ই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ। হরপ্রসাদ একসময় মন্তব্য করেছেন, "বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' লিখিতেছেন, যতদূর আমরা খবর পাইয়াছি, তাহাতে বেশ অনুভব করিতে পারি, বইখানি সম্পূর্ণ হইলে, বাংলায় একখানি অপূর্ব পাঠ্য বই হইবে।"[৮৩]

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস-এর পঞ্চম ভাগ রজনীকান্তের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হলে হরপ্রসাদ *বেঙ্গল লাইব্রেরি রিপোর্টে* লেখেন : এইটি রজনীকান্তের সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-এর তৃতীয় খণ্ড। লেখক এই বইয়ের মালমশলা সংগ্রহ করেছেন ইংরেজ লেখকদের রচনা থেকে, কিন্তু তিনি নানা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করে সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন নানা-র উপদেষ্টা আজিম-উদ-দৌলা এবং তাঁর আত্মীয় বাবা ভাই এবং অন্যান্যদের উপর। তাঁর মতে নানা নিষ্ঠুর ছিলেন না এবং ইংরেজদের

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি।[৮৪] রজনীকান্তের সামগ্রিক ইতিহাস - কর্মের মূল লক্ষ্যই ছিল জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানো। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই জাতীয়তাবোধকে অনুপ্রেরণার মূল কেন্দ্রভূমি হিসেবে স্থাপন করেছেন। এমন কি সিপাহী যুদ্ধের মধ্যেও যে জাতীয় জাগরণ দেখা দিয়েছিল তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এই বিদ্রোহ সৈনিক ছাড়াও সমস্ত স্তরের ভারতবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই রজনীকান্ত লেখেন, "ঐতিহাসিক যদি উহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও স্থিতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে তাহার উদ্বোধন হইবে যে এ মহাবিপ্লব কেবল সৈনিকে আবদ্ধ থাকে নাই।"[৮৫] কিন্তু জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার মধ্যেও অনেক দোটানা, পরস্পর বিরোধী চিন্তনের প্রকাশ ঘটেছে বিদেশি ঐতিহাসিকদের রচনার উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য। তবু রজনীকান্তের ইতিহাস-চিন্তায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ লক্ষ করা যায়।

সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে অনেক সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণাত্মক রচনা লিখেছেন। এই লেখাগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *সিপাহি বিদ্রোহ বা মিউটিনি* (১৩১৪ ব.) রজনীকান্ত গুপ্তের *সিপাহী বিদ্রোহ*-এরই প্রতিধ্বনি মাত্র । তাঁর ইতিহাসতত্ত্ব জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস* (১৯০৯) বইটিও উল্লেখযোগ্য। তিনি সিপাহিদের পক্ষাবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বইটি তৎকালীন সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের সমসাময়িক কালের অনেক শিক্ষিত বাঙালি সিপাহিদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা এবং ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করেছেন। এঁরা অধিকাংশই বড়ো বা ছোটো জমিদার, তালুকদার এবং জমির স্বত্বভোগী। ১৮৫৭ সালের ১৫ মে তারিখে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ভারত সরকারের সচিবকে একটি চিঠি সহ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীর একটি কপি পাঠান। উক্ত সভায় সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় — "That this meeting contemplates, with the highest and most sincere satisfaction, that the sepoy disaffection has met with no sympathy or encouragement from the civil population of any part of this vast empire, nor has it been shared in by the major portion of the native soldiery ; but that the same feelings of loyalty and attachment to the British rule, which they have hitherts been inspired with, still continue to animet them with unabated fidelity."[৮৬] ভারত সচিব সিসিল বিডন ২৬ মে, ১৮৫৭-য় রাধাকান্ত দেবকে তাঁর চিঠির উত্তর দেন। তাতে ব্রিটিশ সরকারের খুশির বার্তা ছিল। [৮৭] ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকও ভারত সচিবকে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে চিঠি লিখেছিলেন। কার্য-বিবরণীর ছত্রে ছত্রে রয়েছে সরকারের প্রতি আনুগত্য। অনেক জমিদার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন। ১৮

জুলাই ১৮৫৮ সালের *হরকরা* থেকে জানা যায় যে, শ্রীরামপুরের গোঁসাইরা সরকারকে কয়েকটি বাড়ি বিনা ভাড়ায় সৈন্যদের বসবাসের জন্য ছেড়ে দেয়। সরকারের কাছের লোক ছিলেন আরেক জমিদার — উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি হুগলির তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট এফ. আর. ককেরেলকে ১৮ জুন ১৮৫৭ সালে সিপাহীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন করেন।[৮৮] এমন কি যদুনাথ সর্বাধিকারীর *তীর্থভ্রমণ* (১৯১৫) গ্রন্থের 'সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ' অংশে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। সেখানে তিনি কোম্পানি সরকারের কোনও দোষ দেখেন নি, পক্ষান্তরে দেশীয় সিপাহি বিদ্রোহের সমর্থকদের তিনি হেয় করেছেন।[৮৯]

কিন্তু এটিই একমাত্র চিত্র নয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারকে কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে সিপাহি বিদ্রোহের জন্য কোম্পানি সরকার দায়ী। আর-একজন সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষও সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন।

৬

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস দৃষ্টি ছিল প্রখর। ইতিহাস বিষয়ে তিনি কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনা লিখেছিলেন। সেগুলি অনেককে ইতিহাস বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যের ইতিহাসতত্ত্ব সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের ধারণা ছিল স্পষ্ট। তিনি এ দেশীয় এবং বিদেশিদের লেখা ইতিহাস গ্রন্থাদি পাঠ করে নিজস্ব স্বাধীন মতামত গড়ে তুলেছিলেন। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকরা নিজেদের প্রয়োজনে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে মনগড়া মতামত তৈরি করে নিয়েছেন। অভিজ্ঞতার অভাবে ভুলের ইমারতও তৈরি করেছেন তাঁরা। সেই ভুল ক্রমশ আমাদের ইতিহাস চেতনাকে অনেকটাই বিপথগামী করেছে। রবীন্দ্রনাথ একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "... নিজের দেশের ইতিহাসের জন্য চিরদিনই কি এমন করিয়া পরের মুখে তাকাইয়া থাকা চলিবে?"[৯০] নবীন যুগের বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-সংস্কারের রীতি ও বিষয় সমূহকে রূপ দেওয়ার জন্য স্বাভাবিক কারণেই ইতিহাসের দ্বারস্থ হন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন, "নবীন ভারতবাসীর প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টার মধ্যে প্রাচীনের ওপর ঔৎসুক্য যতটা আছে, আধুনিকতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার লজ্জা তার চেয়ে কম নেই।"[৯১] আধুনিক ভারতের ইতিহাস-চর্চায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র উৎসাহ সেই লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে চেষ্টা করেছে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। ইয়োরোপীয় ইতিহাসবিদ্‌দের ভারত ইতিহাস-চর্চার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে খুঁটিয়ে দেখা উচিত, তার মধ্যে সত্যাসত্য কতটুকু। অক্ষয়কুমার লিখেছেন, "আমাদের ইতিহাস নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের ইতিহাস সংকলনের উপকরণেরও অভাব নাই। স্বদেশীয় গ্রন্থাদির ইতিহাসাংশের নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিলে, বিদেশীয় লেখকবর্গের

ভারত বিবরণীর সমুচিত সমালোচনা করিয়া তাহা হইতে সত্যোদ্ধার করিতে পারিলে, এখনও আমাদের ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে। ... পুরাতন রাজবংশের এবং জমিদার বংশের কত পুরাতন কাগজপত্র নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে, কখন বা স্থানাভাবে আবর্জ্জনারাশির সহিত অনাদরে অনলসাৎ হইতেছে, কে তাহার প্রতিলিপি রক্ষার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতেছেন?''[৯২] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা *ঐতিহাসিক চিত্র*-র প্রস্তাবনা পত্রে এদেশীয় ইতিহাসের উদ্ধার কর্মের প্রয়োজনীয়তা, সমস্যাবলী এবং তার উপায় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ইতিহাস আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি পূর্ণতা দান করতে চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস নিষ্ঠার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর *ঐতিহাসিক-চিত্র*-র প্রস্তাবনায় দেশের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের *ঐতিহাসিক-চিত্র*- র প্রস্তাবনা পত্র সম্পর্কে *ভারতী*-তে (ভাদ্র, ১৩০৫ ব.) লিখেছিলেন, ''হউক বা না হউক আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে।''[৯৩] স্বাধীন ইতিহাস-চিন্তার দ্বারা অক্ষয়কুমার চালিত হয়েছিলেন। তাঁর ভাবনা স্বদেশীয় চিন্তা ধারায় লালিত। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি স্বাধীন স্বদেশী ইতিহাস-বোধের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় *আত্মকথায়* লিখেছেন, ''এফ. এ. পড়িবার সময় মেকলের ক্লাইব এবং হেস্টিংসের গ্রন্থ আমাদের পাঠ্য ছিল। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন উপলক্ষে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ ডাউডিং সাহেবের সহিত প্রত্যহ আমার বচসা হইত। মেকলের বর্ণনা যে প্রকৃত নহে, তাহা সাহেবকে বুঝাইবার জন্য আমি নানা প্রমাণের অনুসন্ধান করিতাম। এই অনুসন্ধানকার্য্য দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়। তদুপলক্ষে বাঙ্গালার ইতিহাসের আমি বহু বিবরণ সংগ্রহ করি, তদবলম্বনে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে উপদেশ দান করেন। ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই বলিয়া, রানী ভবানীর জীবনচরিত উপলক্ষ করিয়া, ঐ সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করি।'' [৯৪] কোনও কারণে রানী ভবানীর উপর বইটি সেই সময় লেখা হয়নি। লেখা হয় *সমর সিংহ* (১৮৮৩), *সিরাজদ্দৌলা* (১৮৯৮), *সীতারাম* (১৮৯৮), *মীরকাসিম* (১৯০৬), *ফিরিঙ্গি বণিক* (১৯২২), *গৌড়লেখমালা* (১৯১২) ইত্যাদি। তা ছাড়া গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ভাবাদর্শ দ্বারা অক্ষয়কুমার পুরোপুরি চালিত হননি। তাঁর ভাবনায় স্বাতন্ত্র্য ছিল। স্বদেশকে সঠিকভাবে জানার এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ *ভারতী*-তে (শ্রাবণ, ১৩০৫ ব.) অক্ষয়কুমারের *সিরাজদ্দৌলা* সম্পর্কে লিখেছিলেন,

''... প্রথম শিক্ষাকালে ইংবাজের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিতাম।

তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক তাহার যে প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমাণ আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত একথা আমাদের বিশ্বাস হইত না। নীরবে নতশিরে আপনাদের প্রতি ধিক্কার সহকারে সমস্ত লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞানে বহন করিতে হইত।

"এমন অবস্থায় আমাদের দেশের যে কোনো কৃতী গুণী ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি আমাদের দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাপাত্র।"[৯৫]

ইতিহাস-অনুসন্ধানের জন্য অক্ষয়কুমার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লগ্ন (১৯১০) থেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। ইতিহাস অনুসন্ধানের কেন্দ্র হিসেবে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র প্রাণ-স্বরূপ ছিল।

ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্বের নজির *গৌড়লেখমালা*। এতে পালরাজাদের সময়কার শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া অক্ষয়কুমার আর্য সভ্যতা, পাল-সেন রাজত্ব, মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনের মধ্যবর্তীকাল সম্পর্কে নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে জাতীয় ইতিহাস গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পরই ইতিহাসবিদ্ হিসেবে নিখিলনাথ রায়ের নাম মনে আসে। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় বহরমপুরে *বঙ্গদর্শন*-এর লেখক রামদাস সেনের সংস্পর্শে আসেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা "একযোগে 'বঙ্গদর্শন' চালাইয়াছিলেন ও বাংলা ভাষার সেবার জন্য একটা মজলিস তৈয়ার করিয়াছিলেন"[৯৬] তাঁদের মধ্যে রামদাস সেন অন্যতম। ছোটোবেলা থেকেই নিখিলনাথের কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল। *রাজপুত কুসুম* (১২৯১ ব.) নামে তাঁর একটি কবিতার বই ছিল। তিনি লিখেছেন, "যদিও আমি কবিতা পড়িতে ও লিখিতে ভালবাসিতাম বটে ; কিন্তু বাল্যকাল হইতে ইতিহাসই আমার আদরের পাঠ্য ছিল।"[৯৭] বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস নিয়ে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস নিয়ে তাঁর বই — ১. *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* (১৮৯৭) ২. *মুর্শিদাবাদ কায়স্থ সমিতি* (১৯০২), ৩. *জগৎ শেঠ* (১৯১২)। তা ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ — *প্রতাপাদিত্য* (১৯০৬)।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর ভূমিকায় নিখিলনাথ লিখেছেন, "ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যে সকল প্রবন্ধ সংবাদ ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাদের সহিত আরও কতকগুলি যোগ করিয়া 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী মৎপ্রণীত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের একরূপ পূর্বাভাষ।"[৯৮] ইংরেজ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাদির উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন নি। তাঁর ইতিহাস চিন্তার পিছনে ছিল স্বাদেশিক প্রেরণা।

৭

প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে সমসাময়িক অনেক দেশি-বিদেশি ইতিহাসবিদের সঙ্গে হরপ্রসাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। অবশ্যই সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভারততত্ত্ব এবং ইতিহাস-চর্চাকে কেন্দ্র করে। সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধান এবং আলোচনাও চলত ; কিন্তু তারও মূলে ছিল ইতিহাস-চর্চার তাগিদ। ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রান্তের ভারততত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে হরপ্রসাদের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তাঁরা হরপ্রসাদের কাছে বারবার প্রার্থী হয়েছেন নানা বিষয় বুঝতে, সঠিক সিদ্ধান্তের পথ নির্দেশের আশায় অথবা তাঁদের কাজ সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কাছে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার অন্য মূল্য ছিল। "প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহের মূলে পশ্চিমী জাতিগুলির সাম্রাজ্যিক স্বার্থের যোগ যেমন ছিল, তেমনি মানব সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানার শুদ্ধ অনুসন্ধিৎসাও ছিল। ... আভ্যন্তরীণ সংকট কাটিয়ে ওঠার আয়াসে আধুনিক য়ুরোপ প্রাচ্য শিল্প সংস্কৃতির সাহায্য নিয়েছে। বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে পাশ্চাত্যের আত্মিক সংকট ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠে এবং পশ্চিমী মনীষী সমাজে প্রাচ্য থেকে আলো পাবার আকুলতা বাড়ে। সমসাময়িক পাশ্চাত্য ভারতবিদ্যাবিদদের নিবিষ্ট গবেষণায়ও প্রাচ্য-বিবিক্ষু পশ্চিমী মানসিকতার প্রমাণ পাই।"[৯৯] ভারততত্ত্ব বা ভারত ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করতে হলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহায্য প্রয়োজন। কারণ, তিনি অনেক পুথি নিয়ে কাজ করেছেন। এই সমস্ত পুথি ভারত-ইতিহাসের উপাদান। এই উপাদান নিয়ে কাজ করতে গেলে হরপ্রসাদের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। সিসিল বেন্ডল হরপ্রসাদকে বারবার প্রশ্ন করেছেন — "where was all that Buddhism gone?" [১০০] প্রশ্ন করেছেন আরও নানা বিষয়ে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক বেন্ডল পুথির সন্ধানে কয়েকবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি এবং বেন্ডল পুথির খোঁজে নেপাল যান এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তথ্যানুসন্ধান করেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের জন্য হরপ্রসাদের উপর নির্ভরতার নিদর্শন বেন্ডলের চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে। ২০ নভেম্বর ১৯০১ সালে একটি চিঠিতে হরপ্রসাদকে বেন্ডল লিখছেন যে, ক্যাটালগের ভূমিকা লেখার কাজ তিনি প্রায় শেষ করেছেন। ক্যাটালগ ও জর্নালের প্রবন্ধ যদি দু'জনেই কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ করতে পারেন তা হলে চমৎকার হয়।[১০১] আবার ২৪ জানুয়ারি ১৯০২ তারিখের চিঠিতে লিখছেন, নেপালের দুর্লভ রচনাগুলির মিশ্র সংস্কৃতর ব্যাখ্যা সম্পর্কে হরপ্রসাদের মতামত পেলে তিনি খুশি হবেন। [১০২]

ঐ একই চিঠিতে বেন্ডল আর-একজন ভারততত্ত্ববিদ আর্থার অ্যান্টনি ম্যাকডোনেল, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন-অধ্যাপক ছিলেন, সম্পর্কে হরপ্রসাদকে লিখছেন, অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বৈদিক পাণ্ডুলিপি দেখার

জন্য হরপ্রসাদের কাছে আবেদন করেও কোনো উত্তর পাননি। তাঁকে সাহায্য করলে বেন্ডল খুশি হবেন।[১০৩] পরবর্তীকালে ম্যাকডোনেলের সঙ্গে হরপ্রসাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল ভারততত্ত্বের নানা কাজের সূত্রে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে সিসিল বেন্ডলের কাজগুলি উল্লেখযোগ্য — *ক্যাটালগ অব বুদ্ধিস্ট স্যানস্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন দ্য ইউনির্ভাসিটি লাইব্রেরি অব কেমব্রিজ* (১৮৮৩), *ক্যাটালগ অব স্যানস্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন ব্রিটিশ মিউজিয়াম* (১৯০২), শান্তিদেবের *শিক্ষা সমুচ্চয়* গ্রন্থের অনুবাদসহ সম্পাদনা (১৮৯৭) এবং *সুভাষিত সংগ্রহ* (১৯০৩)।

তারনাথের মতে, সৌরাষ্ট্র রাজার ছেলে শান্তিদেব। পরবর্তীকালের পণ্ডিত বেন্ডলেরও তাই মত। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্যমত পোষণ করেন। তাঁর মতে শান্তিদেব বাংলার লোক।[১০৪] শান্তিদেব এবং ভুসুকু একই ব্যক্তি। ভুসুকু চর্যাপদের কবি। শান্তিদেব রাউত। রাউত শব্দের অর্থ সেনাপতি। তিনি *শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রাবলিবিধি* নামে একটি তন্ত্রের পুথি লিখেছিলেন, এ তথ্য *তেঙ্গুর* থেকে পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর মানুষ শান্তিদেব *শিক্ষা সমুচ্চয়, সূত্র সমুচ্চয়ে* এবং *বোধিচর্য্যাবতার* নামে তিনটি মহাযানী গ্রন্থ রচনা করেন। হরপ্রসাদ বলেন,"'শিক্ষা সমুচ্চয়ে' অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় লেখা। এখন আপত্তি উঠিতে পারে যে, শান্তিদেবের যে দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইখানিই মহাযানের বই ; শেষে যেখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি হয় বজ্রযানের, না হয় সহজযানের। এক লোক কি দুই যানের বই লিখে? এ সম্বন্ধে বেন্ডল সাহেব বলেন যে, 'শিক্ষা সমুচ্চয়ে'ও তান্ত্রিক ধর্মের অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরাও দেখিয়াছি যে, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান মহাযান ছাড়া নয়।"[১০৫] হরপ্রসাদ *দি জর্নাল অব দ্য বুদ্ধিস্ট টেক্সট অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি* (পার্ট - ১, ১৮৯৪)-তে শান্তিদেবের *বোধিচর্যাবতারম্* প্রকাশ করেন। আবার *ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি* (১৯১৩) -তে লেখেন 'শান্তিদেব' নামে একটি প্রবন্ধ। হরপ্রসাদ যে শান্তিদেব চর্চা করতেন সে সম্পর্কে বেন্ডলের আগ্রহ ছিল। তিনি হরপ্রসাদকে একটি চিঠিতে (২৭ মে, ১৯০২) লিখেছিলেন যে, শান্তিদেবের কাজের উপর হরপ্রসাদ বক্তৃতা দিচ্ছেন শুনে তিনি খুশি হয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, পুঁসা সম্পাদিত *বিবলিওথেকা ইন্ডিকাতে* যে ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে তা তিনি ব্যবহার করেছেন কিনা।[১০৬] লুই দ্য লা ভ্যালে পুসাঁ শান্তিদেবের লেখা এবং প্রজ্ঞাকরমতির টীকা সমেত *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* (১৯০১-১৪) খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে পণ্ডিত পুসাঁ হরপ্রসাদকে এক চিঠিতে (১৯০৩) লিখেছিলেন, *বোধিচর্যাবতারের* প্রথম খণ্ডের কয়েকটি কপি তিনি দেখতে চান। কারণ, বেন্ডলেরটা ছাড়া ঐগুলি তিনি দেখেন নি।[১০৭]

বেন্ডলের সঙ্গে হরপ্রসাদ পুথির সন্ধানে নেপালে যান। হরপ্রসাদ নিজেই লিখেছেন, "১৮৯৭-৯৮ খৃস্টাব্দে যখন আমি দুইবার নেপালে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই।"[১০৮] তার মধ্যে একটি *সুভাষিত সংগ্রহ*। এই পুথিটির কপি

করে নেন বেন্ডল নিজে। আর-একটি পুথি কপি করে নেন হরপ্রসাদ। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "বেন্ডল সাহেব সুভাষিত-সংগ্রহখানি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার সময় আমার দোঁহাকোষ পঞ্জিকাখানি লইয়া যান, আমি সেখানি আর ফিরিয়া পাই নাই। পরে নেপালে শুনিতে পাইলাম, যে পুথিখানি হইতে আমার দোহাকোষ পঞ্জিকা নকল হইয়াছিল তাহা জাপানে চলিয়া গিয়াছে।"[১০৯]

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য বেন্ডল যে অনেকাংশে হরপ্রসাদের উপর নির্ভর করতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বেন্ডলের সূত্র ধরে হরপ্রসাদের সঙ্গে ম্যাকডোনেলের পরিচয় হলে ম্যাকডোনেল একটি চিঠিতে (৪ নভেম্বর, ১৯২৬) তাঁকে অনুরোধ করেন, তাঁর একজন জাপানি ছাত্র মিয়ামোতো শো সোন-কে সাহায্য করার জন্য। তিনি লিখেছিলেন, বাংলার গৌরবজনক বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যাতে সে জানতে পারে, সেই ব্যবস্থা করলে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।[১১০] অক্সফোর্ডের হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ছাত্র এবং তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিয়ামোতো *মহাযান অ্যান্ড হীনযান* এবং *আউটলাইন অব বুদ্ধিজ্‌ম* নামে দুটি বই লিখেছিলেন।

মিয়ামোতোকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য ফ্রেডরিক উইলিয়ম টমাস হরপ্রসাদকে আর একখানি চিঠিতে (৮ নভেম্বর, ১৯২৬) লেখেন যে, বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পণ্ডিত মিয়ামোতোর সঙ্গে হরপ্রসাদের আগ্রহের অনেক মিল আছে। হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত বৌদ্ধপুথির অনেকগুলিই তিনি পড়েছেন। তিনি নেপাল যাওয়ার আশা পোষণ করছেন। অনুমতি পেলে হরপ্রসাদের মূল্যবান উপদেশ ও সুপারিশ তাঁর বিশেষ কাজে লাগবে।[১১১]

টমাস ছিলেন অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ভাষার বোডেন অধ্যাপক এবং রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ও ডিরেক্টর। তিনি *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*-র ১৩ থেকে ১৬ খণ্ড প্রকাশ করেন। ভারতীয় লেখমালার পাঠোদ্ধারে তাঁর খুব খ্যাতি হয়েছিল। তা ছাড়া *কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*-র প্রথম খণ্ডে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, মৌর্যযুগের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা এবং অশোক সম্পর্কে প্রবন্ধাদি রচনা করেন। তিব্বতি পুথির অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন তিন খণ্ডে — *টেক্সটস্ অ্যান্ড ডকুমেন্টস কনসার্নিং চাইনিজ তুর্কিস্তান* (১৯৩৫, ১৯৫১ এবং ১৯৫৪)। বহু ভাষাবিদ্ এবং ভাষাতত্ত্বে প্রগাঢ় পণ্ডিত টমাস ভাষাতাত্ত্বিক নানা কাজ করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে নেওয়ারি লিপিতে যে কবিতা-সংগ্রহ *কবীন্দ্র রচনা সমুচ্চয়* আবিষ্কার করেন (১৮৯৫ - ১৯০০) তা বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকাসহ টমাস ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে *বিবলিওথেকা ইন্ডিকা* সিরিজে প্রকাশ করেন।

সিলভ্যাঁ লেভি পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এ্যকল দ্য আউত্‌স এতুদ্‌সে - এ সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। ভারততত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্রের রচনা *বৃহৎকথা মঞ্জরী* সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে (১৮৮৫)

প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর গবেষণার সূত্রপাত। ক্রমে ক্রমে ভারত-ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুসন্ধিৎসা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য এবং বহির্ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। এই সমস্ত গবেষণাকে কেন্দ্র করে হরপ্রসাদের সঙ্গে লেভীর গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চিঠিপত্রের মাধ্যমেও নান বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মত বিনিময় হতো।

লেভি ১৯০৭ সালে অসঙ্গ রচিত *মহাযানসূত্রালঙ্কার* সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। পরে তিব্বতি ও চিনা ভাষায় অনুবাদিত পুথিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে ১৯১১ সালে উক্ত বইটির ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ২২ জুলাই, ১৯১০ - এ লেভি হরপ্রসাদকে *বিবলিওথেকা ইন্ডিকা-র* একটি খণ্ড উপহার দেওয়ার জন্য একটি চিঠিতে লেখেন, শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা না থাকায় তিনি এ ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা অনায়াসে পড়তে পারেন না। *মহাযান সূত্রালংকারের* মতো বই হরপ্রসাদ অনায়াসে যে পড়ে গুণাগুণ বিচার করতে পারেন তা দেখে তিনি বিস্মিত। লেভি জানান, চিনা ও তিব্বতি অনুবাদের সাহায্যে তিনি এর একটি ফরাসি তর্জমা প্রকাশ করবেন।[১১২]

লেভি এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে *বুদ্ধচরিত*-এর ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ (১৮৯২) করেন। পরবর্তীকালে (১৯০৮, ১৯২৮ এবং ১৯২৯) এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে অশ্বঘোষের বিভিন্ন দিক নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করে তিনি একজন অশ্বঘোষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দ*কাব্য আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ। তিনিও অশ্বঘোষ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টারলির* (জুন, ১৯২৫) 'দি নর্দার্ন বুদ্ধিজম' প্রবন্ধে। ইতিপূর্বে *জর্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* (নিউ সিরিজ : ৫. ১৯০৯) - এ হরপ্রসাদ *বুদ্ধচরিত*-এর পুথি নিয়ে লেখেন, 'এ নিউ ম্যানাস্ক্রিপ্ট অব বুদ্ধচরিত' নামে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। হরপ্রসাদ *সৌন্দরনন্দ* কাব্যটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন *বিবলিওথেকা ইন্ডিকা* সিরিজে (১৯১০)। লেভি ২২ জুলাই ১৯১০ তারিখে হরপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে *সৌন্দরনন্দ* সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। "I am very eager to hear more of the Saundarananda. Do you propose an edition of it ? I never read the name among the works of Asvaghosha. If it is an authentic one, it is certainly derived from the Vinaya of the Mula Sarvastivadin. I have compared many recensions of the tale of Saundarananda in different vinayas. Please let me know more about your plans concerning the publication of this kavya." [১১৩] এই চিঠির পাঁচ মাস পরে, অর্থাৎ ২১ অক্টোবর ১৯১০ সালে লেভি আর-একটি চিঠিতে হরপ্রসাদকে লিখছেন, "I am still longing for your Saundarananda ; when is it to be printed ?"[১১৪] হরপ্রসাদের কাজ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাই তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, "I am no less interested in bardic lore collected in

Rajputana."[১১৫] এবং ২২ জুলাই ১৯১০-এ লিখেছেন, "I am also waiting for your Nepal Catalogue. You are indeed a wonderful Pandit and a fortunate man having done such a successful work in Nepal and in Bengal !"[১১৬]

ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় জর্মন পণ্ডিত য়ুলিউস য়োলি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মনু নারদ প্রমুখের স্মৃতিগ্রন্থ ব্যবহার করে হিন্দু আইন সম্বন্ধেও গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঠাকুর ল লেকচারার হন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর একটি বই লেখেন, পরবর্তীকালে, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তা *ইন্ডিয়ান মেডিসিন* নামে পুনা থেকে ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই কাজ করতে গিয়েও য়োলি-কে হরপ্রসাদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ১১ জানুয়ারি ১৯০২ সালে লেখা একটি চিঠিতে য়োলি লিখছেন, "My work on Indian Medicine for which you enquire is just out, in Buhler's Encyclopaedia of Indo-Aryan Research. It contains a long reference to the Medical Sanskrit Compilations noticed in your valuable Report on the Search of S. Mss. 1895 to 1900. I do not send you a copy of my work, as it is written in German. I should have written it in English, as you have very properly suggested me ..."[১১৭] কিন্তু জর্মানিতে বসে কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় পুথির অভাব তিনি অনুভব করেন। এ ব্যাপারে পি. কর্ডিয়ার এবং বেন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও বিশেষ সুবিধা হয়নি। তিনি ক্রমেই হরপ্রসাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, "Those medical Sanskrit Mss. would have to be selected which you think particularly important." [১১৮] শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলি পাওয়ার জন্য য়োলি হরপ্রসাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ; এমন-কি কলকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে কি কি দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পুথি আছে, সেগুলি দেখা যাবে কিনা এ সমস্ত প্রসঙ্গ য়োলি হরপ্রসাদের কাছে জানতে চেয়েছেন।[১১৯]

ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্য থেকেও ইতিহাসের সত্য উদঘাটিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষাতত্ত্ব এবং ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনাতেও তাঁর ইতিহাসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং তিনি অনেক সময়েই ইতিহাসের অন্বেষণ করেছেন ভাষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। তাই গ্রিয়ার্সনের সঙ্গে হরপ্রসাদ নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ১৮৭৩ থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। ভারতীয় ভাষা উপভাষা নিয়ে নিরন্তর কাজ করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে *রিপোর্ট অন দা লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া (১৯০৪ - ১৯২৮)*। বিস্তৃত ভাষাতাত্ত্বিক সংবাদ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের পাশাপাশি তিনি ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব,

সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন।

বিদ্যাপতির *কীর্তিলতা* ইতিহাসের উপাদান । গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির ভাষা ও সময় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। তিনি বিদ্যাপতির *পুরুষপরীক্ষা*-র (১৯৩৫) অনুবাদ করেছিলেন। *কীর্তিলতা* আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। *কীর্তিলতা*-র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "মহামান্য সার জর্জ গ্রীয়ারসন সাহেব যখন বিদ্যাপতির গানগুলি উদ্ধার করিতে থাকেন, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির আপনার সময়ের ঘটনা লইয়া দুখানি কাব্য লিখেন, একখানির নাম 'কীর্তিলতা', আর একখানির নাম 'কীর্তিপতাকা'। লোকের সংস্কার হইয়াছিল দুখানিই শিবসিংহের কীর্তি লইয়া লেখা। ১৮৯৮ সালে আমি একবার নেপাল যাই। তখন দরবারের পুথিখানায় দুখানি পুথিই দেখি এবং তাহার নকল আনি।... আবার যখন ১৯২২ সালে নেপাল যাই তখন দেখিয়া আসি পুথি দুখানি ঠিক আছে কিনা। পরে মহারাজা সার সম্‌সের জঙ্গ মহাশয়ের অনুগ্রহে পুথি পাইয়া 'কীর্তিলতা' প্রকাশ করিতেছি।"[১২০] হরপ্রসাদের সম্পাদনায় *কীর্তিলতা* প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রিয়ার্সন ১৮ মার্চ ১৯২৬ সালে তাঁকে একটি চিঠিতে লেখেন যে, তিনি *কীর্তিলতা* আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে পড়েছেন। সফল সম্পাদনা ও গুরুত্ব পূর্ণ কাজের জন্য হরপ্রসাদকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন ।[১২১] আবার ২৭ মার্চ ১৮২৯ তারিখের একটি চিঠিতে তিনি হরপ্রসাদকে লেখেন যে, হরপ্রসাদ সম্পাদিত ও অনুদিত *কীর্তিলতা* তাঁর কাছে এত আকর্ষণীয় মনে হয়েছে যে তাঁর ইচ্ছা ভবিষ্যতে এর ভাষা তিনি বিশ্লেষণ করবেন। সে সময় হরপ্রসাদ সম্পাদিত বইটি তাঁর খুব কাজে লাগবে।[১২২]

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদরা, যেমন ভিলেম কালান্ড, ফ্রেডারিক এডেন পার্জিটার , লুই দ্য লা ভ্যালে পুসাঁ, ফিদর ইপ্পোলিতোভিচ শ্চেরবাটস্কোই, স্টেন কনো প্রমুখ, ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীত, সংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে জানতে চেয়ে তাঁকে বারবার চিঠিপত্র লিখেছেন। এর থেকে বোঝা যায় হরপ্রসাদ ভারততত্ত্ব এবং ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে কতটা মাননা পেতেন। ভারততত্ত্ব তথা ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে এই সমস্ত ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং হরপ্রসাদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, অর্থাৎ জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা লক্ষিত হয়।

৮

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-চর্চা উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল* (১৯০১) বইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক জাতীয়তাবাদী । বইটির বিষয় রাজনৈতিক ইতিহাস। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রামপ্রাণ গুপ্ত *রিয়াজ- উস্-সালাতিন*-এর যে সটীক অনুবাদ করেন তার প্রথম অংশের টীকা

লিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে *আবদুস সালাম রিয়াজ-উস্-সালাতিন*-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা *বাঙ্গালার ইতিহাস* (তৃতীয় ভাগ) তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লিখেছিলেন যথাক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৫৯) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৪৮)। "... ভূদেব বেন্টিঙ্কের পরবর্তীকাল থেকে বাংলার ছোটলাট বীডনের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলার ইতিবৃত্ত সংকলন করেন। এই সংকলন মূলত তাঁর স্বাধীন চেষ্টা ও চিন্তার ফল। ... বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগের প্রথমাংশ 'শিক্ষাদর্পণে' ও শেষাংশ 'এডুকেশন গেজেটে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৬৫-৬৯)।"[১২৩]

উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষীদের অন্যতম ভূদেব সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন দেখা গেলেও তিনি ছিলেন হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী। তার প্রতিফলন দেখি ভূদেবের *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২) এবং *আচার প্রবন্ধ*-তে (১৮৮৫)। এই দুটি বই সম্পর্কে হরপ্রসাদ *বেঙ্গল লাইব্রেরি রিপোর্টে* দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[১২৪]

ভূদেবের রচনায় হিন্দুত্বের প্রকাশ প্রকট। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মমত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ইতিবৃত্তও রচনা করেছেন। হরপ্রসাদ এক সময় শিবনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "তিনি স্বদেশীর জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।"[১২৫] তাঁর *আত্মচরিত*-এ (১৯১৮) এই সত্য সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* শুধুমাত্র একটি জীবনী গ্রন্থ নয়, সামাজিক ইতিবৃত্তের নানাদিক এতে চিত্রিত হয়েছে। এই সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর *হিস্ট্রি অব দ্য ব্রাহ্মসমাজ* (১৯১১-১২) বইটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে দেশের ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগুলির মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপকরণ ব্যবহার করেছেন এবং তথ্য প্রমাণাদি সহযোগে 'ইতিহাস' উদ্ধারও করেছেন। *তাঁর চর্যাপদ, রামচরিত, কীর্তিলতা, শ্রীধর্মমঙ্গল* প্রভৃতির আলোচনা শুধুমাত্র সাহিত্যিক আলোচনা নয়, সেগুলি ইতিহাসের উপাদান হিসেবে যথার্থই বিশ্লেষিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (১৯০১) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলা দেশের বিচিত্র শাখা-প্রশাখা সম্পন্ন ইতিহাস বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।"[১২৬] এবং "সাহিত্যের স্তরে স্তরে"[১২৭] যে নিগূঢ় ইতিহাস থাকে তা ঠিক মতো জানতে পারলে "প্রকৃতভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি।"[১২৮] সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য চেয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র। হরপ্রসাদের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি তাঁর "ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এক

বৎসরের জন্য দীনেশবাবুর কাছে"[১২৯] রেখে দেন। হরপ্রসাদের মতে, "ইহাতে পূর্ববাংলায় পুথি খোঁজার সুবিধা হইবে।"[১৩০] বিস্তর পুথিপত্র দেখে এবং পরীক্ষা করে তিনি যে *বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য* রচনা করেন তা ইতিহাস-চর্চার ই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই বইটির ইংরেজি সংস্করণ *হিস্ট্রি অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার* প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। এই ইংরেজি সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার আগে রমেশচন্দ্র দত্তের *দি লিটারেচার অব বেঙ্গল* (১৮৭৭) বইখানিই ছিল একমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস, যেখানে সাহিত্য ও ইতিহাসের যথার্থ দৃষ্টির পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। "জাতীয়তার আদর্শের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই রমেশচন্দ্র এই পুস্তকখানিতে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, পরন্তু বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাস চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।"[১৩১]

রমেশচন্দ্র দত্তর মতো বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিককে সভাপতি করে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে জাতীয় চেতনার প্রকাশ পরিলক্ষিত। সাহিত্য, পুরাকীর্তি এবং জাতীয় জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধানের এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন বিদ্বজ্জন অনুভব করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পাশাপাশি সাহিত্য- পরিষদের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙালির জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকাশের পথ সুগম হয়েছিল । ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩০ জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিদায়ী সভাপতির ভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "ইহা [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ] খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গলের জন্য জন্মিয়াছে এবং খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গল করিতেছে। সকল বাঙালিরই ইহাতে যোগ দেওয়া উচিত এবং দিতেছেনও অনেকে— ইংরেজিওয়ালাও দিতেছেন, সংস্কৃতওয়ালাও দিতেছেন, আরবি-পারসিওয়ালাও দিতেছেন। এখানে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই, আচরণীয় অনাচরণীয় ভেদ নাই। ইহার উদ্দেশ্য, বাংলার সীমার মধ্যে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে, সেইগুলি বাহির করা এবং তাহার একটি উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়া — ইহাতে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হইবে না— এরূপ খাঁটি মঙ্গলময় ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলেও সেটি আমি ধর্ম বলিয়া মনে করি। আপনারা যদি ধর্ম অধর্ম না মানেন, আমি সেটা পুণ্য বলিয়া মনে করি, আপনারা যদি পাপ পুণ্য না মানেন, আমি ইহাকে ধর্ম, পুণ্য ও ভাগ্য, এই তিন বলিয়াই মানি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি এরূপ পুণ্যময় অনুষ্ঠানের সহিত এত দীর্ঘকাল জড়িত ছিলাম।"[১৩২] এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-কে ঘিরে ইতিহাস অনুসন্ধানের যে কর্মযজ্ঞ চলেছিল *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার* সংখ্যাগুলি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দেখলে সহজেই অনুমান করা যাবে।

এছাড়া ইতিহাস -অনুসন্ধানের আরও একটি প্রতিষ্ঠান বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত (১৯১০) হয় রাজশাহীতে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দীঘাপতিয়ার জমিদার শরৎকুমার রায়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হন।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র *গৌড়লেখমালা* (১৯১২) বাংলার পাল রাজত্বকালের তাম্রশাসনাদি লেখ সংগ্রহ। এই লেখমালা ইতিহাস রচনার মূল উপাদান। পালযুগের আর-একটি উপাদান সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দি পালস্ অব বেঙ্গল*। এরপর রাখালদাস *বাঙ্গালার ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড, ১৯১৫ এবং দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯১৭) প্রকাশ করেন। রমাপ্রসাদ চন্দ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন *গৌড়রাজমালা*। তাঁর নৃতত্ত্ব বিষয়ক বই *এরিয়ান রেসেস* (১৯১৬) বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই সঙ্গে এফ. জে. মোনাহান-এর *আর্লি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (১৯২৫), কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মধ্যযুগের বাঙ্গালা* (১৯২৩), রমেশচন্দ্র মজুমদারের *আর্লি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (১৯২৪) হেমচন্দ্র রায়ের *ডাইনাস্টিক হিস্ট্রি অব নর্দার্ন ইন্ডিয়া* (প্রথম খণ্ড, ১৯৩১) প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাজগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর *কয়েনস অ্যান্ড ক্রনলজি অব দ্য আর্লি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুলতান্স অব বেঙ্গল* (১৯২২), ননীগোপাল মজুমদারের *ইন্সক্রিপ্শন্স অব বেঙ্গল* (১৯২৯), পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের *কামরূপ শাসনাবলী* (১৯৩১) এবং বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের *দি বুদ্ধিস্ট আইকনগ্রাফি* (১৯২৪) বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস-চর্চার বিশিষ্ট নিদর্শন।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর *বাংলার ইতিহাস সাধনা*-তে লিখেছেন, "... ১৯১৬ সালেই বাংলার তৎকালীন গভর্ণর রোনাল্ড্সের একান্ত সচিব ডব্‌ল্-ইউ. আর. গুরলে সাহেব তিন খণ্ডে একখানি বাংলার ইতিহাস সংকলনে উদ্‌যোগী হন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের সমবেত চেষ্টায় ওই সংকলন কার্য সম্পন্ন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেনকে আমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে উক্ত তিন খণ্ডের অধ্যায় বিভাগ, লেখক নির্বাচন প্রভৃতি প্রাথমিক কার্য অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু নানা কারণে এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। তথাপি সংঘবদ্ধভাবে বাংলার সম্পূর্ণ (প্রাচীনতম কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) ইতিবৃত্ত সংকলনের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ঘটনাটি স্মরণীয়।"[১৩৩] পরবর্তীকালে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (প্রথম খণ্ড, ১৯৪৩) এবং যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪৮) প্রকাশিত হয়। এই খণ্ড দুটি যথাক্রমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহর সম্পাদনায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ১৭৫৭-১৯০৫*।

রাজেন্দ্রলাল - বঙ্কিমচন্দ্র - রমেশচন্দ্র - রাজকৃষ্ণের সাহচর্যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আনুকূল্যে, তাঁর নিজস্ব সময়ের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের ইতিহাস-চর্চার আলোকে হরপ্রসাদের ইতিহাস বোধের জন্ম। তাঁর কালে যে ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল

তার মূলে, প্রধানত, ছিল জাতীয় চেতনা এবং স্বদেশানুরাগ। হরপ্রসাদের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসাও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা দ্বারা চালিত এবং তিনি রাজবৃত্তের ইতিহাস অপেক্ষা সাধারণ মানুষের সামাজিক ইতিহাস উদ্ঘাটনে আগ্রহী বেশি।

সূত্রনির্দেশ

১. Sibdas Chaudhuri (ed.) *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. I, (1784-1800), Calcutta, 1980, pp. 2-6.

২. "The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia,and within these limits its enquiries will be extended to whatever is performed by man or produced by nature." – R. L. Mitra, *Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal*, Part - I, Calcutta, 1884, p. 4-5.

৩. প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলিত বিদ্যাচর্চার ফল এশিয়াটিক সোসাইটি। জোন্স প্রাচ্যবিদ্যা - চর্চার জন্য প্রাচ্যের পণ্ডিতদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রাচ্যের বহুমুখী বিদ্যার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। এই বহুমুখী বিদ্যার ফলশ্রুতিই হচ্ছে ইতিহাস চর্চা । বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য দ্র. Edward W. Said, *Orientalism*, London, 1978, pp.7-8, 77-79.

৪. Sibdas Chaudhuri, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

৫. তদেব, পৃ. ২৫।

৬. দ্র. উইলিয়ম জোন্সের বক্তৃতা, *Progs, ASB*, 15 January, 1784.

৭. Edward W. Said, *প্রাগুক্ত*, London, 1978, pp.7-8.

৮. Sibdas Chaudhuri, *প্রাগুক্ত*, পৃ. (১৫) ।

৯. তদেব, পৃ. (১৫)।

১০. তদেব, পৃ. (১৬)।

১১. N. B., Halhed, *A Grammar of the Bengal Language,* Unabridged facsimile edition, Calcutta, pp. XXIII - XXIV.

১২. O. P. Kejariwal, *The Asiatic Society of Bengal and the Discovery ol Indias Past,* New Delhi, 1988, p. 20.

১৩. Sibdas chaudhuri, *প্রাগুক্ত*, পৃ. (৩৩) (৩৬)।

১৪. তদেব, পৃ. (৩৩) (৩৬)।

১৫. Ranajit Guha, *An Indian Historiography of India : A Nineteenth Century Agenda and its Implications,* Calcutta, 1988, pp. 1-7.

১৬. Susobhan Sarkar, *Bengal Renaissance and other Essays,* New Delhi, 1981, p. 3.

১৭. দ্র. অলোক রায়, *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১০৪-৩০।

১৮. ননীগোপাল মজুমদার, 'চল্লিশ বৎসর পূর্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্র', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৮৫।

১৯. *তদেব*, পৃ. ৮৬।

২০. Rajendralal Mitra, 'Preface', *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal,* Calcutta, 1971.

২১. অলোক রায়, *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*, ১৯৬৯, পৃ. ১৩১-৫৪

২২. *তদেব*, পৃ. ১৫৯-৬৭।

২৩. *তদেব*, ১৭৫।

২৪. ননীগোপাল মজুমদার, *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৯৯।

২৫. অফ্রের চিঠি উদ্ধৃত। *তদেব*, পৃ. ৯৯।

২৬. সুশীল কুমার দে, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', *তদেব*, পৃ. ২১৬।

২৭. 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৬৫।

২৮. 'সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং*-২, পৃ. ২৬৩।

২৯. ম্যাক্সম্যুলরের চিঠি উদ্ধৃত। দ্র. J. N. Gupta, *Life and works of Romesh Chunder Dutt C. I. E,* London, 1911, p. 118.

৩০. কাওয়েলের চিঠি উদ্ধৃত। *তদেব*, পৃ. ১১৮।

৩১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বেদের ঈশ্বরবাদ', *প্রচার*, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক, ১২৯২, পৃ. ১৪৭-৫২।

৩২. Haraprasad Shastri, *Report of Bengal Library, 1889*, p. 4.

৩৩. 'বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৫২০।

৩৪. দ্র. J. N. Gupta, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

৩৫. *তদেব*, পৃ. ১৩২।

৩৬. Haraprasad Shastri, *Report of the Bengal Library, 1891*, p. 7

৩৭. Romesh Chunder Dutt, *The Literature of Bengal,* 1895, p. 241.

৩৮. উদ্ধৃত, দ্র. J. N. Gupta, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।

৩৯. রমেশচন্দ্র দত্ত, 'মুসলমান বিজয়ের ফল', *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ১৮৭৯, পৃ. ৭০-৭১।

৪০. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৩০৯।

৪১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভারত কলঙ্ক', *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ,

সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২৯৪-৩০৩।

৪২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদেশের কৃষক', *তদেব*, পৃ. ৩৯২।

৪৩. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'সাহিত্য প্রসঙ্গ', *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৪৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্য', *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৯৪।

৪৫. ভবতোষ দত্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস', *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৯৫।

৪৬. *তদেব*, পৃ. ৯৬ ।

৪৭. *তদেব*, পৃ. ৯৩।

৪৮. *তদেব*, পৃ. ৯৩ ।

৪৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিজ্ঞাপন', *বিবিধ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২।

৫০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ২৪ ।

৫১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', *তদেব*, পৃ. ৩১।

৫২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, "বিজ্ঞাপন", 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, প্রবন্ধ খণ্ড, কলকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ২১৫।

৫৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "Preface", রামগতি ন্যায়রত্ন, *ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস*, হুগলী, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

৫৪. রামগতি ন্যায়রত্ন, "বিজ্ঞাপন", তদেব।

৫৫. *তদেব।*

৫৬. *তদেব।*

৫৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, শেষ অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ২৪।

৫৮. দ্র. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৮৭৪।

৫৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

৬০. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত।

৬১. 'বিদ্যাপতি', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৭৬১।

৬২. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত* ।

৬৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯।

৬৪. বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহঃ*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৭৬৯ শকাব্দ।

৬৫. 'গ্রন্থাভাস', *তদেব*, পৃ. ১-২।

৬৬. *তদেব*, পৃ. ৩।

৬৭. নীলমণি বসাক, 'বিজ্ঞাপন', *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৫৭, পৃ. ১।

৬৮. *তদেব*, পৃ. ২।

৬৯. *তদেব*, পৃ. ৩।

৭০. *তদেব*, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭১. *তদেব*, চতুর্থ অধ্যায়।

৭২. *তদেব*, পঞ্চম অধ্যায়।

৭৩. জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, 'বিজ্ঞাপন', *ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত*, কলকাতা, ১২৭৪।

৭৪. কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, *ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা, ১৮৮০, পৃ. ৯৭।

৭৫. *তদেব*, পৃ. ৯৪-৯৫।

৭৬. রমেশচন্দ্র দত্ত, 'Preface', *ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৮৭৯, পৃ. ১।

৭৭. *তদেব*, পৃ. ১।

৭৮. *তদেব*, পৃ. ১।

৭৯. আবদুল করিম, 'ভূমিকা', *ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৮৯৪, পৃ. ১।

৮০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ২৪।

৮১. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

৮২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

৮৩. 'বাংলা সাহিত্য : বর্তমান শতাব্দী', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৫১৯।

৮৪. Haraprasad Shastri, *Report of the Bengal Library, 1892*, p. 4.

৮৫. রজনীকান্ত গুপ্ত, *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯০০, পৃ. ১০০-০১।

৮৬. A Hindu, *The Mutinies and the People or Statements of Native Fidelity During the outbreak of 1857-58*, Calcutta, 1859, p.128.

৮৭. *তদেব*, পৃ. ১২৯।

৮৮. Nilmoni Mukherjee, *A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times 1801-1888*, Calcutta, p. 192.

৮৯. দ্র. নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, 'একজন বাঙালী তীর্থযাত্রীর চোখে 'সিপাহী বিদ্রোহ', গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *ইতিহাস অনুসন্ধান-৫*, (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ষষ্ঠ বার্ষিক

সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী), কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩১০-১৯।

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারত ইতিহাস চর্চা', *ইতিহাস*, বিশ্বভারতী, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮।

৯১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'ইতিহাস', *ইতিহাসের মুক্তি*, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ. ৯৬।

৯২. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, "সম্পাদকের নিবেদন", *ঐতিহাসিক চিত্র*, দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, খণ্ড - ৫, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১৬, ১৮।

৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐতিহাসিক চিত্র', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড (সুলভ সংস্করণ), বিশ্বভারতী, ১৩৯৪, পৃ. ৬০১।

৯৪. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'আত্মকথা', দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, খণ্ড - ৫, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ৮ - ৯।

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সিরাজদ্দৌলা', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, (সুলভ সংস্করণ), বিশ্বভারতী, ১৩৯৪, পৃ. ৫৯৬।

৯৬. 'বঙ্কিমচন্দ্র - ২' *হ-র-সং* - ২, পৃ. ৩৪।

৯৭. নিখিলনাথ রায়, উদ্ধৃতি, দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নিখিলনাথ রায়' *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৩৪।

৯৮. নিখিলনাথ রায়, 'ভূমিকা', *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, কলকাতা, ১৯৭৮।

৯৯. 'চিঠিপত্র প্রসঙ্গে', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১।

১০০. Haraprasad Shastri, 'The Northern Buddhism', *IHQ*, March 1925, p. 24.

১০১. 'চিঠিপত্র', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১০।

১০২. *তদেব*, পৃ. ১১-১২।

১০৩. *তদেব*, পৃ. ১২।

১০৪. Haraprasad Shastri, 'Santideva', *IA*, 1913, pp. 49-52; 'Bodhicharyavataram', *The Journal of the Buddhist Text and Research Society*, 1894, Part-I, pp. 1-16 ; Debiprasad Chattopadhyay (ed.) *Taranath's History of Buddhism in India*, Calcutta, 1980, pp. 215-20.

১০৫. 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ১৭৬ - ৭৭।

১০৬. 'চিঠিপত্র', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১২-১৩।

১০৭. *তদেব*, পৃ. ২১।

১০৮. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১', হ-র-সং-২, পৃ. ৩২০।

১০৯. *তদেব*, পৃ. ৩২০।

১১০. 'চিঠিপত্র', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৫৬।

১১১. তদেব, পৃ. ৫৭।

১১২. "Many thanks for your kind presentation of a fasciculus of Bibliotheka Indica. I am not deep enough in the Sastra that I may read fluently and enjoy such scholastical works. I wonder that you could read and appreciate the Mahayana Sutralankara. I am now printing a French translation of it, with the help of the Chinese and the Tibetan translation. I shall be very glad to send you a copy as soon as I am back home. Later on, I shall perhaps return to Abhidhammakosa to compare Chinese and Tibetan the Turk version discovered by M. A. Stein." তদেব, পৃ. ৭।

১১৩. তদেব, পৃ. ৮।

১১৪. তদেব, পৃ. ৯।

১১৫. তদেব, পৃ. ৯।

১১৬. তদেব, পৃ. ৮।

১১৭. তদেব, পৃ. ১৫।

১১৮. তদেব, পৃ. ১৬।

১১৯. তদেব, পৃ. ১৬।

১২০. 'কীর্তিলতা', *হ-র-সং* - ৪, পৃ. ৫৭৩।

১২১. " I have lately been reading your edition of the Kirtilata with great pleasure. It came when I was ill, and for a long time I have been unable to do any reading or writing, but am better now. I have found it most interesting and congratulate you on so successfully editing this most important work." 'চিঠিপত্র', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৫২।

১২২. " Your edition and translation of the Kirtilata have been a source of great interest to me. Some day I hope to make a thorough study of its language. For this your edition will be invaluable." তদেব, পৃ. ৫৪।

১২৩. প্রবোধচন্দ্র সেন, *বাংলার ইতিহাস-সাধনা*, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩৫-৩৬।

১২৪. দ্র. Haraprasad Shastri, *Report of the Bengal Library, 1892*, p. 6 এবং *Report of the Bengal Library, 1894*, p. 6-7.

১২৫. 'বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৫১৯।

১২৬. দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

১২৭. তদেব, পৃ. ৩৫।

১২৮. তদেব, পৃ. ৩৫।

১২৯. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১', *হ-র-সং* - ২, পৃ. ৩১৯।

১৩০. তদেব, পৃ. ৩১৯।

১৩১. প্রবোধচন্দ্র সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

১৩২. 'অভিভাষণ', *হ-র-সং* - ২, পৃ. ৪৫৬।

১৩৩. প্রবোধচন্দ্র সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭ - ৪৮।

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস-চর্চা

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪), খ্রিস্টান মিশনারিদের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ, ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক অর্থনীতির ক্রমবিস্তার, টমাস ব্যাবিংটন মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন[১], পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঝোঁক এবং সেই পন্থা অনুসরণ করে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা নীতি গ্রহণ— এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজ খবর করা যেমন এশিয়াটিক সোসাইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তেমনি ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহেও সোসাইটির ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দান অনস্বীকার্য। এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় দেশীয় পণ্ডিতদের নিরলস উদ্যম ও পরিশ্রমের কথা। খ্রিস্টান মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারের পিছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকলেও নিজেদের প্রয়োজনে এই দেশকে তাঁরা জানতে চেয়েছেন, ফলে তাঁরা তাঁদের মতো করে ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ইতিহাসবিদ্যা চর্চার প্রতি এদেশের মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকে। ভারতীয়দের ইতিহাস চর্চায় অনীহা ছিল, এমন নয়। ভারতবর্ষে ইতিহাস-চর্চার পদ্ধতি ছিল অন্য রকম। দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা কলহনের *রাজতরঙ্গিনী* এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* ইতিহাস গ্রন্থ ছাড়া আর কী। আনন্দ ভট্টের *বল্লাল চরিত*ও ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আর অবুল ফজলের তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থ *আইন-ই আকবরী* ইতিহাস রচনার যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আসলে ব্রিটিশ শাসন পূর্ববর্তী ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট কোনো ইতিহাসতত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। ভারতের ইতিহাস রচনার ধারাটি ছিল অন্য রকমের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘‘ইতিহাস সকল দেশের সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।’’[২]

আসলে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাব। ধারাবাহিক কাল নির্ণয় ইতিহাসের একটি প্রধান শর্ত। সেই সঙ্গে দেশ ও জনজীবনের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় ইতিহাস চিন্তায় পরিপূর্ণতা আনে। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের যে দু-একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় তা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রাজ পরিবার বা রাজা-রাজড়ার ইতিহাস। তার থেকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরি সত্যিই শক্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘আমাদের ইতিহাস’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘‘যেমন কলিকাতার গঙ্গায় বয়া ভাসে, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতগুলি রাজবংশ ভাসিতে লাগিল ; পরস্পরের কী সম্বন্ধ বুঝা গেল না ; সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হইল না।’’[৩] একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে, নির্দিষ্ট ইতিহাসতত্ত্ব-নির্ভর ইতিহাসের চর্চা না হলেও সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির ব্যাপক চর্চা হয়েছে ; পাওয়া গেছে বহু লিপি, প্রত্নলেখ এবং অন্যান্য উপাদান— এগুলি ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ ইতিহাস না হলেও ইতিহাস রচনায় মূল্যবান উপাদান সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সময়ে বিদেশি পর্যটকগণ

তাঁদের যে বিবরণী রেখে গেছেন তা থেকেও আমরা ইতিহাস উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু এই সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ভর ইতিহাসতত্ত্ব অনুসরণে ইতিহাস লিখতে শিখিয়েছেন ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকরা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৩২ বঙ্গাব্দের *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* 'আমাদের ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখেছেন, "....আমাদের ইতিহাস ছিল না, য়ুরোপিয়ানরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে কথা সত্য। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছিলেন, আমার এখনো সেই পথে চলিতেছি ; কিন্তু তাহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন না, দুই-দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন।"[৪] হরপ্রসাদ এ ধরনের ইতিহাস-চর্চার তাৎপর্য খুঁজে পান নি। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা বহু পুথি-পত্র এশিয়াটিক সোসাইটি ও পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহে ও উদ্যোগে সংগৃহীত এবং সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি ইতিহাসের আকর। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার কাজে ঐ সমস্ত উপাদান অবশ্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তা ছাড়া উনিশ শতকে ভারততত্ত্ব বিষয়ে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে, সেগুলিও ইতিহাস রচনার কাজে ব্যবহারযোগ্য। আর এদেশের মানুষজন পরিবেশকে দেশীয় মানুষ যতটা অনুভব করতে ও বুঝতে পারবেন, বিদেশিদের পক্ষে ততটা সম্ভব নয় ; তাই এদেশের ইতিহাস লেখার জন্য দেশীয় লোকেরই প্রয়োজন বেশি।

কিন্তু ভারতবিদ্যা তথা ভারত ইতিহাস-চর্চার সূত্রপাত মূলত এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে *এশিয়াটিক রিসার্চেস*-এ প্রকাশিত হয়েছে অনেক প্রবন্ধ। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেন। আর্থিক অসুবিধার জন্য ১৮৩৯-এ *এশিয়াটিক রিসার্চেস*-এর প্রকাশ বন্ধ হয়। এর সংখ্যাগুলিতে শিলালিপি, মুদ্রা, প্রাচীন ভগ্নস্তূপ, প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্পর্কে অনেক রচনা প্রকাশিত। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলিও উপরিউক্ত বিষয়গুলির আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলির মূল্য ১৮৭৩, ১৮৭৪ এবং ১৮৭৫ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে এইচ. ব্লখম্যান-এর লেখা 'দি জিওগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' প্রবন্ধ থেকে বোঝা যাবে। এই প্রবন্ধ বাংলায় প্রাপ্ত মুদ্রার উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের পুরাকীর্তি ও প্রত্নমহিমা আবিষ্কারে যাঁরা প্রথম দিকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সকলেই ইয়োরোপীয়। জেমস্ ব্লান্ট, উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন, ই. ফেন, আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রমুখ অনেকেই ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারকর্মের সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং আরও অনেকে ভারতীয় পণ্ডিত পুরাকীর্তির উদ্ধার এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না শিলালিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে ততদিন ভারতীয় ইতিহাসের অনেকটাই অনুদ্‌ঘাটিত ছিল। চার্লস উইলকিন্স নাগার্জুনীয় গুহায় প্রাপ্ত বর্মারাজাদের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন ১৭৮৫

থেকে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কিন্তু ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ যখন অশোকের অনুশাসন ও সাঁচীস্তূপের লিপিব পাঠোদ্ধার করলেন তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল। প্রিন্সেপ লিখলেন যে, তখনো পর্যন্ত কোনো প্রাচ্যবিদ্ ভিলসা বা সাঁচীর লিপি নিয়ে কিছু করতে পারেন নি, যদিও তাঁরা এগুলির পাঠোদ্ধারের আশা ছাড়েন নি।[৫] গুপ্ত যুগের লিপির পাঠোদ্ধার এবং তার কাল নির্ণয় করে প্রিন্সেপ অনেক বড়ো কৃতিত্বের অধিকারী হলেন। বর্ণমালা ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েও তিনি ইতিহাসের কালকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। জেমস্ প্রিন্সেপের পর আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম পুরাতত্ত্ব সমীক্ষক হিসেবে ভারতের অনেক জায়গায় পর্যটন ও সমীক্ষা চালান। তিনি ছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের (প্রতিষ্ঠা ১৮৬১) সমীক্ষক। তাঁর সমীক্ষা ও পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহের উপর নির্ভর করে তিনি লেখেন *এনসিয়েন্ট জিওগ্রাফি* (১৮৭১)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরাতাত্ত্বিক কাজকর্মের মান ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের তুলনায় কোন অংশে নিচু ছিল না। তাঁর এবং অন্যান্য অগ্রগণ্য ইয়োরোপীয় ভারততত্ত্ববিদদের কাজকর্মের ধারা অনুসরণ করেই হরপ্রসাদের কর্মজীবনের সূত্রপাত।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জেমস মিল একটি ছাঁচ তৈরি করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন *দি হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*। বিশাল গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, এই বইয়ের Preface - এ তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লেখেন যে, তিনি শ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে যে গবেষণা করেছেন তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আর তিনি মনে করেন যে, ভারত ইতিহাসে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই যা তিনি উল্লেখ করেননি।[৬] জেমস্ মিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাসতত্ত্ব তৈরি করেছেন তাঁর সুবিশাল গ্রন্থের মডেলকে কেন্দ্র করে। জেরেমি বেন্থামের অনুগামী জেম্স মিল হিতবাদ বা ইউটেলিটেরিয়ানইজ্‌মে বিশ্বাসী ছিলেন। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলন্ডের বাণিজ্য পুঁজির আধিপত্য ইংরেজ মানসে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার প্রকাশ দেখি মিল ও মেকলের ঔদ্ধত্যে। আসলে বাণিজ্য পুঁজির সম্প্রসারণই ছিল মিলের লক্ষ্য। ফলে তাঁর ইতিহাসতত্ত্ব গড়তে হয়েছে সেই কথা মনে রেখে।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা যে ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। সেই তত্ত্বের কাঠামোয় লেখা হল ভারতবর্ষের ইতিহাস। ভারতবর্ষের মানুষদের জন্য ব্রিটিশ শিক্ষাতত্ত্ব ইতিহাসতত্ত্বকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ইংলন্ডের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা, আর ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার গর্ভে সৃষ্টি হল এই দেশের ইতিহাস, যেখানে ফুটিয়ে তোলা হল ভারতের দৈন্য-দশা ও নিকৃষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়। "Generations of civil servants, administrations and educations, inspite of colonial bias or imperialistic attitude, in some cases minimising India's cultural greatness, patiently gathered valuable new material for our social and political history."[৭] সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতীয় সংস্কৃতির অবমূল্যায়ণ করলেও তাঁদের সংগৃহীত তথ্যগুলিকে

ইতিহাস রচনার কাজে সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকদের পরিমণ্ডলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাস-চর্চার সূত্রপাত ও বিস্তৃতি ঘটেছে। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত পণ্ডিত বংশে তাঁর জন্ম। সংস্কৃতের ছাত্র ছিলেন তিনি। পড়াশুনা করেছেন সংস্কৃত কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে। সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য তাঁর পঠন-পাঠনের বিষয় ছিল না, তিনি পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে আসেন। বি. এ. ক্লাসে সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শন পড়েছেন। পড়েছেন ইতিহাস। ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে ছিল ডেভিড হিউমের *হিস্ট্রি অব ইংল্যান্ড*, আর্নল্ডের *ইনট্রোডাকটরি লেকচার অব মডার্ন হিস্ট্রি*, টিটাসের *দি হিস্ট্রি অব দ্য জিউস ফ্রম দ্য বিগিনিং অব মনার্কি টু দি ডেস্ট্রাকশন অব জেরুজালেম*, এলফিনস্টোনের *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ম্যাকফারলেনের *ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*, মার্শম্যানের *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* প্রভৃতি। এই সঙ্গে পড়েছেন আধুনিক গণিত, বিজ্ঞান এবং পলিটিক্যাল ইকনমি।[৮] ফলে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল। এবং তাঁর উত্তর-ছাত্রজীবনে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে গবেষণার শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছিল। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র-রাজকৃষ্ণ এবং দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে হরপ্রসাদ নিজেকে বিদ্যার জগতে আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ইতিহাসের অনেক তথ্য ব্যবহার করে ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে। এ জন্য প্রত্ননিদর্শন, শিলালিপি, তাম্রশাসনাদি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্নবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত ও প্রাচীন লিপি পাঠোদ্ধারের সূচনা হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরই প্রচেষ্টায়।

হরপ্রসাদ অনেকগুলি শিলালেখ ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার এবং ব্যাখ্যা করেছেন। লিপি থেকে ঐতিহাসিক কী খবরাখবর পাওয়া যায় বা যেতে পারে তা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এইভাবে ঐতিহাসের ফাঁক ভরাট করতে চেষ্টা করেছেন। *দি ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারিতে* তিনি 'কিং চন্দ্র অব দ্য মেহেরৌলি আইরন পিলার ইন্‌স্‌ক্রিপশন' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্তের প্রকৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন স্বাধীন রাজা চন্দ্র সিন্ধুর সাতটি করদ রাজ্য পেরিয়ে বাংলা জয় করেছিলেন এবং বলখকে নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। তাঁর রাজত্বের দক্ষিণ সীমা সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা ধৌত হয়েছিল। তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং ঐ দেবতার উদ্দেশে তিনি ধ্বজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৯] এই চন্দ্রের রাজধানী, সময়, উপাধি, বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে লিপির অক্ষরগুলি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর, অর্থাৎ গুপ্ত যুগের। নগেন্দ্রনাথ বসু চন্দ্রের উপাধি বর্মন বলেছেন।[১০] আবার ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেছেন, চন্দ্রগুপ্ত।[১১]

এ ব্যাপারে শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ চন্দ্রবর্মনের শিলালিপির [১২] সাহায্যে হরপ্রসাদ মেহেরৌলির স্তম্ভ লিপির 'চন্দ্র'- সমস্যা মিটাতে চেষ্টা করেছেন। "..... the probability of the mysterious emperor being Chandra Varman is now all the greater for the new reading of Pushkarna for Puskara in the Susunia record and the discovery of the new Mandasor inscription of 404 A. D." [১৩] আবার *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকাতে* নরবর্মনের সময়ের যে মন্দোসর শিলালিপিটি [১৪] তিনি পাঠোদ্ধার এবং সম্পাদনা করেন তার সঙ্গে মেহেরৌলির স্তম্ভ লিপি এবং শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত লিপির মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা তা খুঁজে পেতে চেয়েছেন। হরপ্রসাদ এমনও বলেছেন যে, তিনি মনে করেন শুশুনিয়া ও মনদোসর লিপি দুটি আবার নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। শুশুনিয়া লিপিতে চন্দ্রবর্মনের নাম পাওয়া যায় যিনি পুষ্করণা নগরের সিংহবর্মনের ছেলে। তিনি পদমর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ বিষ্ণুর নামে চক্র উৎসর্গ করেছিলেন। পুষ্করণ বা পুষ্করণা নিঃসন্দেহে যোধপুর রাজ্যের পোখরনের প্রাচীন নাম।[১৫] আবার *দি এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা-তে* (১৯১৫) হরপ্রসাদ 'দি শুশুনিয়া রক্ ইনস্ক্রিপশন অব চন্দ্রবর্মন'-এ লিপিটির অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করে লেখেন যে, নরবমর্নের সময়ের মনদোসর লিপির উপর তাঁর লেখা নিবন্ধটিতে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১৬] মন্দোসর এবং শুশুনিয়ার অভিলেখ দুটি থেকে হরপ্রসাদ সিদ্ধান্তে আসেন পুষ্করণা রাজস্থানের যোধপুরে অবস্থিত। সেখানকার রাজা সিংহবর্মার দুই ছেলে— নরবর্মা ও চন্দ্রবর্মা। চন্দ্রবর্মা মেহেরৌলি স্তম্ভের চন্দ্র এবং তিনি বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করে শাসনকার্য পরিচালন করেছেন। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সরকারের মত ভিন্ন। তিনি লিখেছেন, "দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা তাঁহার যোধপুর অঞ্চলস্থিত রাজধানী হইতে দেড় হাজার মাইল দূরবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ে আসিয়া গুহা খনন পূর্বক অভিলেখ উৎকীর্ণ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিবার পূর্বে অবশ্যই দেখা প্রয়োজন যে, শুশুনিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে পুষ্করণা নামের কোনো স্থানের অস্তিত্ব আছে কিনা। আশ্চর্যের বিষয়, অল্প সন্ধানেই দামোদরের নিকটে পোখর্না নামক গ্রামের সন্ধান মিলিয়া গেল।"[১৭] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পুষ্করণা বা পোখর্না বাঁকুড়া জেলাতেই অবস্থিত বলে মনে করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে, "... পুষ্করণার এই রাজা চন্দ্রবর্মা গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। প্রয়াগে অশোক স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে যে বিজিত চন্দ্রবর্মা নামক রাজার উল্লেখ আছে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের পুষ্করণা জনপদের রাজা, আমাদের শুশুনিয়া পাহাড়ের চন্দ্রবর্মা হওয়াই সম্ভব।"[১৮] কিন্তু নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, ".... এই পুষ্করণাধিপই বোধ হয় সমসাময়িক রাঢ়ের অধিপতি।"[১৯]

তবু হরপ্রসাদের এই অভিলেখগুলির পাঠোদ্ধার এবং বিশ্লেষণ গুরুত্ব হারায় না। কারণ, তিনি তাঁর কালের তথ্যের ভিত্তিতে যে পাঠ ও বিশ্লেষণ করেছেন তা ইতিহাসের আলোচনায় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের *জর্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এ*

হরপ্রসাদের প্রবন্ধ, 'এ খরোষ্ঠী কপার-প্লেট ইনস্ক্রিপশন ফ্রম টক্সিলা অর তক্ষশিলা' (১৯০৮) প্রকাশিত হয়। আলেকজাণ্ডার কানিংহামের আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের উপর নির্ভর করে এটি রচিত। এরপর ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে *জর্নাল অব বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি*-তে হরপ্রসাদের পরপর কতকগুলি ভূমিদান, পাহাড়গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি, অভিলেখ এবং অন্যান্য বিষয়ে পাঠোদ্ধার, বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাগুলি হল : 'সেভেন কপার প্লেট রেকর্ডস অব ল্যান্ড গ্রান্টস ফ্রম ঢেনকানল' (১৯১৬) ; 'দি তেজপুর রক্ ইনসক্রিপ্শন্স' (১৯১৭) ; 'টেক্কালি ইনস্ক্রিপ্শন্ অব মধ্যম রাজা, দি সন অন পেতব্যাস্রোপ রাজা' (১৯১৮) ; 'গ্রান্ট অব রণস্তম্ভদেব' (১৯১৮) ; 'খণ্ড দেউলি ইন সক্রিপ্শন অব রণভঞ্জদেব' (১৯১৮) এবং 'শিশুনাগ স্টাচুস্' (১৯১৯)।

ঢেন্কানল থেকে প্রাপ্ত সাতটি তাম্রশাসন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিহার-ওড়িশার লেফ্টেনান্ট গভর্নর এড্ওয়ার্ড গেইট হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে পাঠোদ্ধারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এতে সুলকি পরিবারের পাঁচটি দানপত্র ছিল। এই পরিবারের একজন রানি ছিলেন ত্রিভুবন মহাদেবী এবং আর একজন স্থানীয় শাসক জয় সিংহ।[২০] এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, প্রাপকের আদি নিবাস ছিল কোলাঞ্চ। আদিশূরের আহ্বানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষগণ এই কোলাঞ্চ থেকেই এসেছিলেন অনুমান করা হয়। অবশ্য শুধুমাত্র জয়স্তম্ভ দেবের তাম্রশাসনেই কোলাঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ নিজেই লিখেছেন, "Kolanca is mentioned in the genealogical works of Bengal as the place from which king Adisura obtained Brahmanas versed in the Vedas." কিন্তু এটি অনুমান মাত্র, কারণ হরপ্রসাদ লিখেছেন, "It has not been met within Epigraphic records before and its identification is not certain."[২১]

এই তাম্রশাসনগুলি হরপ্রসাদ পাঠোদ্ধার করায় একটি রাজপরিবারের বংশতালিকার সন্ধান পাওয়া গেল। এ সম্পর্কে এডওয়ার্ড গেইট 'বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি'র সভাপতির অভিভাষণে বলেন, ".... these plates gives us a list of five rulers in the direct line ; they belonged to the Sulki family, and appeared from the palaeography of their grants to have lived in the tenth century." [২২] কিন্তু তাঁরা কোথাকার শাসক ছিলেন তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ষষ্ঠ তাম্রশাসনটি রাজা মল্লদেবের কন্যা ত্রিভুবন মহাদেবী প্রদত্ত। ত্রিভুবন মহাদেবী দেশ শাসন করতেন। তাঁর রাজ্য পুরী জেলার ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি কোথাও ছিল বলে অনুমান করা যায়।

ওড়িশা প্রদেশের ঢেনকানল থেকে প্রাপ্ত তাম্র শাসনগুলি ইতিহাসের প্রত্ন

উপাদান হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী তেজপুর শহরের কাছে একটি পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেছেন হরপ্রসাদ। এ বিষয়ে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তাঁর 'তেজপুর রক ইনস্ক্রিপশন্‌স' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বিহার ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটির বার্ষিক প্রতিবেদনে ই. এইচ. সি. ওয়াল্‌স লিখেছেন যে, ব্রহ্মপুত্র নদের উপর একটি পাহাড়ে প্রাপ্ত তেজপুর লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইতিপূর্বে কীলহোর্ন উক্ত লিপির প্রথম তিনটি লাইন এবং তারিখ পাঠোদ্ধার করেন।[২৩] কীলহোর্ন ১৯০৫ সালে মাত্র প্রথম তিনটি লাইন পড়তে পেরেছিলেন। অবশ্য এই শিলালিপিটি সর্বপ্রথম এড্‌ওয়ার্ড গেইট-ই সাধারণের সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তিনি তখন আসামে ছিলেন। তেজপুর শিলালিপির কথা গেইটের *রিপোর্ট অন দ্য প্রগ্রেস অব হিস্টোরিকাল রিসার্চ ইন আসাম* (১৯৮৭) থেকে জানা যায়।

কীলহোর্ন-এর পর এম. আর. রায়, রাওসাহেব, এইচ. কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রমুখ সরকারি লিপি বিশারদ্‌দের কাছে ঐ শিলালিপির ছাপ পাঠানো হলে বলা হয়, "it was a land-grant made to the arbitrators for settling a dispute."[২৪] কিন্তু হরপ্রসাদ সঙ্গত কারণেই লিখেছেন, "The inscription is not a land-grant. It does not appear why a land- grant should be inscribed on a rock. It is the settlment of a quarrel between the boatman, the towers and the local zamindars for tolls".[২৫] এই শিলালিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল। "…. the Gupta era was used even so far east as Tejpur in the ninth century A. D., when it was generally superseded in India by the Saka and the Vikrama eras." [২৬] তাছাড়া পঞ্চকুল ব্রাহ্মণ, হয়ত এরা শ্রীহট্টের পঞ্চসার ব্রাহ্মণ, প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এবং শিলালিপিতে উল্লিখিত লাহিলি-ঝা - এর অর্থ যদি হরপ্রসাদের মতে লাহিড়ি-ওঝা অথবা উপাধ্যায় হয় তবে, "...it throws a great deal of light on the settlement of the Brahmins in Bengal."[২৭]

১৯১৮ সালে হরপ্রসাদের রচনাটি প্রকাশিত হলে তাম্রশাসনে উল্লিখিত কলিঙ্গের শৈলদ্ভোব বংশের রাজাদের নামের তালিকা পাওয়া গেল। তাম্রশাসনটিতে প্রথম নাম পাওয়া যায় মধ্যমরাজার। তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে রাজত্ব পেয়েছিলেন। মধ্যমরাজার ছেলে ধর্মরাজা। ধর্মরাজার ছেলে দ্বিতীয় মধ্যমরাজা। তাঁর ছেলে রণক্ষোভ এবং রণক্ষোভের পর তাঁর ভাই পেতব্যাম্লোপ রাজা সিংহাসনে আরোহন করেন। হরপ্রসাদের মতে এই পরিবারের কয়েক পুরুষ স্বাধীন প্রাধিকার ব্যতীত রাজত্ব করেছিলেন। এটি বলা সম্ভব নয় যে, কার প্রতি তাঁরা বিশেষ সময়ে আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তবে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের শশাঙ্করাজা নরেন্দ্র গুপ্তের অধীন ছিলেন। "The family seems to have reigned for several generations, but

without any independent authority. It is not possible to say to whom they owed allegiance at any particular period of time. They were, in the beginning of the seventh century, dependants of Sasankaraja Narendra Gupta of Western Bengal."[২৮] এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত রাজার সামন্ত রাজা ছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

সুল্‌কি বংশের রাজা রণস্তম্ভদেবের ভূমিদান সংক্রান্ত অভিলেখটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রণস্তম্ভদেবের রাজধানী কোদালক থেকে এই দানপত্রটি দান করা হলো হুগলি ও মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী গ্রাম জারা ছিল রাঢ়মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। এইটি সুল্‌কিদের দান করা হয়। এঁরা ছিলেন মেদিনীপুরের প্রভাবশালী কৃষক সম্প্রদায়। তাঁদের মূল বাসস্থান ছিল কেদালক। হরপ্রসাদ তাঁর 'গ্রান্ট অব রণস্তম্ভদেব' (১৯১৮) প্রবন্ধে অভিলেখটি বিশ্লেষণ করে দানগ্রহীতারা বাঙালি কাশ্যপ গোত্রীয় এবং শুক্ল যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

হরপ্রসাদের আরও একটি রচনা 'খণ্ডদেউলি ইনস্ক্রিপশন্‌স অব রণভঞ্জদেব' থেকে জানা যায় রণভঞ্জদেব তাঁর পৌত্রের জন্ম উপলক্ষে এই অভিলেখে তাঁদের বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। হরপ্রসাদ আবিষ্কার করেছেন, রণভঞ্জদেব ময়ূরভঞ্জের রাজা।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'টু কপার প্লেট ফ্রম দ্য স্টেট অব বোনাই' নামক প্রবন্ধে দুটি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার বিশ্লেষণ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাম্রশাসন দুটি হল — ১. গ্রান্ট অব বিনিত তুঙ্গদেব এবং ২. গ্রান্ট অব উদয়বরাহ।[২৯] প্রথমটি সম্পর্কে হরপ্রসাদ লিখেছেন যে, লিপি থেকেই জানা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিনীতা তুঙ্গ মহারাজা রাঙ্ক উপাধি নিয়ে রাজত্ব করছিল। তিনি শিবের উপাসক। যমগর্ত প্রদেশের রাজা নিজে দাতা এবং হর্ষানল নামে এক ব্রাহ্মণগ্রহীতা। যমগর্ত প্রদেশের খেমবাই জেলার কোঞ্জরি গ্রাম দান করা হয়েছিল। এই লিপিতে উল্লিখিত স্থান নামগুলির একটিও এখনো শনাক্ত করা যায় নি।[৩০] কিন্তু দ্বিতীয় তাম্রশাসনটি সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায় তা অনেক স্পষ্ট। তাম্রশাসনে উল্লিখিত রাজা উদয়বরাহ ময়ূর বা ভঞ্জ বংশের মানুষ। উদয়বরাহ এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কালের ঋষি বশিষ্ঠর বাসস্থান চিত্রকূট পাহাড় থেকে এসেছিলেন।[৩১] এই তাম্রশাসনের দাতা ছিলেন রাজা স্বয়ং। তিনি পরম সৌগত বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। গ্রহীতা ছিলেন দুজন — এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভট্ট পুরুষোত্তম এবং অন্যজন ভট বচাপা [৩২] তাঁদের নিষ্কর ভূমিদান করা হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। এই তাম্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এখানে আমরা ভট্ট পরিবারের তিনটি নাম পাই।[৩৩] অবশ্য উদয়বরাহ, তেজবরাহ এবং উদিতবরাহ ভঞ্জবংশের রাজা হলেও এই তিনজন রাজার সঙ্গে একই পরিবারের অন্য রাজাদের সম্পর্ক নির্ণয় করা এখনো সম্ভব হয়নি।[৩৪]

খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত তাম্রশাসন সম্পর্কেও হরপ্রসাদ তাঁর বক্তব্য প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। কানিংহামের একটি তাম্রশাসন পাঠের সংশোধন করেন

তাঁর 'এ খরোষ্ঠী কপার-প্লেট ইনস্ক্রিপশন ফ্রম টাক্সিলা অর তক্ষশিলা' (১৯০৮) প্রবন্ধে।

তাম্রশাসনাদির আবিষ্কারের ফলে ইতিহাসের অনেক অজানা দিক আলোকিত হয়। বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও পাঠোদ্ধারের ফলে সেন বংশের অবশেষ সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ময়মনসিং (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) জেলার শেরপুর গ্রামের বি. এল. চৌধুরী ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে পাঠোদ্ধারের জন্য একটি তাম্রশাসন দেন।[৩৫] কিন্তু সেটি আংশিক। এটির পাঠোদ্ধার যখন প্রায় শেষ সেই সময় নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে খবর দেন যে, একই রাজার তাম্রশাসনের শুরু একই রকম এবং দুবার ছাপা হয়েছে; একবার সপ্তম খণ্ডে এবং আরেকবার ১৮৯৬-এর এশিয়াটিক সোসাইটির *জর্নালের* প্রথম অংশে।[৩৬] সপ্তম খণ্ডে লিপিটির রাজার নাম পঠিত হয়েছিল কেশব সেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসুর পাঠ : বিশ্বরূপ সেন। হরপ্রসাদ তাঁর 'এ কপার-প্লেট গ্রান্ট অব বিশ্বরূপ সেন অব বেঙ্গল'-এ লিখেছেন যে, তিনি যে তাম্রশাসনটি পরীক্ষা করেছিলেন তাতে তিন জায়গায় বিশ্বরূপ সেন স্পষ্টভাবে লেখা ছিল এবং ছন্দ ঠিক রাখতে গিয়ে দ্বিতীয় জায়গায় দেখা গেছে শ্রী বিশ্বরূপ সেনঃ।[৩৭] এই বিশ্বরূপ সেনের পূর্বপুরুষদের পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়। বিশ্বরূপের পিতা লক্ষ্মণ সেন, পিতামহ বল্লাল সেন এবং প্রপিতামহ ছিলেন বিজয় সেন। ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী নামগুলি সঠিক। সদা সেন এবং পুরুষোত্তম সেন দেব নামে দু জন রাজকুমারের নাম পাওয়া যায়। এঁদের সঙ্গে বিশ্বরূপ সেনের সম্পর্ক কী জানা যায় না, বাৎসগোত্রীয় হলায়ুধ রাজার কাছ থেকে অনেক জমি দান হিসেবে পেয়েছিলেন।[৩৮]

শিলালিপি এবং তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ ও বিশ্লেষণ ইতিহাসের অনেক তথ্য উন্মোচনে সাহায্য করেছে। তাঁর অনেক পাঠ ও বিশ্লেষণ হয়ত পরবর্তীকালের আবিষ্কার ও গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তবু ঐতিহাসিক কারণেই তাঁর নিরন্তর গবেষণার ফল গুরুত্ব হারায় নি। তাঁর ইতিহাস দৃষ্টিতে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর লেখাগুলি আপাত বিচ্ছিন্ন হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের এই সমস্ত লেখাগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিলালিপি তাম্রশাসনাদি সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা ও আলোচনা ছাড়াও তাঁর ' নোট অন অ্যান ইনস্ক্রাইব্‌ড্ গান ইন দ্য আরমারি অব দ্য নবাব অব মুর্শিদাবাদ',[৩৯] 'সাম্ এনসিয়েন্ট বার্মিজ ইন্‌স্ক্রাইব্‌ড্ পটারি',[৪০] 'এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অব অ্যান ওল্ড গান রিসেন্টলি ডাগ্ আপ অ্যাট ফলস্ পয়েন্ট'[৪১] প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত রচনা বা মন্তব্য এশিয়াটিক সোসাইটির *প্রসেডিংসে* প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি থেকেও হরপ্রসাদের প্রত্ন-ইতিহাস-দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়।

৩

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।[৪২] তিনি প্রাচীন ঐতিহ্য উদ্ধারের জন্য প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা বিশেষ

ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র-পাঠ্য *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৮৭৪) বইটিকে "সুবর্ণের মুষ্টি"[৪৩] বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ইতিহাস-চর্চা বিস্তৃত হয়েছিল। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আর-একজন পথিকৃত হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলার এক প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিত বংশের সন্তান। সনাতন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা তাঁর ছিল ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে সমসাময়িক পশ্চিমি চিন্তাধারা তাঁর ইতিহাস বোধ ও চিন্তাকে আলোড়িত ও পরিস্ফুট করেছে। তাঁর ইতিহাসতত্ত্ব আধুনিক সমাজ চিন্তা দ্বারা চালিত। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের মতাদর্শের অন্ধ অনুকরণ তিনি কখনো করেন নি। তিনি তাঁর বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত স্বদেশকে খুঁজেছেন। এই নিরন্তর অনুসন্ধিৎসা তাঁর ইতিহাস দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য গঠনে সাহায্য করেছে। রাজবংশের পরিচয়, শাসন ব্যবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজবংশের উত্থান-পতন— এই সমস্তের বিবরণী রচনা করা অপেক্ষা সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। "এই বিশ্বাসের উপর তিনি আজীবন অবিচলিত থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষি ও কারু উৎপাদনের, ভাষা বিকাশের, শিল্প সাহিত্যের বিবর্তনের, জনজীবনে আচরিত ধর্মের রূপ-রূপান্তরের বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ এবং বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।"[৪৪] এ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টি গড়ে উঠেছে।

হরপ্রসাদের ইতিহাস-দৃষ্টিতে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের অবদান অনেকখানি, তথাপি তাঁদের রচিত ইতিহাস কতটা গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে হরপ্রসাদ একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। সঙ্গত কারণেই এই সন্দেহ তাঁর মনে বারবার দেখা দিয়েছে। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* প্রকাশিত 'আমাদের ইতিহাস' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ লিখেছেন, "আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এতদিন আমরা যেভাবে ইতিহাস পড়িয়া আসিতেছিলাম, সেভাবে আর চলিবে না।"[৪৫] প্রসঙ্গত হরপ্রসাদ ইংরেজ ইতিহাসবিদ্‌দের বইয়ের উল্লেখ করেছেন। চন্দননগরের সারস্বত সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে (১৩৩০ ব.) প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, "আমি যখন Entrance Examination দিই— ১৮৭১ সালে— তখন Marshman [John Clark Marshman] সাহেবের History of India [The history of India from remote antiquity to the accession of the Mogul dynasty] পড়েছিলাম খুব বড়ো Volume, তাতে হিন্দু history ১৬ পাতা, সেই ১৬ পাতায় আবার একটাও নাম ছিল না।" [৪৬] মুসলমান আগমনের কাল থেকেই তাঁরা মূলত ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছেন। জেমস্ মিলের রচনাতেও প্রাক্-মুসলিম যুগের হদিশ তেমন মেলে না। এই সব খণ্ডিত ইতিহাস গ্রন্থের পাশাপাশি ভারততত্ত্বের দেশি-বিদেশি গবেষকগণ নিরন্তর মূল্যবান নথিপত্র আবিষ্কার করেছেন, তা অনস্বীকার্য। সেই সমস্ত তথ্য নিয়ে রমেশচন্দ্র

দত্ত লিখলেন, *এ হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন ইন এন্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া*। অসম্পূর্ণ হলেও প্রাচীন ভারতের অনেকখানি পরিচয় এই বই থেকে পাওয়া গেল। ভারতে মুসলমান আগমনের আগে এদেশের কোনো ইতিহাস ছিল না, এই অপবাদ কিছুটা দূর হল। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য এবং নানা জায়গা থেকে তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদির আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের ফলে প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ পেল। অনেক রাজা এবং "ক্রমে তাঁহাদের বংশলতাও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ের রাজা এবং কোন্ দেশের রাজা সেটা পাওয়া গেল না।"[৪৭] দু-একটি প্রাচীন ইতিহাসবাগীশেরা চোখও দিলেন না। সুতরাং যদিও কতকটা ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙা ভাঙা, বেশ ঠাস গাথুনি হইল না।"[৪৮] হরপ্রসাদ ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যের গুরুত্বের কথা বারবার বলেছেন। "শুধু ইংরাজি পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না। ... অনেকে আবার ১৮/১৯ টাকায় একজন পণ্ডিত রাখিয়া কাজ সারেন।"[৪৯] সংস্কৃত না জানা ইতিহাসবিদ্‌গণ ঐ পণ্ডিতদের উপর নির্ভর করায় "ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্যের না হইয়া মিথ্যার রাশি"[৫০] হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা হরপ্রসাদ বলেছেন।

প্রাক্-মুসলমান পর্ব থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা প্রদর্শনের আগ্রহ হরপ্রসাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তিনি অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন, অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ ও তথ্যের আবিষ্কার করেছেন ; কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষের, ছাত্রপাঠ্য ব্যতীত, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখে উঠতে পারেন নি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভারত ইতিহাস লেখার ক্ষেত্র যে ক্রমশ তৈরি হচ্ছিল সে ব্যাপারে হরপ্রসাদ সজাগ ছিলেন। তাই এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন : ষাট বছর আগে ভারতের যে ইতিহাস লেখা হয়েছে সেখানে মুসলমান বিজয়ের আগের পর্ব ছিল অন্ধকারে ঢাকা। ক্রমশ পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলির প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি পড়ায় এবং মুদ্রা, লিপি ও ইতিহাসের আকর গ্রন্থাদি নিয়ে বিস্তৃত চর্চা হওয়ায় প্রকৃত ইতিহাস অনেকটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নতুন নতুন তথ্যাদি পাওয়ার ফলে সোসাইটির জর্নালে অনেকেই বিশেষ রাজবংশ বা বিশেষ কাল নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। বিষয়গুলি নতুন আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছে। এ ধরনের প্রবন্ধ রচনার ঝোঁক আবার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ১৮৯৫ পর্যন্ত কয়েক গুণ বেশি লেখা হয়েছে। ফলে হরপ্রসাদ তাঁর একটা বইতে হিন্দু যুগের অনেক ফাঁক পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন।[৫১] হরপ্রসাদ তাঁর *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* বইটির কথাই বলতে চেয়েছেন। বইটির প্রকাশ কাল ১৮৯৫। এটি ছাত্র-পাঠ্য হলেও হরপ্রসাদ এর মধ্য দিয়ে ভারত ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছেন। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত মহলেও বইটি বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। য়ুলিউস য়োলি হরপ্রসাদকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "This history is a very useful work in my opinion, and may well serve as a mannual for University Lectures on Indian History."[৫২] ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে

এক শ্রেণীর পণ্ডিত বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় বরাবরই দুই মেরুর বাসিন্দা। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আকর্ষণের বদলে বিকর্ষণ নীতির দ্বারা পরিচালিত। এই সব পণ্ডিতদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও যেমন আছেন,[৫৩] তেমনি আছেন ভারতীয় বা পাকিস্তানী ঐতিহাসিকগণ, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা আচ্ছন্ন।[৫৪] অথচ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ধর্ম নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা দরকার ; কারণ, ভারতের সভ্যতার বিবর্তনে উভয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা স্বীকার্য। ভারতীয় সভ্যতায় হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কে হরপ্রসাদের বিশ্লেষণ অনেকটাই গ্রহণযোগ্য। তাঁর ইতিহাস দৃষ্টি কোনো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি। তাই হরপ্রসাদ বলতে দ্বিধা করেন না — "বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় অর্ধেক। .... এই সকল মুসলমানেরা কিন্তু বাঙালি, বাংলার উপর হিন্দুদিগের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোন মতেই কম নহে।"[৫৫] এই সত্য হরপ্রসাদের কর্মধারা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমন কি 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১' - এ তিনি একটি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, বাঙালি মুসলমানেরা বঙ্গীয় সাহিত্যের অংশীদার তবে তাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে দূরে রাখা কেন? তাঁর মতে, "মুসলমানেরা যাহাতে সাহিত্য পরিষদের মেম্বার হন, সেটি বড়োই বাঞ্ছনীয়। কারণ গত ৭০০ সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাংলার কোন কাজই হইতেছে না। ... অনেক বাংলা বই তাঁহারা লিখিতেছেন।"[৫৬] শুধু কি তাই, হরপ্রসাদ তাঁর 'এনসিয়েন্ট বেঙ্গলি লিটারেচার আন্ডার মুহামেডান পেট্রনেজ'[৫৭] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের কতটা উন্নতি হয়েছিল। তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হিন্দু- মুসলমানের সামাজিক সাংস্কৃতিক সহাবস্থান ও ধর্মীয় সহনশীলতার দিকটি। হরপ্রসাদের স্বচ্ছ ইতিহাস-দৃষ্টিতে এ বিষয়টি ধরা পড়েছে।

প্রাক্-মুসলমান যুগের ইতিহাসের ধারা বুঝতে হরপ্রসাদ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তাঁর *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* বইতে "বৌদ্ধ সময় থেকে মুসলমানের আগমন পর্যন্ত ৭২ পাতা লেখা হল।"[৫৮] কিন্তু এই বইতে যেটুকু তথ্য পরিবেশন করেছিলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি ঠিক করলেন, "নিজে এর ভিতর ঢুকতে হবে। প্রথমে বাংলা দেশের অনেক জায়গায় বেড়াই, বৌদ্ধধর্ম কোথায় গিয়েছে বুঝতে পারা গেল না।"[৫৯] শেষে খোঁজ খবর করে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে *ডিসকভারি অব লিভিং বুদ্ধিজম ইন বেঙ্গল* নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা লিখলেন। "এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মধ্যে কোথায় কোথায় বৌদ্ধধর্মের কী কী নিদর্শন আছে, পাওয়া গেল, তাই নিয়ে সে বই লেখা হল।"[৬০]

হরপ্রসাদ অনুসন্ধান চালিয়ে বাংলার পালবংশ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। পালেরা বৌদ্ধ। পালদের সম্পর্কে তথ্য আহরণের ব্যাপারে *রামচরিত* কাব্যখানি সহায়কগ্রন্থ সন্দেহ নেই। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ নেপাল থেকে *রামচরিত*-এর পুথি

নিয়ে আসেন। এটি তাঁর আবিষ্কার। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটিতে *রামচরিত* সম্পর্কে একটি নিবন্ধ পড়েন। সেটি হল 'অন দ্য মানাস্‌ক্রিপ্ট অব এ ওয়ার্ক অন দ্য বায়োগ্রাফি অব ওয়ান অব দ্য পাল কিংস অব মগধ, রাম পাল'। এই নিবন্ধটির সারাংশ 'রামচরিত বাই সন্ধ্যাকর নন্দী,ইলেভেনথ্ সেঞ্চুরি' এশিয়াটিক সোসাইটির *প্রসেডিংস*-এ প্রকাশিত হয়। কাব্যটি চারটি পর্বে বিভক্ত — ১. আরম্ভ রাম, ২. আসুরীচক্র, ৩. রামপ্রত্যাগমন এবং ৪. রামোত্তর চরিত।[৬১] হরপ্রসাদ এই পুথির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন : বলা যেতে পারে *রামচরিত* একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। পূর্ব ভারত থেকে প্রকৃত ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এই প্রথম পাওয়া গেল। গৌড়ের পাল রাজা রামপাল দেবের জীবন ও কাল নিয়ে এইটি রচিত। একদিক থেকে পাণ্ডুলিপিটি খুবই কঠিন , কারণ পান্ডুলিপির সমস্ত শ্লোকগুলিরই দুটি অর্থ।[৬২] —১. রামায়ণের রামের কাহিনী এবং ২. রামপাল দেবের ইতিহাস। কিন্তু "রামায়ণ বেশ বুঝা গেল, বাল্মীকির রামায়ণ সহজেই বুঝা যায়, পালবংশীয় রামপাল সম্বন্ধে কোন ঘটনাই জানি না, টীকা না থাকলে বুঝতে পারব না।"[৬৩] বহু শতাব্দীর পুরানো অক্ষরে লেখা টীকা বুঝতে অনেকটা সময় লেগে গেল। রামপালের যুদ্ধ ও শান্তি বিভাগের মন্ত্রী প্রজাপতির ছেলে সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা *রামচরিত*-এর পুথি সম্পর্কে হরপ্রসাদ লিখেছেন যে, পাণ্ডুলিপির টেক্সট প্রাচীন নেওয়ারিতে এবং ভাষ্য প্রাচীন বাংলায় লেখা। ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা বাংলা পাণ্ডুলিপিটির বৈশিষ্ট্যসমূহ অনেকটাই প্রাচীন। কেম্‌ব্রিজ থেকে প্রকাশিত বেন্ডলের পাণ্ডুলিপির তালিকায় এর বর্ণনা আছে।[৬৪] *রামচরিত* ইতিহাস হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। কলহনের *রাজতরঙ্গিনী* ইতিহাস গ্রন্থের স্বীকৃতি পেয়েছিল। ইতিহাসের উপাদান আছে এমন গ্রন্থাদি প্রাচীনকালে রচিত হলেও তা স্বয়ং সম্পূর্ণ ইতিহাস হিসেবে সাধারণত বিবেচিত হয় নি। সেগুলি ইতিহাসের উপকরণ মাত্র। এগুলির মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীর *রামচরিত* নিঃসন্দেহে ইতিহাসের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ভালো।[৬৫]

সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে কলিকালের বাল্মীকি বলেছেন।[৬৬] *রামচরিত* আপাত দৃষ্টিতে *রামায়ণ* মনে হলেও, এর অন্তর্নিহিত অর্থ রামপালের কাহিনি। এই কাব্য থেকে জানা যায় রামপালের রাজত্বকালের ঘটনা। তাছাড়া কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপালের রাজত্ব সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "রামপাল চরিতে ৫০/৬০ বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায়। ... রামপাল কর্ণচেদীকে তাড়িয়ে দূর করে দিয়ে সমস্ত দেশে রাজত্ব করেছিলেন, সেজন্য রামপালকে বলে কলিকালের রাম, সন্ধ্যাকর নন্দী কলিকালের বাল্মীকি।"[৬৭] *রামচরিত*-কে কেন্দ্র করে পালবংশের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা চালান হয়েছে। অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য নেওয়া হয়েছে সমসাময়িক কালের অভিলেখগুলির। তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় (একাদশ শতাব্দী) থেকে বৈদেশিক আক্রমণের সূত্রপাত। বিগ্রহের পুত্র মহীপাল "was a weak and impolitic Prince. His high handed proceedings led the kaivartta king of Varendra rebel."[৬৮] এই বিদ্রোহে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। কৈবর্ত বিদ্রোহের

নায়ক দিব্বোক (বরেন্দ্রভূমির সামন্ত নেতা) রাজা হন। মহীপালের ভাই দ্বিতীয় শূরপাল খুব অল্প সময়ের জন্য রাজা হলেও তাঁর "reign was weak and inglorious."[৬৯] সে সময় পাল রাজত্বের দুর্দিন। রাজা হলেন মহীপালের আর-এক ভাই রামপাল। রামপাল "made extensive preparations to crush the audacious Bhima."[৭০] রামপাল তাঁর পিতৃভূমি উদ্ধার করেন। রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* রাজবৃত্তের ইতিহাস। এই গ্রন্থ থেকে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানা যায়। রামপাল রাজা হয়েই কৈবর্তদের হাত থেকে বরেন্দ্রী উদ্ধারের চেষ্টা করলেও বিফল হন। বরং কৈবর্তরা একাধিকবার রামপালের রাজ্য আক্রমণ করে। "দিব্যর রুদোকের আমলেও রামপাল বোধ হয় কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। রুদোকের ভ্রাতা বরেন্দ্রীর অধিপতি হওয়ার পর সুপ্রতিষ্ঠিত কৈবর্ত শক্তি এক নূতন ও পরাক্রান্ততর আকারে দেখা দিল। ভীম জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন ; ... রামপাল শঙ্কিত হইয়া প্রতিবেশী রাজাদের ও পালরাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামন্তদের দুয়ারে তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া ফিরিলেন। অপরিমিত ভূমি ও অজস্র দান করিয়া এই সাহায্য ক্রয় করিতে হইল। রামচরিতে এই সব রাজা ও সামন্তদের যে তালিকা দেওয়া আছে তাহা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, তদানীন্তন বাঙলা ও বিহারের রাষ্ট্রতন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।"[৭১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *রামচরিত*-এর রাজবৃত্তের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোকপাত করলেও এর সামাজিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য তাঁর দৃষ্টি এ.ড়িয়ে যায় নি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বৌদ্ধবিদ্যার ছাত্রদের কাছে এই তথ্যটি খুবই চিত্তাকর্ষক হবে যে, রামপাল ধর্মীয় বিপ্লব প্রতিহত করে শুভ পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই সময় থেকেই মহাযান মতবাদের আবার নতুন যাত্রা শুরু এবং *বোধিচর্যাবতার*-এর ভাষ্য এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল।[৭২] রামপালের রাজত্বকালে কপি করা *অষ্টসাহাস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার*[৭৩] একটি পুথি হরপ্রসাদ দেখেছিলেন। পালযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু পালদের সময় সমাজ ও সংস্কৃতিতে সমন্বয়ের চিত্রও পরিলক্ষিত হয়। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*-তে লিখেছেন, " ... আর্য বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে আত্মীয়তায় যুক্ত হয়। এই সচেতন যোগ সাধন আরম্ভ হইয়াছিল গুপ্ত আমলেই, কিন্তু পূর্ণরূপ গ্রহণ পাল-আমলে ; এবং বাঙলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল, আর্যেতর এবং মহাযান বজ্রযান তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত হইল। এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং ইহাও পাল আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান।"[৭৪] এ সংবাদ আমরা তিব্বতি *তেঙ্গুর*-এর[৭৫] তালিকা থেকে পাই। হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত *চর্যাপদের* পদকর্তা লুইপাদ[৭৬] *বজ্রসত্ত্বসাধন, বুদ্ধোদয়, অভিসময় বিভঙ্গ* প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কৃষ্ণাচার্য[৭৭] *যোগরত্নমালা*

নাম হেবজ্রপঞ্জিকা ; দারিক[৭৮] *চক্রসম্বর সাধনতত্ত্বসংগ্রহনাম, প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সাধন* এবং সবরপাদ[৭৯] *বজ্রযোগিনীসাধন, বজ্রযোগিনী-গণচক্র-বিধি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ ধরনের বিপুল গ্রন্থরাজিতে শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কৃতির রূপ ফুটে উঠেছে, তা নয়; এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক- সংস্কৃতিরও একটা রূপ রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে চর্যাপদের গানগুলির মধ্য দিয়ে। এ সমস্তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পালযুগের, বিশেষ করে দশম-একাদশ শতাব্দীর ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এমন-কি বৌদ্ধধর্মের বিষয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান এবং লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ভাবনার প্রচ্ছন্ন অবস্থান— এ সমস্ত সেকালের সমাজ-সংস্কৃতিতে দেখা যায়। এই সময়ের একটি জীবন্ত চিত্র হরপ্রসাদের *বেনের মেয়ে*-তে চিত্রিত হয়েছে। *বেনের মেয়ে* ইতিহাস গ্রন্থ নয়, উপন্যাস। ''বিজ্ঞান-সঙ্গত'' ইতিহাস লেখার জন্য যে ''পাথুরে প্রমাণ'' চাই তা এই বইতে নেই। তবে ''এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।''[৮০] শুধু রাজবৃত্ত নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ এবং সেই ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাই হরপ্রসাদের ইতিহাস-চর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে তিনি শুধুমাত্র প্রত্ন তথ্যের উপর তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে লোকধর্ম, লোকসংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি থেকে তথ্য আহরণ করেছেন একটা সময়ের ইতিহাসকে গড়ে তোলার জন্য।

বাংলার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য হরপ্রসাদ বারবার নেপাল গেছেন। তিনি তিব্বতের *তেঙ্গুর-কেঙ্গুর*-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন প্রাচীন বৌদ্ধপুথির খবরের জন্য। চোমা দ্য কোরস এবং হজসনের সংগৃহীত তথ্যাবলীকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে। কারণ, বৌদ্ধ-পাল রাজত্বের অবসানে এদেশের বহু পুথি তিব্বত ও নেপালে পণ্ডিতদের মারফৎ চলে যায়। সেই সমস্ত পুথির অনেকগুলির অস্তিত্ব বাংলা তথা ভারতবর্ষে না থাকলেও, নেপাল-তিব্বতে রক্ষা পেয়েছে। ফলে ইতিহাসের উপাদানের জন্য হরপ্রসাদকে বারবার নেপাল-তিব্বতের পুথির উপরেও নির্ভর করতে হয়েছে।

এই সমস্ত উপাদান এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পুথিপত্র থেকে হরপ্রসাদ গৌরবময় বাংলার নানা দিক সম্পর্কে 'অষ্টমবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন'-এ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। একই বিষয় নিয়ে ১৯১৯-২০ সালে *জর্নাল অব দ্য বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি*-তে 'কনট্রিবিউশন অব বেঙ্গল টু হিন্দু সিভিলাইজেশন' নামে হরপ্রসাদ দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধটি অষ্টমবঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধনের ইংরেজি বয়ান। তিনি সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণেও বাংলার পূর্ব গৌরবের কথা উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে বাঙালিরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি ত্যাজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকা যোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে

লঙ্কাদ্বীপের নাম হয়েছে সিংহল দ্বীপ।"[৮১] "বঙ্গরাজের" এই "ত্যাজ্যপুত্র"টি হরপ্রসাদের মতে বিজয় সিংহ। কিন্তু ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "সিংহলের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার মূলে সত্য আছে কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহা যদি প্রকৃত সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য সভ্যতা প্রসারিত হইয়াছিল। বিজয় সিংহ নাম অনার্য্য নাম নহে ...।"[৮২] খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে বাংলায় আর্য সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কুনোয়ার শিবনাথ সেংগার একটি প্রবন্ধে[৮৩] বিজয় সিংহকে রাজপুত সেংগার গোষ্ঠীর লোক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সেংগার রাজপুতরা বাংলার রাঢ় অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক লেখকদের গঙ্গাহৃদি (Ganga Ridai) যে সেংগারদেরই অধিকৃত রাঢ় অঞ্চল তাঁর সমর্থনও পাওয়া গেছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাহৃদির অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন, "বিপাশা তীরে শিবিরে, তিনি (আলেকজান্ডার) আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত প্রাসিই এবং গঙ্গারিডই নামক দুটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্বের কথা অবগত হইয়াছিলেন। ... গঙ্গরিডই রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ রাজ্য যুক্ত ছিল। গঙ্গানদী গঙ্গারিডই রাজ্যের পূর্ব সীমা ছিল।"[৮৪] রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখেছেন, "... গঙ্গারাদ্ধ শব্দ হইতে গঙ্গারাঢ় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, — রাঢ় তাহার সংক্ষিপ্ত আকার। কেহ কেহ বলেন — এই শব্দটি সাঁওতালদিগের ভাষার 'রাঢ়ো' শব্দ হইতে উৎপন্ন, উহার অর্থ নদী গর্ভস্থ পাথুরিয়া জমি। মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে রাঢ়ের গঙ্গাহৃদয় (Ganga Ridai) নাম পাওয়া যায়।"[৮৫] আর গ্রীক ভৌগোলিকদের রচনা থেকে জানা যায় পার্থলি বা পোর্টলি ছিল গঙ্গাহৃদির রাজধানী।[৮৬] এই পার্থলি -ই বর্তমানের বর্ধমান। বুন্দির কবিরাজ সূর্যমল্ল *বংশ-ভাস্কর*-এ উল্লেখ করেছেন, সেংগারদের এক নিকট আত্মীয় বর্ধমানের রাজা ছিলেন।[৮৭] *মহাবংশ*-তে উল্লিখিত বিজয় সেংগার গোষ্ঠীর লোক— এমন দাবি করা হয়।[৮৮] *দীপবংশ* বইটিতে উল্লেখ আছে, সিংহবাহুর মা, অর্থাৎ বিজয় সিংহের পিতামহী সুসীম বঙ্গদেশের লালের মেয়ে ছিলেন।[৮৯] তা হলে এই লাল হচ্ছে রাঢ়। নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বঙ্গরাজ সীহরাহু (সিংহবাহু) লাড়দেশে সীহপুর নামে এক নগরের পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এই কাহিনীতে উল্লিখিত আছে। কেহ কহে বলেন, এই লাড়দেশ কাথিয়াবাড় অঞ্চলের প্রাচীন লাট দেশ, এবং সীহপুর বর্তমান সীহোর। কাহারও মতে লাড়দেশ প্রাচীন লাঢ় বা রাঢ়-জনপদ এবং সীহপুর বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর। সীহবাহু লাড়দেশে নগর পত্তন করিবার সময় বঙ্গ জনপদেরই রাজা ছিলেন। বঙ্গের সঙ্গে লাড়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং নৈকট্য দেখিয়া মনে হয়, লাড়দেশ বঙ্গের সংলগ্ন রাঢ় হওয়া অসম্ভব নয়।"[৯০] তা হলে বিজয় সিংহ বাংলারই লোক ছিলেন। সিংহলি বিবরণ থেকে জানা যায় বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ দ্বারা 'লাল' পরিবৃত্ত ছিল। বিজয়

সিংহ রাঢ় থেকে সিংহলে সমুদ্র পথেই গিয়েছিলেন। ভরুকচ্ছ এবং সুপ্পারাক বন্দরের পথেই সিংহলের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলত। সম্ভবত বিজয় সিংহ এই পথেই সিংহলে গিয়েছিলেন।[৯১]

'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন'-এ হরপ্রসাদ লিখেছেন যে, তাঁর এই "সম্বোধনে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ আছে", কিন্তু তিনি পরিচ্ছেদ ব্যবহার না করে সেখানে গৌরব ব্যবহার করেছেন, "যেমন প্রথম গৌরব, দ্বিতীয় গৌরব ইত্যাদি।" মোট কুড়িটি গৌরব এখানে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই গৌরবগুলি হল হস্তী-চিকিৎসা, নানা ধর্মমত, রেশম, বাকলের কাপড়, থিয়েটার, নৌকা ও জাহাজ, বৌদ্ধ শীলভদ্র, বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব, নাথ-পন্থ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জগদ্দল মহাবিহার ও বিভুতিচন্দ্র, লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্যগণ, ভাস্করের কাজ, বাংলায় সংস্কৃত, বৃহস্পতি শ্রীকর শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন, ন্যায়শাস্ত্র, চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর, তান্ত্রিকগণ, বাঙালি ব্রাহ্মণ, এবং কায়স্থ ও রাজা।[৯২] এই বিষয়গুলি হরপ্রসাদ 'সম্বোধন'-এই যে শুধুমাত্র বা একমাত্র আলোচনা করেছেন তা নয়। তাঁর বিভিন্ন রচনায় বারবার এসমস্ত প্রসঙ্গ এসেছে; এমন-কি অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধও রচনা করেছেন। এই সম্বোধনে তিনি বিষয়গুলিকে একত্রিত করে সাজিয়ে দিয়েছেন যাতে প্রাচীন গৌরবময় দিনগুলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা হতে পারে। প্রাচীন পুথিপত্র এবং নানা প্রত্নতথ্যের সাহায্যে তিনি গৌরবময় দিনগুলি উদ্ধার করেছেন।

গৌরবময় ইতিহাস উদ্ধারের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা হরপ্রসাদের মধ্যে বারবার লক্ষ করা গেছে। *বঙ্গদর্শন* (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে, ১২৮৪) পত্রিকায় তিনি 'আমাদের গৌরবের দুই সময়' প্রবন্ধে সামাজিক বিপ্লবের দুটি রূপের কথা আলোচনা করেছেন। বুদ্ধি বিপ্লব দুটির একটি খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ বছর থেকে শুরু হয়ে ৪০০ বছর চলেছিল, এবং দ্বিতীয়টি "খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পরে আরম্ভ হইয়া ৩০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের পুনঃসংস্কার করে।[৯৩] এই দুটি ভিন্ন সময়ে যে বুদ্ধিবিপ্লব দেখা দিল সে সম্পর্কে হরপ্রসাদ লিখেছেন, "প্রথমটিতে বৈদিক উপদ্রবের শেষ হয়। দ্বিতীয়টিতে পৌরাণিকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রথমটির প্রভাবে সমস্ত ভারতে বিদ্যুৎ সঞ্চার হয় ; দ্বিতীয়টিতে একজাতির একাধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয় অথচ দুটিতেই আমাদিগের সমান গৌরব। আমাদের সমান সম্মান।[৯৪] আর্যদের, বিশেষ করে ঋষি ও পুরোহিতদের সঙ্গে অনার্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ক্রমশ ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর্য এবং অনার্য দুটি সভ্যতাই বিকাশ লাভ করে। এবং এরই মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার মূল বিষয় "মানসিক বৃত্তি'র উন্নতি হয়েছিল। "মানসিক বৃত্তির উন্নতি দুই প্রকার — ক. বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও খ. হৃদয়বৃত্তির উন্নতি।"[৯৫] মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিপ্লব সামাজিক বিপ্লবের নামান্তর। এই বিপ্লবের মধ্যদিয়েই "দর্শনের সৃষ্টি, আইনের সৃষ্টি ও সর্বভুতে দয়া, অহিংসা পরমধর্ম প্রভৃতি উন্নত নীতির সৃষ্টি হয়।"[৯৬]

বুদ্ধিবিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বে দেখা দিল বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, মগধ সাম্রাজ্যের উৎপত্তি, গ্রীকদের হাত থেকে ভারত উদ্ধার, দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার। শুধু রাজনৈতিক পটপরিবর্তন নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠল।[৯৭] এই গৌরবময় ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে সম্মিলন ঘটেছে তাও গৌরবের সন্দেহ নেই।

১২৮৪ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদ ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে ভারতীয় সভ্যতার যে গৌরবকালের অনুসন্ধানের সূত্রপাত করেছিলেন তা ১৩২১ বঙ্গাব্দেও অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসন্ধান আরও পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিনের চর্চা, বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান, পুথিপত্রের এবং প্রত্নতথ্যের ব্যবহার বাংলার গৌরব উদ্ধারকে আরও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে হরপ্রসাদকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অতীত থেকে পাল-সেনযুগ পর্যন্ত গৌরবময় দিকগুলি তিনি যথার্থই দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (*বঙ্গদর্শন*, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) প্রবন্ধে বাংলার অতীত গৌরব উদ্ধারের কথা বলেছেন, " ... বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার, চৈতন্যের ধর্ম্ম ; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল ? ... কোন্ দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছেন। বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?"[৯৮] বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণার বিস্তারিত প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রাচীন গৌরবময় দিকগুলির উদ্ধার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এবং এর মধ্যেই অনুভূত হয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্পন্দন।

পাল বংশ দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "... পাল বংশকে বাঙালী ভালবাসিয়াছিল, এবং তাঁহাদের গৌরবকে নিজেদের জাতীয় গৌরব বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল ; বাঙলাদেশে তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।"[৯৯] কিন্তু পাল পরবর্তী সেন বংশ দেশের মানুষের মনে পালদের মতো স্থান পেয়েছিল কিনা সন্দেহ। ব্যতিক্রম বল্লাল সেন।[১০০] "একটি লোকগীতিও সেন রাজাদের কাহারও নামে রচিত হয় নাই ; বাঙলা সাহিত্যে লোকস্মৃতিতে সেন রাজারা বাঁচিয়া নাই।"[১০১] সেন-রা অন্য জায়গা থেকে এখানে আসেন এবং গৌড় জয় করেন। সম্ভবত তাঁরা কর্ণাটকের লোক।[১০২] এঁরা হিন্দু ছিলেন। ধর্মাচরণের দিক থেকে পাল রাজাদের প্রতিপক্ষ। অবশ্য আনন্দভট্টের লেখা থেকে জানা যায় প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বল্লালসেনের সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে হিন্দু জাতিপ্রথা কঠোরতর এবং কুলীন প্রথা প্রচলন করেন। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ তাঁর 'অন দ্য অর্গানাইজেশন অব কাস্ট বাই বল্লাল সেন' নিবন্ধটিতে আলোচনা করেছেন।[১০৩] বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়েই সেন রাজবংশের ওপর আঘাত আসে। বখ্‌তিয়ার খিলজি সহজেই গৌড় অধিকার করেন।

সেন বংশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ অপেক্ষা সামাজিক- সাংস্কৃতিক ইতিহাস-চর্চার প্রতি হরপ্রসাদের নজর ছিল বেশি। এ বিষয়ে তাঁর দুটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য — ১. 'ইন্ডিয়া ইন লক্ষ্মণসেন'স টাইম ফ্রম এ রেয়ার ম্যানাস্ক্রিপ্ট রিট্‌ন অ্যাট হিজ কোর্ট'[১০৪] এবং ২. 'অন দ্য অথেনটিসিটি অব দ্য টু নিউলি ডিস্‌কভার্ড ম্যানাস্ক্রিপ্টস্ অব দ্য বল্লালচরিত বাই আনন্দ ভট্ট অ্যাণ্ড দেয়ার ইম্‌পরট্যান্স ইন ট্রেসিং দ্য হিস্ট্রি অব দ্য কাস্ট সিস্টেম ইন বেঙ্গল।'[১০৫] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-তে পাঁচজন বিখ্যাত কবির উল্লেখ আছে। বাংলার সেন রাজাদের আমলে তাঁরা বিকশিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উমাপতিধর ছিলেন দেওপাড়া লিপির লেখক; জয়দেব *গীতগোবিন্দ*-র সুমধুর গীতি কবিতার রচয়িতা এবং গোবর্ধনাচার্য *আর্য্যাসপ্তশতীর* রচয়িতা।[১০৬] "Jaydeva's Gitagovinda mentions five great poets all of whom flourished during the continuance in power of the Sena family of Bengal kings. ... Of these Umapatidhara is the writer of the Deopada inscription ; Jaydeva is the well known author of the exquisite lyric Gitagovinda and Gobardhanacaryya is the author of the Aryya Saptacati."[১০৬] কারণ, ধোয়ী এবং গোবর্ধনাচার্য সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা ছিল না।[১০৭] হরপ্রসাদ বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের পণ্ডিত রঘুনাথ তর্করত্নের কাছ থেকে ধোয়ীর *পবনদূত*-এর একটি কপি সংগ্রহ করেন। *পবনদূত* "has been noticed in the second series of the Notices of Sanskrit manuscripts. Vol.I Part. II."[১০৮]

জয়দেব এবং আরও চারজন কবির রচনা সেন যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। হরপ্রসাদ লিখেছেন, " উমাপতি সেনবংশের শিলালিপিগুলি লিখিয়াছিলেন। গোবর্ধন স্বপ্রণীত *আর্য্যাসপ্তশতী* গ্রন্থে একজন সেনকুলতিলক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। ধোয়ীকবি তাঁহার প্রণীত *পবনদূত* কাব্যে লক্ষ্মণ সেনকেই নায়ক করিয়াছেন .. তিনি তৎকালে বাংলা দেশের— বিশেষ সেন রাজধানী বিজয়পুরের বর্ণনা করিয়াছেন।"[১০৯] এই বিজয়পুর কোথায় ছিল সে সম্পর্কেও ধোয়ীর রচনায় ইঙ্গিত আছে। হরপ্রসাদ সেই ইঙ্গিতের অর্থ করেছেন— উত্তরে সেই পবিত্র স্থান ত্রিবেনি যেখানে গঙ্গা থেকে যমুনা আলাদা হয়েছে। এই ত্রিবেনি কলকাতা থেকে ৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তার উত্তরে গঙ্গার ধারে বাংলার রাজধানী বিজয়পুর অবস্থিত ছিল। সেখানে একটি বিজয় স্তম্ভ আছে।[১১০] লক্ষ্মণ সেনের বাবা বল্লাল সেনের সময় অনেক সংবাদ আমরা পাই *বল্লালচরিত* থেকে। এর লেখক আনন্দভট্টের পূর্বপুরুষ অনন্তভট্টকে বল্লালসেন পূর্ববঙ্গে ভূমিদান করেছিলেন। *বল্লালচরিতে* দেখি নবদ্বীপের চৈতন্যভক্ত রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ-র রাজসভায় *বল্লালচরিত* লেখা হয়েছিল। আনন্দ ভট্টের এই বইটি বল্লাল সেনের সমসাময়িক কালের তিনজন লেখকের লেখা তিনটি বইয়ের উপর নির্ভর করে লেখা। এঁরা হলেন— ১. হিমালয়ের বদারিকাশ্রমের শৈব সাধক সিংহ গিরি। তিনি বল্লালকে শৈবধর্মে দীক্ষিত

করেন। এঁর লেখা *ব্যাস পুরাণ*। ২. এই বংশেরই বিখ্যাত কবি শরণ দত্ত। তাঁর লেখা বই *বল্লালচরিত*। ৩. বটু দাসের সংগ্রহে (১২০৫) উল্লেখিত হয়েছে কালিদাস নন্দীর *জয় মঙ্গল গাথা*।[১১১] হরপ্রসাদের মতে এই বইটিতে অনেক ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায় এবং "it can be accepted as an authentic record of Ballal's reign."[১১২]

বল্লাল-লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পরবর্তীকালে বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় দুটি দিক লক্ষ্যণীয়— ১.বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত এবং ২. মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের উন্নতি। বৌদ্ধসমাজের অধঃপতন অবশ্য সেন বংশের রাজত্বকালেই শুরু হয়েছিল। বৌদ্ধ পুথিপত্র আশ্রয় পেয়েছিল নেপালে এবং তিব্বতে।[১১৩] উপরিউক্ত দুটি লক্ষ্যণীয় দিকের কথা হরপ্রসাদ বারবার তাঁর বিভিন্ন রচনা ও অভিভাষণে উল্লেখ করেছেন এবং যথার্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্য থেকেই তিনি বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার উপাদান পেতে চেয়েছেন। ব্রায়ান হটন হজসন এবং আলেকজান্ডার চোমা দ্য কোরস-এর নেপাল তিব্বত থেকে আবিষ্কৃত পুথিসমূহ এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাঠ ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হরপ্রসাদের দৃষ্টি উন্মোচনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। হরপ্রসাদ নিজেও নেপাল থেকে অনেক পুথি আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে বাংলায় প্রাপ্ত পুথিপত্র তিনি খুঁটিয়ে দেখেছেন, লক্ষ করেছেন নানাবিধ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনযাত্রার প্রণালী। ফলে তিনি লেখেন, *ডিস্‌কভারি অব লিভিং বুদ্ধিজ্‌ম ইন বেঙ্গল* (১৮৯৭), দি নর্দার্ন বুদ্ধিজ্‌ম (*আই-এইচ-কিউ*, ১৯২৫), বুদ্ধিজ্‌ম ইন্ বেঙ্গল সিন্স দ্য মুহমেডন কন্‌কোয়েস্ট (*জে-এ এস-বি*, ১৮৯৫), এনসিয়েন্ট বেঙ্গলি লিটারেচার আন্ডার মুহমেডান পেট্রনেজ (*প্রসেডিংস, এ-এস-বি*, ১৮৯৪), *বেঙ্গলি বুদ্ধিস্ট লিটারেচার* (*দি ক্যালকাটা রিভিউ*, ১৯১৭) প্রভৃতি ইংরেজি এবং বাংলায় আরও অনেক প্রবন্ধ, রিপোর্ট, ক্যাটালগের ভূমিকা এবং অভিভাষণ। হরপ্রসাদ এই রচনাগুলিতে তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর চর্যাপদের আবিষ্কারের বিষয়টি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এ সমস্তের মধ্য দিয়ে তিনি নিরন্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন।

৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসে মূল সূত্র'[১১৪] প্রবন্ধে ইতিহাসের সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্যের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৮৭ সালে *বিভা* পত্রিকার 'জাতিভেদ' প্রবন্ধে। এই দুটি প্রবন্ধেই জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসাই প্রকাশিত । এ প্রবন্ধ দুটির পাশাপাশি 'ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস'[১১৫] প্রবন্ধটিও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কারণ, বাংলার সামাজিক ইতিহাস বুঝতে হলে এখানকার ধর্ম ও জাতিভেদপ্রথা বুঝতে হবে— ধর্মের সঙ্গে জাতিপ্রথা, জাতিপ্রথার সঙ্গে সমাজ সম্পর্কযুক্ত।

"বাংলার সমাজের ইতিহাস অত্যন্ত কঠিন ও জটিল।"[১১৬] এদেশের অধিবাসীদের সামাজিক স্তর বিন্যাস যে জাতিভিত্তিক সেখানে নানা রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে। জাতি বলতে সঠিক অর্থে কী বোঝায়? এই বিষয়টি পরিষ্কার না হলে সামাজিক ইতিহাস অন্বেষণে নানা রকমের অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিতে বসিলে একটি কথার মানে লইয়া ভীষণ গোলে পড়িতে হয়। সে কথাটি জাতি। কোল, ভীল, গারো, খাসিয়া ইহারাও জাতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ইহারাও জাতি। তেলি, মালি, কুমার, কৈবর্ত, ইহারাও জাতি। ইহাতে কোন কোন সময় গোলে পরিতে হয়। জাতিভেদ বলিতে কোন্ জাতিভেদ বলিব? Ethnos-এর ভেদ, বর্ণের ভেদ না পৈত্রিক ব্যবসায়ের ভেদ? বাংলায় কিন্তু তিন রকম জাতিই আছে। ... ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ ইহারাও জাতি। আবার ব্যবসায়ী ও নবশাখাদি জাতিও আছে। তা ছাড়া ধর্ম ভাঙিয়াও জাতি হয়— যেমন বৈষ্ণব জাতি, যোগী জাতি ইত্যাদি"।[১১৭] জাতি শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত — Ethnos জাতি, Cast জাতি, tribe জাতি, ব্যবসা ভিত্তিক স্তর বিন্যাসও জাতি। ফলে বাংলার জাতিতত্ত্বের আলোচনা দুরূহ। আর বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার অন্যতম সূত্র হচ্ছে জাতিতত্ত্ব। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দেখা যায় "অপরিবর্তনীয় বংশানুক্রমিক অধিকারের নাম জাতিভেদ।" [১১৮] এই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি কিভাবে হল "তাহার ইতিহাস পাওয়া বড়ো কঠিন এবং এই ইতিহাস সম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদও আছে।"[১১৯] হরপ্রসাদ লিখেছেন, 'ঋগ্বেদে' ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কোনো উল্লেখ নাই। উহাতে আর্য ও কৃষ্ণ এই দুইটি জাতির উল্লেখ আছে।"[১২০] এর মধ্যে আর্যগণ যজ্ঞাদি করতেন। তাঁরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কিন্তু ভাগগুলির কোথাও কোনো উল্লেখ নেই। আর্য এবং কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। *যজুর্বেদ* ও *অথর্ব বেদে* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ আছে, শূদ্রের উল্লেখ নেই।[১২১] শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় আরও পরে— *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ও *বৃহদারণ্যকে*।[১২২] পূর্বে উল্লেখিত কৃষ্ণগণই যে শূদ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইভাবে চারটি বর্ণের — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের — উৎপত্তি। এই চারটি বর্ণ চারটি জাতি হিসেবে পরিচিত হলো। কিন্তু জাতি ব্যবস্থা এই চারটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। ঠিক হয় যে, বর্ণসংকরের ফলে বহুজাতির সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে ক্রিয়া শূন্য হয়ে পড়ে। "পৌন্ড্র, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খসাদি জাতি ক্রিয়াশূন্য ক্ষত্রিয়। ইহাদের মধ্যে পৌন্ড্র গণ পৌন্ড্রবর্দ্ধন পশ্চিম বাংলায় বাস করিত, ইহাদের বংশাবলী এখনো পুঁড়ো বা সাধুভাষায় পুণ্ডরীকাক্ষ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। ওড্রগণ উৎকলে বাস করিত।"[১২৩] এরা সকলেই চাতুর্বর্ণ্যের বাইরে এবং পতিত ক্ষত্রিয়। মনুর মতে, "ব্রাহ্মণাদি বর্ণ গায়ত্রীহীন হইলে ব্রাত্য হয়।"[১২৪] এই ব্রাত্য ও লোকায়ত ধর্ম সম্পর্কে হরপ্রসাদ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান হয়।

এগুলি বেদবাহ্য ধর্ম। "যত বেদবাহ্য ধর্ম আছে, চার্বাক বা লোকায়তিক দলের মতই খুব কড়া। ইহাঁরা বেদও মানিতেন না, ঈশ্বরও মানিতেন না।"[১২৫] হরপ্রসাদ ১৯২৫ সালে *ঢাকা ইউনিভার্সিটি বুলেটিন* (নং ১) -এ প্রকাশিত তাঁর 'লোকায়ত' প্রবন্ধে লিখেছেন, "The Lokayata do not believe in Isvara or in a future existence. Virtue and vice they have none. They belive in the present and not in the past nor in the future. They are positivist."[১২৬] এই লোকায়ত দর্শনকেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "In all probability it (Lokayata) was a body of beliefs and parctices, deeply rooted in the lives of the masses and at the same time hostile to the Brahmanical doctrines."[১২৭] হরপ্রসাদ এই বিষয়টিকে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের নিরীখে বিচার করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকায়ত দর্শনে বিশ্বাসী মানুষের দল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নির্দেশিত চাতুর্বর্ণের বাইরে ; ফলে তাঁরা কী জাতি হিসেবে পরিচিত হবেন সে বিষয়ে সংশয় আছে।

হরপ্রসাদ 'ব্রাত্য' সম্পর্কে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন[১২৮] তা জাতিতত্ত্বের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নেই। *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা* (১.৩৭-৩৮) অনুযায়ী 'সাবিত্রী পতিত'রাই ব্রাত্য। হরপ্রসাদ *প্রাচী* (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)-তে প্রকাশিত 'ব্রাত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন, " দেখিলাম সকলেরই মত সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী পতিত হইলে ব্রাত্য হয়।"[১২৯] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ঠিক সময়ে পৈতা না হলে এবং "যাহার দশবিধ সংস্কার হয় নাই, সে ব্রাত্য।"[১৩০] একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আমরা শুনি *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* এ (৩.৪-৫) এবং "the Vratya is interpreted by Sayana as 'sastriya samskarahinam purusam' i. e. a person who has not undergone the process of prescribed rituals and initiations."[১৩১]

ব্রত থেকে ব্রাত্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এমন সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "ব্রত হইতে পতিত, এই অর্থে ব্রত শব্দের উত্তর কোনরূপ তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া ব্রাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে তাহার সূত্র পাণিনি ব্যাকরণে নাই।"[১৩২]

ঋগ্বেদ সংহিতায় "ব্রাত শব্দের অনেক বার ব্যবহার আছে। ব্রাত শব্দের অর্থ প্রকাণ্ড দল, যাহার সংখ্যা করা যায় না।"[১৩৩] এঁদের সঙ্গে আর্য ঋষিদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। "In one place in the really historical portion of the *Rg-veda*, the Rsi prays to his God for a chariot capable of resisting the *Vrata*. ... The conclusion was that Vrata meant men outside the Rsi circle and hostile to it." [১৩৪] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে "... the meaning of *gana* and *vraata* were not different."[১৩৫] এবং ব্রাত্যকে ট্রাইবাল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়েছে।[১৩৬] ব্রাত থেকে ব্রাত্যের উৎপত্তি হয়েছে এমন যুক্তি পাওয়া যেতে পারে *যজুর্বেদ*-এ উল্লিখিত "ব্রাতে সমবেতা ব্রাত্যাঃ" থেকে।[১৩৭]

এই পতিত, যাযাবর, চাতুর্বর্ণ্যের বাইরে অবস্থিত অনার্য ব্রাত্যদের জীবন যাপন

পদ্ধতি আর্য-ব্রাহ্মণদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। "তাহারা আর্যজাতি এবং ঋষি সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী।"[১৩৮] ব্রাত্যস্তোম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঋষিরা ব্রাত্যদের নিজেদের সমাজভুক্ত করে নেয়।[১৩৯] 'এক ব্রাত্য' শিব ও ঋষি-সমাজে স্থান পায়। কিন্তু "ব্রাত্যরা শোধিত হইলেও অনেকে গোত্র পান নাই।"[১৪০] ফলে আর্যদের সঙ্গে শোধিত ব্রাত্যদের বিবাহ হতো না।

লোকায়ত এবং ব্রাত্যদের আর্য সমাজে স্থান দিলেও জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা পরবর্তীকালের সামাজিক ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। ক্রমে বৌদ্ধদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর বিভিন্ন অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রচারক পাঠালেন তখন তাঁরা "সর্বপ্রথমে বাংলা দেশে প্রথম প্রবেশ করিল। বাংলায় তৎকালে ব্রাহ্মণ ছিল কিনা সন্দেহ।"[১৪১] বাংলায় মূলত পৌণ্ড্র ও কিরাত জাতি বাস করত। এরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। "অঙ্গ, বঙ্গ, কলি, সৌরাষ্ট্র ও মগধ এই কয়টি দেশের উপরই ব্রাহ্মণগণের রাগ, এবং এই কয়টি দেশই বৌদ্ধ অথবা জৈন প্রধান।"[১৪২] বাংলার তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকলেও পালরাজাদের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এবং উভয় ধর্মের মধ্যে কিছুটা মিশ্রণ ঘটতে থাকে। *ধর্মমঙ্গল* থেকে জানতে পারা যায় যে, ধর্মপালের সময় থেকে ধর্মপুজোর সূত্রপাত। "রমাই বাইতি এই ধর্মের যাজক ছিলেন। কালুডোম এই ধর্মপ্রচার বিষয়ে লাউসেনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।"[১৪৩] ডোমেরাই এই পুজোর প্রধান পণ্ডিত হন। বৌদ্ধধর্ম ধর্মপুজোয় রূপান্তরিত হয়।[১৪৪]

বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। জাতপাত ও কৌলীন্য প্রথা প্রচলনের ব্যাপারে বল্লাল সেনের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। হরপ্রসাদের মতে, "বল্লাল সেন অন্ত্যজ জাতিদিগকে ব্রাহ্মণ প্রদান করিয়া হিন্দু করিয়া লইয়া ছিলেন এবং বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান।"[১৪৫]

জাতিভেদ প্রথা বাংলার সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। " ধোপা, নাপিত, গুরু, পুরোহিত"[১৪৬] এই চারটি জাতির বৃত্তি তৎকালীন সামাজিক অনুশাসন নির্ভর। এঁদের বৃত্তিগত আচরণে যুক্তির অভাব লক্ষিত।

বাংলার অনেক অধিবাসী মুসলমান হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "অনেকগুলি জাতি আছে, তাহারা অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। এই অর্ধ হিন্দু ও অর্ধ মুসলমান অনেকগুলি প্রাচীন লোককে তাহাদের জাতির কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে আমরা আঠারো জাতি। ... পোটো, পাজারি, নিকারি ও গৃহী-বেদে যে এই শ্রেণীভুক্ত তাহা সকলেই স্বীকার করিল। ইহারা লক্ষ্মী পূজা, ষষ্ঠী পূজাও করে এবং তাজিয়া লইয়াও বেড়ায়। কলিকাতার একজন পোটোকে জিজ্ঞাসা করায় সেও বলিল,

"হ্যাঁ আমরা হিন্দু মুসলমান দুটি বটি।"[১৪৭]

আবার অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে জাতিপ্রথা বিচিত্র। একই জাতির মধ্যে একদল আচরণীয়, আর একদল অনাচরণীয়। কৈবর্তদের মধ্যে তিনটি জাতি— চাষি কৈবর্ত এবং মালা কৈবর্ত। এদের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক নেই, একে অন্যের সঙ্গে আহার-বিবাহ নিষিদ্ধ। "বাগদি বলিতে আমরা একটি জাতি বুঝি, কিন্তু ... পাঁচ প্রকার বাগদি এক জাতি ... চণ্ডালদের মধ্যেও এইরূপ ছয়-সাত প্রকারের চণ্ডাল আছে। তাহাদের মধ্যে সরু ও সিউলি চণ্ডালেরা নুনে ও জেলে চণ্ডালদিগকে পুরোহিতও দেয় না।"[১৪৮] জেলে ও মালাদের তফাতটা অদ্ভুত। জেলেরা জলে এবং মালারা ডাঙায় মাছ বিক্রি করলে তাদের জাত যায়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই রকম নানা ভাগ লক্ষ করা গেছে।

বাংলার জাতিসমূহের সুনির্দিষ্ট পরিচয় লাভের জন্য জাতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞগণ প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। সেন্সাস কমিশনার এইচ. এইচ. রিজলে ১৯০১ সালে "বাঙ্গালার মধ্যে কোন্ জাতি বড় আর কোন্ জাতি ছোট তাহার একটি ফর্দ"[১৪৯] তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে সমস্ত জাতিই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে গোলযোগ শুরু হয়। পরে এডওয়ার্ড গেট ঠিক করেন, ছোট বড়ো নয়, আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে জাতির পরিচয় নির্ণীত হবে। সাময়িকভাবে গণ্ডগোল মিটলেও দেশজুড়ে জাতিতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জাতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়, কিন্তু রিজলে বা ডাল্‌টনদের "লেখা কোন ভাবেই ভারতের ইতিহাস সংগঠনের দৃষ্টি থেকে সন্ধানের ফল নয়, সেভাবে বোঝার চেষ্টাও নয়।"[১৫০] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে "ইতিহাস সংগঠনের দৃষ্টি" বজায় রেখে বাংলার জাতির কতকগুলি ভাগ দেখিয়েছিলেন : হরপ্রসাদ সেই সমস্ত ভাগের অসংখ্য উপবিভাগ, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, আচরণীয়-অনাচরণীয় দিকগুলি অনুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন এবং তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

সংস্কার মুক্ত, যুক্তিনিষ্ঠ, জনবৃত্তের ইতিহাস অন্বেষণ করেছেন হরপ্রসাদ। তিনি সমাজের নানা ভাবাদর্শের মধ্যে সমন্বয় সূত্র খুঁজে পেতে চেয়েছেন। জাতিভেদ সম্পর্কে তিনি যখনই আলোচনা করেছেন তখন বর্ণধর্ম অপেক্ষা তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে সমাজ বিন্যাসের বৃত্তিগত ভাগের দিকটি। তিনি সব কিছুর মূলে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এমন-কি ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মূলেও তাঁর দৃষ্টি সামাজিক ইতিহাসের মূলানুসন্ধানে নিবদ্ধ।

৫

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাস-অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। প্রাচীন ভারতের আর্য-সভ্যতা এবং আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনায়

নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। আবিষ্কার করেছেন অনেক নতুন তথ্য। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন নব আবিষ্কৃত এবং পুরানো তথ্য। উন্মোচিত হয়েছে নতুন দিগন্ত। *প্রসেডিংস অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, জর্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, জর্নাল অব দ্য বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি, দ্য ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি, দ্য হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলি, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* প্রভৃতিতে হরপ্রসাদ ছোটো বড়ো অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন। আপাত বিচ্ছিন্ন রচনাগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে। তিনি ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, পুথিপত্র যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা বা প্রতিবেদন লেখার সময় সামাজিক তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেছেন। বুঝতে চেষ্টা করেছেন সামাজিক ইতিহাসের মূল সূত্রটি কী। তাঁর সমাজ মনস্ক আলোচনায় সমস্ত স্তরের মানুষের উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয়।

হরপ্রসাদ দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন—*কাঞ্চনমালা*[১৫১] ও *বেনের মেয়ে*।[১৫২] দুটি উপন্যাসই ইতিহাস আশ্রিত। প্রথমটির বিষয়বস্তু : অশোকের রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার, বৌদ্ধধর্ম বিরোধীদের সঙ্গে অশোক মহিষী তিষ্যরক্ষিতার ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা, অশোকের পুত্র কুণালের প্রতি বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার ব্যর্থ কামনাজাত প্রতিহিংসার চরিতার্থতা, অবশেষে বৌদ্ধধর্মে আত্মসমর্পণ। আর দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু: বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবশেষ, তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, সম্পূর্ণ নতুন ইসলাম ধর্মের পদধ্বনি। এই উপন্যাস দুটি সাহিত্য, ইতিহাস নয়। কিন্তু ইতিহাসের উপাদান আছে। প্রসঙ্গত অশীন দাশগুপ্তের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, "যদি কোন বিরল সাহিত্যিক অন্য যুগের মনকে তাঁর রচনায় ধরতে পারেন, পাঠক যদি সেই মনকে পৃথক বলে চেনেন কিন্তু স্বাভাবিক বলে মানেন তা হলে সেই সাহিত্য নিঃসন্দেহে ইতিহাসধর্মী।[১৫৩] এই বক্তব্যের আলোকে আলোচ্য উপন্যাস দুটি ইতিহাস ধর্মী।

অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা নিয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এটা ইতিহাসের একটা অন্যতম মূল সমস্যা: এই সমস্যার কথা *কাঞ্চনমালায়* আছে। এবং এই সমস্যার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেছেন হরপ্রসাদ। অশোক 'শূদ্র রাজা',[১৫৪] বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁর রাজত্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গুরুত্ব হারায়। ফলে মৌর্যদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষোভ প্রতিফলিত হয় মৌর্য বিরোধী উত্থানে। ক্ষমতাসম্পন্ন অশোক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ্য শক্তি বিদ্রোহ করতে সক্ষম হয়নি। তাদের অসন্তোষ প্রকাশ পায় অশোকের মৃত্যুর পর। হরপ্রসাদ 'কজেজ অব দ্য ডিস্‌মেম্বারমেন্ট অব দ্য মৌর্য এম্পায়ার' প্রবন্ধে লিখেছেন, খুব দ্রুত তারা মৌর্য উত্তরাধিকারীদের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। কিন্তু তারা সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিল না। তারা নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ করত না। ক্ষত্রিয়রা তাদের হয়ে যুদ্ধ করে তাদের বিখ্যাত করে তুলেছিল। এই ক্ষত্রিয়রাই নন্দদের উন্মূলিত করেছিল। তারা নিজেদের জন্য লড়াই করার জন্য সামরিক ব্যাপারে

নজর দিল। এবং তারা মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক প্রধান পুষ্যমিত্রকে নিজের দলে টানল। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং তিনি অব্রাহ্মণদের ঘৃণা করতেন।[১৫৫] কিন্তু পরবর্তীকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে হরপ্রসাদের তত্ত্ব নতুন তথ্যের আবিষ্কার ও বিশ্লেষণে নাকচ হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ বা মৌর্য শাসনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য শক্তির উত্থান নয়, প্রশাসনিক-সামাজিক-রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক কারণ সমূহ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। তবু হরপ্রসাদের তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা দীর্ঘ বিশ্লেষণের অবতারণা করেন।[১৫৬]

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর শুঙ্গরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। কিন্তু শুঙ্গ বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেন নি। কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, বাণভট্টের *হর্ষচরিত* এবং বৌদ্ধগ্রন্থ *দিব্যাবদান* থেকে শুঙ্গদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানতে পারা যায়। হরপ্রসাদ তাঁর 'হু ওয়্যার দ্য শুঙ্গস ?''[১৫৭] প্রবন্ধে গোত্র পরিচয় ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, শুঙ্গরা ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। মায়ের দিক থেকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য *কাঞ্চনমালা*-র আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ''পুরাণে পুষ্যমিত্রের বংশধরদিগের শুঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রবল শুঙ্গদিগের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অত্যুন্নতি হয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আচার ব্যবহারের পুনঃপ্রবর্ত্তন হয় এবং বৌদ্ধদিগের প্রভাব খর্ব হয়।''[১৫৮] শুঙ্গদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

হরপ্রসাদের দ্বিতীয় উপন্যাস *বেনের মেয়ে*-র বিষয়বস্তু : হাজার বছরের পুরানো বাংলার সামাজিক চিত্র। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবসান এবং হিন্দু রাজা হরিবর্মার[১৫৯] আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বময় সংঘাত কাহিনি জনজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের কাহিনি রাজবৃত্তের নয়, জনবৃত্তের। ধনসম্বলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, বৃত্তি ভিত্তিক জাতির মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, এইসব বৃত্তান্ত উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠায় জনসমাজের একটি ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

একাদশ শতাব্দীর পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসে হরিবর্মাদেব এবং তাঁর মহাসান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের [১৬০] উপস্থিতি কালানুক্রম অনুযায়ী কতটা সঠিক প্রশ্ন উঠতে পারে ; কিন্তু হরপ্রসাদ উপন্যাসে উল্লিখিত সময়ের আগে-পিছে সময়ের বিস্তার ঘটিয়ে ''নানা স্তরের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক মান-মর্যাদার হেরফের, রুজি-রোজগার ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক আবহ সমেত গোটা সমাজের অখণ্ডরূপ প্রত্যক্ষ করে''[১৬১] তুলেছিলেন। *বেনের মেয়ে* -তে অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে সমসাময়িক পুথিপত্র। তাঁর আবিষ্কৃত *চর্যাপদ* [১৬২] থেকেও তিনি অনেক সহায়তা লাভ করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছিলেন, ''বেনের মেয়ে' ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত।

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের গীতাবলী আবিষ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কীর্তিস্তম্ভমালার অন্যতম। ইহাতে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম আছে, একথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না।"[১৬৩] *বেনের মেয়ে*-তে সামুদ্রিক বাণিজ্যের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও জলপথে দেশ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নদীর তীরবর্তী জনপদগুলি সম্পর্কেও অনেক তথ্য আমরা পাই। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের দুটি রচনা উল্লেখযোগ্য— ১. 'রেমিনিসেন্স অব সি-ভয়েজ ইন্ এনসিয়েন্ট বেঙ্গলি লিটারেচার'[১৬৪] এবং ২. নোটস্ অন দ্য ব্যাংকস্ অব দ্য হুগলি ইন ১৪৯৫।[১৬৫]

সমুদ্রযাত্রার বিবরণ আছে এমন পাঁচটি কাব্যের বিশ্লেষণ করেছেন হরপ্রসাদ। এই কাব্যগুলি ১৪৯৫ থেকে ১৫৯৫ -এর মধ্যে লেখা।[১৬৬] কিন্তু এই কাব্য রচয়িতাদের সমুদ্র সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তারা নদীতে নৌচালনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সমুদ্র তাঁদের কাছে বড়ো নদী, পদ্মার চেয়েও বড়ো।[১৬৭] কিন্তু জলপথে দস্যুভয়ও ছিল। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা কবিকঙ্কন চণ্ডী থেকে জানা যায়, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাণিজ্য-নৌকা ফিরিঙ্গি অর্থাৎ পর্তুগীজ জলদস্যুদের দেশে পৌঁছায়। তারা নাস্তিকদের ভয়ে দিন-রাত নৌকা বাইত।[১৬৮] জলপথে বাণিজ্য তরী অতিক্রমের কাহিনি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হরপ্রসাদ সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা বারবার বলেছেন।

নব আবিষ্কৃত মনসার ভাসান-এর কবি বিপ্রদাস পিপ্পলাই হুগলি নদীর তীরবর্তী যে সমস্ত অঞ্চলের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলি আধুনিক নাম। এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ আছে। হরপ্রসাদ লিখেছেন : সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণার সময় তিনি তার কিছুটা বাইরে এসে বাংলা পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করেছেন। বারাসত মহকুমা থেকে দুগোছা বাংলা পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন। একটি পাণ্ডুলিপি মাত্র ৩১ পৃষ্ঠার। প্রথম পৃষ্ঠা নেই। তৃতীয়টিও একই বইয়ের অসম্পূর্ণ কপি। এটিরও প্রথম পৃষ্ঠা নেই। দ্বিতীয় অংশের ৪৫ পৃষ্ঠা পুরানো কাগজে লেখা, হাতের লেখার ছাদ পুরানো। বাকিটা আধুনিক ছাদের হাতের লেখায় লিখিত।[১৬৯] এই কাব্যে ত্রিবেনি ও সাতগাঁ-র উল্লেখ আছে। বর্ণনা আছে সাতগাঁ-এর ধন-সম্পদের। সেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সুখে শান্তিতে সমানাধিকারে বসবাস করত। কুমারহট্ট (বর্তমান হালিশহর) ও হুগলির নাম আছে। হুগলির প্রাচীন নাম গোলিন। পর্তুগীজরা এর নাম দেয় হুগলি। কিন্তু বিপ্রদাস পর্তুগীজদের আগে লিখলেও তাঁর রচনায় হুগলি নামের উল্লেখ আছে।[১৭০] এই ভাবেই হুগলি নদীর তীরবর্তী ভাটপাড়া, মূলাজোড়, গাড়ুলিয়া, চাঁপদানি, চন্দননগর, ইছাপুর, চুঁচুড়া, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্থান নাম।[১৭১] সাতগাঁ থেকে কালিঘাট এই যাত্রা পথটি বিপ্রদাস বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। অবশ্য মনে হয় এর কিছু কবিতা প্রক্ষিপ্ত।[১৭২] তবু এই তথ্যগুলি অন্তত এদেশের ইয়োরোপীয় বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। কারণ, হুগলি নদীর তীরবর্তী চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইয়োরোপীয় বণিকরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

হরপ্রসাদের সৃজনশীল সাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি তিনি প্রাচীন সাহিত্য থেকে আহরণ করতে চেষ্টা করেছেন ঐতিহাসিক তথ্যাদি। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি অনেক ইতিহাস বিষয়ক নিবন্ধাদি রচনা করেছেন যার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সমসাময়িক লেখকদের রচনা। 'একজন বাঙালি গভর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব' [১৭৩] 'সমাজের পরিবর্ত কয়রূপ'[১৭৪], 'কলিকাতা দুই শত বৎসর পূর্বে'[১৭৫] 'হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা'[১৭৬] প্রভৃতি প্রবন্ধ।

আলিবর্দি খাঁ যখন বাংলার সুবাদার তখন তাঁর অধীনে একজন বাঙালি দুর্লভরাম "উড়িষ্যার কায়েমি নবাব"[১৭৭] নিযুক্ত হন। তিনি মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে অপদার্থতার পরিচয় দেন। পালাতে গিয়ে মারাঠাদের হাতে বন্দী হন। তাঁর হাস্যকর চরিত্র-চিত্রণ কতটা ইতিহাস সম্মত সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[১৭৮] হরপ্রসাদ সইদ গোলাম হোসেন খানের রচনার[১৭৯] উপর নির্ভর করে এই কাহিনিটি লেখেন।

ইয়োরোপীয় সমাজে বিপ্লব ও সংস্কার কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় তার সঙ্গে ভারতীয় সমাজের একটি তুলনামূলক চেহারা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন হরপ্রসাদ।[১৮০]

সমাজ অর্থনীতির বিবর্তনের চেহারা ইয়োরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল তা ঐতিহাসিকদের রচনায় ধরা পড়েছে।[১৮১] ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা কয়েকটি শহরের মধ্যে অন্যতম কলকাতার প্রতিষ্ঠা নিয়ে মতানৈক্যের অন্ত নেই।[১৮২] কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে ইংরেজদের বাণিজ্য ছিল। "১৬৯৮ খৃ. অব্দে তাঁহারা কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই কয়েকখানি গ্রামের জমিদারি ক্রয় করিতে অনুমতি পান।"[১৮৩] এবং এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা নগর সৃষ্টি হয়। বহু এদেশীয় মানুষ ব্যবসা করার উদ্দেশে এখানে এসে হাজির হন এবং ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। "১৬৯৮ সাল হইতে ১৭৬৭ পর্যন্ত কলিকাতার প্রথম যুগ বলিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা একটি সামান্য গ্রাম হইতে একটি নগরের আকার ধারণ করে।"[১৮৪]

কলকাতার প্রতিষ্ঠা ও গড়ে ওঠার মুখে আওরংজেবের রাজত্ব অটুট ছিল। কিন্তু কলকাতা নগরীর উত্থানের ক্ষেত্রে ইংরেজরা মুঘলদের কাছ থেকে বিশেষ বাধা পায়নি।[১৮৫] মুঘল সম্রাট আওরংজেব সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ধমানে অনুষ্ঠিত অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে (১৯১৫) ইতিহাস শাখায় একটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা।' উক্ত সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার।

প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস রচনায় অনীহা সম্পর্কে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটি মেনে নিলেও, হরপ্রসাদের মতে, মুসলমান বিজয়ের পর আট নয়

শত বৎসরে "... বড়ো বই না থাকুক, ছোটো ছোটো রাজাদের ছোটো ছোটো ইতিহাস আছেই আছে এবং খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবেই যাইবে।"[১৮৬] হরপ্রসাদ এইরকম অনেক পুথিপত্রের সন্ধান দিয়েছেন, যেগুলি থেকে আওরংজেব সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। নাথুরাম নামে যোশীমঠের এক পণ্ডিত "মারাঠি, মৈথিলি, বাঙালি, হিন্দুস্থানি জন কতক বিদ্যার্থী লইয়া '*বুদ্ধিচরিত*' নামে এক প্রকাণ্ড পুথি লেখান।"[১৮৭] এই পুথি লেখার উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হলেও, বুঝা যায়, উক্ত পুথি "ফরুখসিয়ারের রাজত্বকালে লেখা হয়।"[১৮৮] এই পুথি থেকে মুঘল বাদশাহদের নাম, কার পরে কে রাজা হয়েছেন জানা যায়। [১৮৯] এই *বুদ্ধচরিত*-এর লেখক বুদ্ধ এবং বৌদ্ধবিদ্যা কিছুই জানেন না। তাঁকে জানেন শুধু বিষ্ণুর অবতার হিসাবে। তিনি সমস্ত জীবের মধ্যে শান্তি প্রচার করেছেন। আওরংজেবের শাসনের উল্লেখ করে তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া চাপানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আকবরের প্রশংসা করেছেন।[১৯০] তাছাড়া আওরংজেবের সমসাময়িক কালে কুমায়ুনের রাজা বাজবাহাদুর চন্দ্র আওরংজেবের সমাদর না পাওয়ায় তিনি আওরংজেবের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। বাজবাহাদুর অনন্তদেবকে দিয়ে 'স্মৃতি কৌস্তভঃ' — "the high distinction of being the standard works of law in Middle and Western India"[১৯১] লিখিয়েছিলেন।

রাজপুতদের সঙ্গে আওরংজেবের শত্রুতা ও মিত্রতা উভয় সম্পর্কই বজায় ছিল। ভাট ও চারণদের পুথি থেকে এ সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি পাওয়া যায়।[১৯২] তা ছাড়া "আরঙ্জেবের একজন প্রধান সেনাপতি যোধপুর রাজা যশোবন্ত সিংহের প্রধানমন্ত্রী মুতা নয়ানসী [মুহণৌত নৈণসী]। রাজপুতানার একখানি মস্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম 'খ্যাত নয়ানসী।'"[১৯৩] হরপ্রসাদ নয়ানসীর বাড়ি গিয়ে দেখেছেন রাজপুত রাজ্যের পুরানো হিসাবপত্র। এই হিসাবপত্র থেকে "মোগল সাম্রাজ্যের আরঙ্জেবের সময়ের একটা প্রকাণ্ড দেশের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।[১৯৪] গুজরাটের সুবাদার অভয়সিংহের হিসাব রক্ষক খ্যাতবালা জোষী পরিবারের মজুত হিসাবপত্র থেকে "আরঙ্জেবের আর একটি সুবার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।[১৯৫] *অজিতোদয়* এবং *অভয়োদয়* নামে লেখা দুটি সমসাময়িক বই থেকেও আওরংজেব সম্পর্কে জানা যায়। আওরংজেবের একজন সেনাপতি ছিলেন বুঁদির হাড়াচৌহানরাজ। এঁদের *বংশ ভাস্কর* নামক ইতিহাস বইটি থেকে আরঙ্জেব সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। শিখদের লেখা ইতিহাস এবং মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে আওরংজেবের সংবাদ পাওয়া যাবে। আরও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাবে "কাথিয়াবাড়, মাড়বার, উদয়পুর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে" [১৯৬] জৈনমন্দিরে রক্ষিত *রাসমালা*, *ঢাল*, *সিঝাই* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে।

স্যার যদুনাথ সরকার তথ্যগত ভুলের অভিযোগ তুলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে 'হিন্দুর মুখে আরঙ্জেবের কথা' প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ সভায় পড়তে দেননি। হরপ্রসাদ অভিযোগ করেছিলেন যদুনাথের লেখা আওরংজেবের উপর মূল্যবান গ্রন্থটি শুধুমাত্র মুসলমান

লেখকগণের রচনার উপর নির্ভর করে লেখা।[১৯৭] যদুনাথ হরপ্রসাদের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, "পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গের জীবিত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অগ্রণী। তিনি আমাদের সকলের গুরুস্থানীয়। সুতরাং তাঁহার মুখে প্রশংসা লাভ করিয়া আমি নিজের পরিশ্রম সফল মনে করি। কিন্তু আমার রচিত ইংরাজী 'আওরংজীবের ইতিহাসে' ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট পড়িলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি শুধু মুসলমান লেখকগণের উক্তির উপর নির্ভর করি নাই। প্রথমতঃ সমসাময়িক যে সমস্ত গ্রন্থ ও চিঠি ব্যবহার করিয়াছি তাহা ফার্সী ভাষায় লিখিত হইলেও তাহার অনেক লেখক হিন্দু। তদ্ভিন্ন হিন্দু রচিত আসামী, হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় বুরুঞ্জী, বখর ও কাব্যাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। যেসব সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকগণ তৎকালীন ভারতের ইতিহাসে সাক্ষী ছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্তও আমার কাজে লাগিয়াছে।"[১৯৮] ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটনের জন্য হরপ্রসাদ কত বিচিত্র তথ্য-উপাদান ব্যবহার করেছেন। রাজবৃত্তের ইতিহাসের বাইরে যে সমস্ত উপাদান ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে ব্যবহার করে জনবৃত্তের ইতিহাস দৃষ্টি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এটিই তাঁর ইতিহাস দর্শন। এ বিষয়ে যদুনাথ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধান যোগ্য — "শুধু রাজা রাজ্য পরিবর্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদে পদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিত হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না।"[১৯৯] হরপ্রসাদের ইতিহাস দৃষ্টিতেও রাজবৃত্ত অপেক্ষা জনবৃত্তের ইতিহাস বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজে মানুষের অবস্থান বুঝতে চেয়েছেন।

৬

হরপ্রসাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর স্বদেশ প্রীতি, কখনও কখনও বিদেশি শাসকদের প্রতি বিদ্বেষ, নিজ জাতির মূলানুসন্ধানের প্রয়াস, দেশীয় ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে গৌরবময় অতীতকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা— এ সমস্তের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এই স্বদেশানুরাগ তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টিকে শানিত করেছে।

হরপ্রসাদের বিশ্বাস "বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।[২০০] কারণ, প্রাচীন গৌরবময় দিনগুলি সম্পর্কে বাঙালির নিস্পৃহতা তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলার কীর্তির উদাহরণ তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রতিষ্ঠার কারণেই। ধর্মের ইতিহাস তিনি আলোচনা করেছেন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে। আর্যত্বের অহমিকায় তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়নি। এমন কি বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতমূলক ভাষা বলতেও তিনি নারাজ ।[২০১] তাঁর মতে, "সংস্কৃতকে বাংলার অতি-অতি-অতি-অতি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী"[২০২] বলে মনে হয়।

তিনি গোটা বাংলা জুড়ে যে বৌদ্ধ প্রভাব দেখেছেন তা উন্নত সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে। স্বদেশি তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়ে হরপ্রসাদ ''আত্মবিস্মৃত'' বাঙালির সামনে খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে অতীত গৌরবময় দিনগুলি পুথিপত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে উদ্ধার করে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস হিসেবে হাজির করেছেন।

আর-একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, হরপ্রসাদ বাঙালি বলতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ-জৈন-খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সকলকেই বুঝেছেন। কোনো সাম্প্রদায়িক ভাবধারার দ্বারা তিনি চালিত হন নি। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা প্রভাবিত রাজনীতি যখন বাংলাদেশে উত্তাল সেই সময়ে তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়তাবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সমসাময়িক সমাজ-অর্থনীতি সম্পর্কে সচেতন হরপ্রসাদ খাজনা, বাণিজ্য-কর, এক্সচেঞ্জ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও দেশীয় সমস্যাবলী উত্থাপন করে নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হরপ্রসাদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিস্তৃত। শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পিত নিগড় থেকে মুক্ত করে ইতিহাসের ধারাকে সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, লোকজীবনমুখী ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদেব দান অবশ্যই স্মরণীয়।

সূত্র নির্দেশ

১. Macaulay. T B., *Minutes on Education in India*. 2nd February, 1835

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (সুলভ সং) বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৭০৫।

৩. 'আমাদের ইতিহাস', হ-র-সং-৪ পৃ. ৩২৯।

৪. তদেব, পৃ. ৩২৭।

৫. *JASB* Vol. III, 1834, P. 488.

৬. Mill, James, 'Preface', *The History of British India*, Vol. I, London, 1817, P. XXIII.

৭. Bimala Prasad Mukherjee, 'History', A. C. Gupta (ed.) *Studies in Bengal Reniassance*, National Council of Education, Jadavpur, Calcutta, 1958, P.362.

৮. দ্র. *University of Calcutta Calender*, 1876.

৯. Haraprasad Shastri, 'King Chandra of the Meherauli Iron Pillar Inscription', *IA*. 1913, P. 217.

১০. *Progs ASB*, 1895, pp. 177-80.

১১. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1837. p. 1-18.

১২. Haraprasad Shastri, 'The Susunia Rock Inscription of Chandravarman', *EI*, Vol. XIII, No. 10, 1915-16, p.133.

১৩. Haraprasad Shastri, 'King Chandra of the Meherauli Iron Pillar Inscription', *IA* ,1913, p. 219.

১৪. Haraprasad Shastri,' Mandasore Inscription of the time of Naravarman, The Malava year 461', *EI*, Vol. XII, No. 35, 1913, p. 315-321.

১৫. তদেব,পৃ. ৩১৭।

১৬. Haraprasad Shastri, 'The Susunia Rock Inscription of Chandravarman', *EI* ,Vol III No. 10, 1915, p. 183.

১৭. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,' *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ২৪৬।

১৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাচীন বঙ্গের পুষ্করণা জনপদ', বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, কলকাতা. ১৯৯১, পৃ. ৪৪।

১৯. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪৬৮।

২০. Haraprasad Shastri, 'Seven Copper-plate Records of Land Grants from Dhenkanal', *JBORS*, Vol II, Part IV, 1916, p.1.

২১. তদেব, পৃ. ১১।

২২. Gait, Edward, 'The Annual Presidential Address', *JBORS*, Vol. III, Part I, 1917, p. 7.

২৩. Walsh, E. H. C., 'The Annual Address', *JBORS*, Vol. IV, Part I, 1918. p. 3.

২৪. Haraprasad Shastri, 'The Tejpur Rock Inscription', *JBORS*, Vol. III. Part IV, 1917, p 508.

২৫. তদেব, পৃ. ৫০৮।

২৬. তদেব, পৃ. ৫০৯।

২৭. তদেব, পৃ. ৫০৯।

২৮. Haraprasad Shastri, 'Tekkali Inscription of Madhyamaraja, the son of Petavyalloparaja' *JBORS*. Vol. IV, Part II, 1918, p. 163.

২৯. *JBORS*, Vol. VI, Part II, 1920, pp. 236-45.

৩০. তদেব, পৃ. ২৩৬-৩৭।

৩১. তদেব, পৃ. ২৪১।

৩২. তদেব, পৃ ২৪১।

৩৩. *তদেব*, পৃ. ২৪২।

৩৪. *তদেব*, পৃ. ২৪২।

৩৫. Haraprasad Shastri, ' A Copper-plate Grant of Visvarupa Sena of Bengal', *IHQ*. Vol. II, Calcutta 1926, p. 77.

৩৬. *তদেব*, পৃ. ৭৭।

৩৭. *তদেব*, পৃ. ৭৮।

৩৮. "বিশ্বরূপের মধ্যপাড়া শাসনের ভূমিখণ্ড সমূহ ১৩শ ও ১৪শ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হয়। এতে ১৪শ বৎসরের উত্থান দ্বাদশী তিথি অর্থাৎ কার্তিক মাসের উল্লেখ আছে। দানগ্রহীতা ছিলেন পণ্ডিত হলায়ুধ। অনেকগুলি দানের মধ্যে একটি রাজমাতার চন্দ্রগ্রহণ-দর্শন উপলক্ষে দেওয়া এবং তিনটি কুমার সূর্য সেন, কুমার পুরুষোত্তম সেন এবং সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্রীসিংহের প্রদত্ত এবং তাঁদের জায়গীব মধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত স্থানগুলি বঙ্গের নাব্য ও বিক্রমপুর-অঞ্চল এবং চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল।" দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল - সেন যুগের বংশানুরচিত*, কলকাতা. ১৯৮২, পৃ. ১৩৬।

৩৯. *Progs, ASB*, 1893, pp 24-26.

৪০. *Progs, ASB*, 1897, pp. 164-65.

৪১. *Progs, ASB,* 1890, pp. 166-68.

৪২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', *বঙ্গদর্শন*, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭।

৪৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *বঙ্গদর্শন*, অগ্রহায়ণ, ১২৮১।

৪৪. 'ভূমিকা', *হ-র-সং*-১, পৃ. ২৩।

৪৫. আমাদের ইতিহাস,, *হ-র-সং*-৪, পৃ. ৩২৭

৪৬. *হ র-সং*-৪, পৃ. ২৬৫।

৪৭. আমাদের ইতিহাস', *হ-র-সং*-৪, পৃ. ৩২৯।

৪৮. *তদেব*, পৃ. ৩২৯।

৪৯. *তদেব*, পৃ. ৩৩৫-৩৬।

৫০. *তদেব*, পৃ. ৩৩৬।

৫১. Annual Presidential Address (1919), *Progs. ASB*, 1920, p. XIV.

৫২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে লেখা Julius Jolly-র ১১ জানুয়ারি ১৯০২ তারিখের চিঠি। দ্র. *স্মারকগ্রন্থ* পৃ. ১৫।

৫৩. পার্সিভাল স্পিয়ার হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি অবস্থানের দীর্ঘ ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'the principle of repulsion' has been more obviously at work than the 'principle of attraction'. দ্র *India, Pakistan and the West*, London, 1985, P. 238.

৫৪. উভয় ধরনের কয়েকটি উদাহরণের জন্য দ্র. K. M. Panikkar, *A survey of Indian History*, Bombay, 1966, p. 168; R. C. Majumdar(ed), *History and Culture of the Indian People*, Bombay, 1960, Vol. VI, p. 617; Aziz Ahamed, *Studies in Islamic culture in the Indian Environment*, Karachi, 1970, P. 73.

৫৫. 'মুসলমানি বাংলা', হ-র-সং-২, পৃ. ৫৩৮।

৫৬. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১', *তদেব*, পৃ. ৩০৯।

৫৭. *Progs, ASB*, November, 1894.

৫৮. 'পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা', *হ-র-সং*-৪, পৃ. ২৬৭।

৫৯. *তদেব*, পৃ. ২৬৭।

৬০. *তদেব*, পৃ. ২৬৭।

৬১. *Progs, ASB*, March, 1900, P. 72.

৬২. *তদেব*, পৃ. ৭০-৭১

৬৩. 'পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা', *হ-র-সং*-৪, পৃ. ২৬৮।

৬৪. *Progs, ASB*, March 1900, p. 71.

৬৫. R. C. Majumdar, "Ideas of History in Sanskrit Literature", C.H. Phillips(ed), *Historians of India, Pakistan and Ceylone*, Oxford University Press 1961, p. 19.

৬৬. অবদানং রঘুপরিবৃঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োবেতৎ
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল বাল্মীকিঃ।।
'কবিপ্রশস্তি', *রামচরিত*।

৬৭. 'পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা', *হ-র-সং*-৪, পৃ. ২৬৯।

৬৮. *Progs, ASB*. March, 1900, p. 71.

৬৯. *তদেব*, পৃ. ৭২।

৭০. *তদেব*, পৃ. ৭২।

৭১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৫১৫

৭২. *Progs. ASB*, March, 1900, p. 72.

৭৩. *তদেব*, পৃ. ৭৩।

৭৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৫২৩।

৭৫. "তিব্বতে তেঙ্গুর নামে ২৫২ Volume বই আছে। ইহা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহের তিব্বতি ভাষায় তর্জমা, ইহাতে প্রায় ৩০০০ পুস্তকের তর্জমা আছে। তর্জমায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থকার কোন্ দেশের লোক তাহার নাম, তর্জমাকর্তার নাম প্রায়ই লেখা আছে। তর্জমাকর্তা প্রায়ই দুইজন থাকিতেন। একজন ভারতবর্ষীয় ও আর একজন তিব্বতীয়

ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বাঙালিই অধিক। এই তর্জমা সপ্তম শতাব্দীতে আরম্ভ হয় ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শেষ হয়।" হ-র-সং-২, পৃ. ২৭৯।

৭৬. লুই পাদ, লূয়ীপাদ, লূয়ীচরণ — একই ব্যক্তি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত *চর্যাপদের* প্রথম কবি। একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বাংলা দেশের বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত শাখা সহজানের অন্যতম সাধক। তিব্বতে আদি সিদ্ধাচার্য হিসাবে স্বীকৃতি এবং মৎস্যান্ত্রাদ, মৎসোদর, মচ্ছঘ্ননাথ নামে পরিচিত। দ্র. Sashı Bhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1946, pp. 41-45, 444-45 ; Benoyotosh Bhattacharya (ed.), *Sadhanamala*, Vol. II, Baroda, 1968, pp. XXXVIII - IX ; Benoytosh Bhattacharya, *An Introduction to Buddhist Esoterism*, Delhi, 1980, p. 69 ; R. C. Majumdar (ed.) *The History of Bengal*, Vol. I, Dacca, 1963, P. 337-51 ; সুকুমার সেন, 'ভূমিকা', *চর্যগীতি-পদাবলী*, বর্ধমান, ১৯৭৩।

৭৭. *তেঙ্গুরের* তালিকায় কৃষ্ণাচার্যের নাম আছে। অনেকের মতে কৃষ্ণাচার্য একাধিক ব্যক্তির নামও হতে পারে। হরপ্রসাদের *বৌদ্ধগান ও দোহায়* কৃষ্ণাচার্যের ১২ টি পদ আছে। ভণিতায় আছে কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নিলা প্রভৃতি। কৃষ্ণাচার্য *হেবজ্রতন্ত্র*-এর টীকা *যোগরত্নমালা নাম হেবজ্র পঞ্জিকা* লিখেছিলেন। দ্র. D. L. Snellgrove, *The Hevajra Tantra*, Part I & II London, Oriental Series : Vol. 6, London, 1959 ; Benoytosh Bhattacharyya, *The Indian Buddhist Iconography*, Calcutta, 1968, pp. 157-59.

৭৮. দারিক রচিত পদ *চর্যাগীতিতে* সংকলিত হয়েছে। তিনি নিজেকে লুইয়ের অনুগ্রহে সিদ্ধ বলেছেন। *তেঙ্গুরের* তালিকায় তাঁর এগারখানি বইয়ের উল্লেখ আছে। এগুলি হলো *কালচক্রতন্ত্ররাজস্য -সেকপ্রক্রিয়াবৃত্তি বজ্রপাদউদ্‌ঘাটিনীনাম, চক্রসম্বর-সাধনতত্ত্ব সংগ্রহনাম, যোগানুসারিনীনাম-বজ্রযোগিনীটীকা, ওড্ডিয়ান বিনির্গত মহাগুহ্যতত্ত্ব-উপদেশ, প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সাধন* প্রভৃতি। দ্র. Sashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1976, pp. 48-49.

৭৯. সবরপাদ চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম। তিনি শবরীপাদ এবং শবরীশ্বর নামেও পরিচিত। *তেঙ্গুর*-এর তালিকা থেকে জানা যায় *বজ্রযোগিনী-গণ-চক্রবিধি, বজ্রযোগিনী-সাধন, কুর্মপাদসিদ্ধি-সাধন* প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। *সাধনমালায়* তাঁর *সিতকুরুকুল্লাসাধন* এবং *বজ্রযোগিন্যারাধনবিধি* নামে দুটি রচনা আছে। সম্ভবত তিনি বজ্রযোগিনী উপাসনার প্রবর্তক। দ্র. Benoytosh Bhattacharyya (ed.) *Sadhanamala*, Vol. II, Baroda, 1968, p. CXIV ; সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, বর্ধমান, ১৯৭৩, পৃ. ২১-২২।

৮০. "মুখপাত", '*বেনের মেয়ে*', *হ-র-সং-১*, পৃ. ১৯৮।

৮১. 'সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং-২*, পৃ. ২৬৯।

৮২. 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৯ব. পৃ. ১৮।

৮৩. Kunwar Shivnath Sengar, ' Where did Prince Vijaya Come from ?', *IHQ*, Vol. III, No. 2, June, 1927, pp. 403-08.

৮৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪; নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।

৮৫. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, (আনন্দগোপাল ঘোষ ও মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত) মালদা ১৯৮৩, পৃ. ১১।

৮৬. *Imperial Gazetter of India*, Vol. IX, 1908, p. 92.

৮৭. Kaviraja Suryamalla, *Vamsa Bhaskara*, Jodhpur, 1899, p. 1262.

৮৮. Kunwar Sivanth Sengar, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৩ - ০৮।

৮৯. দ্র. 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ১৬৯-৭০।

৯০. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৯১. Kunwar Sivnath Sengar, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৮।

৯২. 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ১৫১-৫৯।

৯৩. 'আমাদের গৌরবের দুই সময়', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ৬।

৯৪. *তদেব*, পৃ. ৬।

৯৫. *তদেব*, পৃ. ১১।

৯৬. *তদেব*, পৃ. ১৫।

৯৭. দ্র. D. D. Kosambi, *An Introduction to the Study of Indian History*, Bombay, 1956 ; *The Culture and civilization of Ancient India in Historical outline*, New Delhi, 1970 ; R. C. Majumdar (ed.) *History and culture of the Indian people*, Vol. I-V, Bombay, 1951-66.

৯৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', *বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ*, প্রবন্ধ খণ্ড, কলকাতা ১৯৭৯ পৃ. ৩১।

৯৯. নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩০।

১০০. তদেব, পৃ. ৫০৩।

১০১. তদেব, পৃ. ৫০৩।

১০২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৩৮৯, পৃ. ২৫৪

১০৩. *Progs, ASB*, January 1902, pp. 3-7.

১০৪. *Progs, ASB*, July 1898, pp. 190-92.

১০৫. *Progs. ASB*, 1901, pp. 74-75.

১০৬. *Progs. ASB*, July 1898, p. 191.

১০৭. *তদেব*, পৃ. ১৯১।

১০৮. তদেব, পৃ. ১৯১।

১০৯. 'জয়দেব চরিত্র', হ-র-সং-৪, পৃ. ৫৪১।

১১০. Haraprasad Shastri, 'India in Lakshmana Sena's time from a rare manuscript written in his court', *Progs, ASB*, July, 1898, p. 192.

১১১. Haraprasad Shastri, ' On the authenticity of the two newly discovered Manuscripts of the Vallalacarita by Ananda Bhatta and their importance in traning the History of the caste sysem in Bengal, Part I, *Progs, ASB*, December 1901, p. 75.

১১২. তদেব, পৃ. ৭৫।

১১৩. দ্র. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'The Northern Buddhism', *IHQ*, March, June, September, 1925, নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি।

১১৪. হ-র-সং-৪ পৃ. ৩৭৭-৮৪।

১১৫. তদেব, পৃ. ৩৩৭-৮৪।

১১৬. তদেব, পৃ. ৩৭৭।

১১৭. 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূল সূত্র', হ-র-সং-৪, পৃ. ৩৮১।

১১৮. 'জাতিভেদ', তদেব, পৃ. ৮০।

১১৯. তদেব, পৃ. ৮০।

১২০. তদেব, পৃ. ৮০।

১২১. তদেব, পৃ. ৮১।

১২২. তদেব, পৃ. ৮১।

১২৩. তদেব, পৃ. ৮১।

১২৪. তদেব, পৃ. ৮২।

১২৫. 'ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস', তদেব. পৃ. ৩৭১।

১২৬. Haraprasad Shastri, *Lokayata and vratya*, (Introduction by Anil Kumar Bandyopadhyay, General Editor Satyajit Chaudhury), Haraprasad Shastri Gaveshana Kendra, Naihati, 1982, p. 32.

১২৭. তদেব, পৃ. ৬।

১২৮. 'ব্রাত্য', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *হরপ্রসাদ রচনাবলী*, প্রথম সম্ভার, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৪২৫-৩৩।

১২৯. তদেব, পৃ. ৪২৬।

১৩০. তদেব, পৃ. ৪২৬।

১৩১. *Lokayata and Vratya*, p. 20.

১৩২. 'ব্রাত্য', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৮।

১৩৩. তদেব, পৃ. ৪২৮।

১৩৪. *Lokayata and Vratya*, p. 40.

১৩৫. Debiprasad Chattopadhyay, *Lokayata : A study in Ancient Indian Materialism*, New Delhi, 1981, p. 168.

১৩৬. *তদেব*, পৃ. ১৬৯।

১৩৭. 'ব্রাত্য', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৯।

১৩৮. তদেব, পৃ. ৪৩০।

১৩৯. দ্র. Haraprasad Shastri, 'Presidential Address 1920', Asiatic Society of Bengal, *Progs ASB*, February 1921, pp. XXI - XXIV ; 'The Original Inhabitants of Magadha', *The Magadhan Literature*, Patna, 1923.

১৪০. 'ব্রাত্য', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৩।

১৪১. 'জাতিভেদ', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ৮৬।

১৪২. তদেব, পৃ. ৮৬।

১৪৩. তদেব, পৃ. ৮৭।

১৪৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Discovery of Living Buddhism in Bengal* পুস্তিকায়, 'রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল' (*সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, ১৩০৪) এবং অন্যান্য রচনায় ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরিত রূপ বলেছেন। "Buddhism in Bengal since the Muhammadan conquest' (*JASB*, 1895)-এ তিনি লিখেছেন, "... Dharma, a deity whom I ventured to identify with Buddhadeva." ধর্মপূজা পদ্ধতিতে বৌদ্ধ উপাদান স্বীকৃত। নিম্নবর্গের সংস্কৃতির একটি দিক ধর্মপূজার মধ্যে যে রয়েছে তা হরপ্রসাদেরই আবিষ্কার। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ('Buddhist Survivals in Bengal', *B. C. Law Commemoration Volume*, Part I, Calcutta, 1945), সুকুমার সেন (Is the cult of Dharma a living relic of Buddhism', *তদেব*), ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ('Dharma Worship', *JASB*, Vol. VIII, 1942) হরপ্রসাদের সঙ্গে এই তত্ত্বে পুরোপুরি এক মত নন।

১৪৫. 'জাতিভেদ', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ৮৮।

১৪৬. তদেব, পৃ. ৯১।

১৪৭. *তদেব* পৃ. ৯২-৯৩।

১৪৮. তদেব, পৃ. ৯৫।

১৪৯. 'ব্রাত্য', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৫।

১৫০. 'ভূমিকা', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ৫৩।

১৫১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *কাঞ্চনমালা*, কলকাতা, ১৩২২ ব.। এইটি হরপ্রসাদের প্রথম উপন্যাস সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে মাঘ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

১৫২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *বেনের মেয়ে*, কলকাতা, ১৩২৬ ব.। *বেনের মেয়ে* হরপ্রসাদের দ্বিতীয় এবং শেষ উপন্যাস। প্রথমে চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত *নারায়ণ* পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যা থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১৫৩. অশীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫।

১৫৪. হরপ্রসাদ তাঁর 'Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire' (*JASB*, NS. Vol, VI, No. 5, 1910) প্রবন্ধে সম্রাট অশোককে 'শূদ্র রাজা' হিসাবে অভিহিত করেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন মতও পোষণ করেন। দ্র. Hemchandra Ray Cahudhuri, ' The Later Mauryas and the Decline of their power', *Political History of India*, Calcutta, 1972, pp. 313-19.

১৫৫. Haraprasad Shastri, 'Cause of the Disemberment of the Maurya Empire', *JASB*, NS. Vol. VI, No. 5, 1910, p. 260.

১৫৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন বিষয়ের প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা উক্ত বিষয়ে ধারাবাহিক গবেষণা শুরু করেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর *Political History of India* গ্রন্থে হরপ্রসাদের অভিমতের বিরোধিতা করে বলেছেন, ".. if the Brahmana historian of Kasmira is to be belived, the relation between Jalauka, one of the sons and ancestors of Asoka, and the Brahmanical Hindus were entirely friendly." (p. 319). এবং পুষ্যমিত্র শুঙ্গকেও তিনি মনে করেন নি "as the leaders of a militant Brahmanism." (p. 319). কিন্তু নীহাররঞ্জন রায় হরপ্রসাদ ও হেমচন্দ্রের মতামতের আলোচনা করে বলেছেন, "The humanism and benevolence of Asoka were hardly any against the evils such a centralised and autho ritarian government tended to foster. There can be no doubt that the government and its administration weighed heavily on the subjects and they resented it." (দ্র. Nihar Ranjan Ray, *Maurya and Sunga* Art, Calcutta, 1945, p 64). । রোমিলা থাপার মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে দ্বিধা বিভক্ত সাম্রাজ্য ; রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাকে কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। "The organisation of administration, and the conception of the state on the nation, were of great significance in the cause of the decline of the Maurya." (দ্র. Romila Thapar, *Asoka and The Decline of The Mauryas*, Oxford University Press, 1961, p. 207).

১৫৭. *JASB*, NS. Vol. VIII, 1912, pp. 287-88.

১৫৮. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, 'মুখবন্ধ', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *হরপ্রসাদ রচনাবলী*, দ্বিতীয় সম্ভার, কলকাতা, ১৩৬৬ ব.।

১৫৯. R. C. Majumdar (ed.) *History of Bengal*, Vol. I, Dacca, 1963 pp. 199- 204.

১৬০. *তদেব*, R. C. Majumder (ed), pp. 202-03, 320-23 ; Monomohan Chakravarti, Bhatta Bhavadeva of Bengal', *JASB*, Sept. 1912, pp. 333-47 ; "Remarks on the Foregoing paper by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri', *তদেব*, pp. 347-48.

১৬১. 'প্রাসঙ্গিক তথ্য', *হ-র-সং-১*, পৃ. ৩৯২।

১৬২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩২৩ ব.।

১৬৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩০।

১৬৪. *Progs. ASB*, 1893, pp. 20-24.

১৬৫. *তদেব*, ১৮৯২, পৃ. ১৯৩-৯৭।

১৬৬. *তদেব*, ১৮৯৩, পৃ. ২০।

১৬৭. *তদেব*, ১৮৯৩, পৃ. ২৩।

১৬৮. *তদেব*, ১৮৯৩, পৃ. ২৪।

১৬৯. 'Notes on the bank of the Hugli in 1495', *তদেব*, ১৮৯২, পৃ. ১৯৩।

১৭০. *তদেব*, ১৮৯২, পৃ. ১৯৫।

১৭১. *তদেব* ১৮৯২, পৃ. ১৯৫।

১৭২. *তদেব*, ১৮৯২, পৃ. ১৯৭।

১৭৩. *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮৫, পৃ. ১৩৭-৩৯।

১৭৪. *তদেব*, পৃ. ২৮-৪১।

১৭৫. *নবভারত*, কার্তিক, ১২৯০, পৃ. ২৫৬ - ৬১।

১৭৬. *বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন*, অষ্টম অধিবেশনের *কার্য্য বিবরণ*, বর্ধমান, ১৩২১।

১৭৭. 'একজন বাঙালি গবর্নরের অদ্ভুত বীরত্ব', *হ-র-সং-১*, পৃ. ৪৮২।

১৭৮. *তদেব*, পৃ. ৪৮৫।

১৭৯. Seid - Gholam - Hossein - Khan, *The Seir Mutaqherin or Review o Modern Times being an History of India*, English edition, Vol. II, Calcutta, 1902.

১৮০. 'সমাজের পরিবর্ত কয়রূপ', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ২৯-৩৯।

১৮১. দ্র. B. Chowdhury, ' Political History, 1757-1772', and N. K. Sinha, 'Political History, 1772-93' in Narendrakrishna Sinha (ed) *The History of Bengal* (1757-1905), University of Calcutta, 1967 ; Narendra K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. I, Calcutta, 1956 ; Sushil Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization in Bengal*, 1650-1720, Calcutta, 1975 ; Radwan, Ann Boss, *The Dutch in Western India* 1601-1632, Calcutta, 1978.

১৮২. দ্র. রাধারমণ মিত্র, *কলিকাতা দর্পণ*, কলকাতা, ১৯৮০ ; Pradip Sinha, *Calcutta in Urban History*, Calcutta, 1978 ; Cotton, H. E. A., *Calcutta Old and New*, Calcutta, 1907.

১৮৩. 'কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে', *হ-র-সং-৪*, পৃ ৬৭।

১৮৪. তদেব, পৃ. ৬৭।

১৮৫. Jadunath Sarkar (ed.) *History of Bengal,* Vol. II, Dacca, 1972, p. 392.

১৮৬. 'হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা', হ-র-সং-৪, পৃ. ২২৫।

১৮৭. তদেব, পৃ. ২২৬।

১৮৮. তদেব, পৃ. ২২৬।

১৮৯. তদেব, পৃ. ২২৬।

১৯০. Haraprasad Shastri, *Discovery of Living Buddhism in Bengal,* Calcutta, 1897, p. 7.

১৯১. Haraprasad Shastri (ed.), *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts to the Govt. collection under the care of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. III, 1925. p. 183.

১৯২. এ বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *Report of the Tour in Western India in Search of Mss. of Bardic* Chronicles (1909) এবং Preliminary report on the operation in Search of Mss. of Bardic Chronicles (1913) দ্রষ্টব্য। চারণদের গানে সমসাময়িক অনেক কাহিনি বিধৃত হয়েছে। ঐ সমস্ত গান থেকে মুঘলদের সঙ্গে রাজপুতদের সম্পর্কের কথাও জানা যায়।

১৯৩. 'হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ২২৭।

১৯৪. তদেব, পৃ. ২২৭।

১৯৫. তদেব, পৃ. ২২৭।

১৯৬. তদেব পৃ. ২৩২।

১৯৭. তদেব, পৃ. ২২৫।

১৯৮. *অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্য বিবরণ*, বর্ধমান, ১৩২১, পৃ. (৮)।

১৯৯. তদেব, পৃ. (৮)।

২০০. 'সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং-২*, পৃ. ২৬৪।

২০১. তদেব, পৃ. ২৭৬।

২০২. 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৩৬৭।

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সারা জীবন বৌদ্ধবিদ্যার অনুশীলন করেছেন। এই অনুশীলন ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই তিনি সামাজিক ইতিহাসের নানা দিক উন্মোচন করেছেন। তাঁর প্রাথমিক ইতিহাস-দৃষ্টি গড়ে উঠেছিল বঙ্কিম-রাজকৃষ্ণের সংস্পর্শে। হরপ্রসাদের বৌদ্ধ-বিদ্যার প্রতি প্রথম আগ্রহ জন্মেছিল হয়ত রামদাস সেনের রচনা থেকে। রামদাস সমসাময়িক পৃথিবীর পণ্ডিতদের বৌদ্ধবিদ্যা অনুশীলন সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন।[১] তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "বৌদ্ধ আচার্য্য প্রণীত অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ আছে ; কিন্তু আমাদিগের আর্য্য-শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটক এবং *সর্ব্বদর্শন* সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের কোন কোন বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক, *ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* এবং কিয়দংশ *কুসুমাঞ্জলি* পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধসূত্র সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না।"[২]

সে সময় বৌদ্ধবিদ্যার অনুশীলনে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ অগ্রণী ছিলেন। বৌদ্ধ-বিদ্যা সম্পর্কে নতুন ভাবনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হচ্ছিল। এর মূল কারণ, "নেপাল হইতে অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।"[৩] রামদাস সেন *বঙ্গদর্শন*-এ বৌদ্ধ-বিদ্যা সম্পর্কে আরও প্রবন্ধ লিখেছেন।[৪] তাঁর বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে সামাজিক ইতিহাসের অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা যাবে। হরপ্রসাদ বৌদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ"[৫] লেখেন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকাতেই।

এই সময়েই হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে আসেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নির্দেশে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করলে রাজেন্দ্রলাল তাঁকে উপনিষদ অনুবাদের ভার দেন। কিন্তু তাঁর অনুবাদ রাজেন্দ্রলালকে খুশি করতে পারে নি।[৬] পরে আবার তিনি হরপ্রসাদকে অন্য কাজের দায়িত্ব দেন, "নেপাল হইতে যে বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথিগুলি সোসাইটিতে আনিয়া স্তূপাকার হইয়াছিল মিত্র মহাশয় তাহার একটা ক্যাটালগ প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত পণ্ডিতেরা পুঁথিগুলির summary করিয়া দিত, সেই সকল summary ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার ভার পড়িল আমার উপর।"[৭] রাজেন্দ্রলালের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন কাজ করার পর হরপ্রসাদ লখনউ ক্যানিং কলেজে ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে যান। কিন্তু ১৮৭৯-র অক্টোবর মাসে ফিরে আসেন। এই একবছর অধ্যাপনা করার পর তিনি আবার রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। ১৮৮২-তে রাজেন্দ্রলালের *দি স্যানস্ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব নেপাল* প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় আছে, তিনি

হরপ্রসাদের সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[৮] এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই হরপ্রসাদের বৌদ্ধ তথা প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় অভিষেক।

হরপ্রসাদ যখন রাজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে আসেন তখন রাজেন্দ্রলাল ভারতবিদ্যার প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসেডিংস, জর্নাল এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর নানা বিষয়ের রচনা ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া অনেকগুলি বইও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর চর্চার বিষয়গুলির মধ্যে প্রত্নদর্শন, মুদ্রা, শিলালিপি, শিল্প-সাহিত্য, প্রাচীন পুথির বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা উল্লেখযোগ্য। এই চর্চার মধ্য থেকেই তাঁর ইতিহাস বোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। *বঙ্গদর্শনে* হরপ্রসাদের যে ইতিহাস-দৃষ্টি তৈরি হয়েছিল রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস-বোধের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ছিল না। রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস-চর্চার একটি ধারা তৈরি হয়েছিল ব্রায়ান হটন হজসনের নেপাল থেকে সংগৃহীত সংস্কৃত বৌদ্ধ- পুথি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁর এ কাজের সহায়ক এবং সঙ্গী। পরবর্তীকালে এই পথেই হরপ্রসাদের বৌদ্ধবিদ্যা অনুশীলন পল্লবিত ও ফলপ্রসু হয়ে উঠেছিল। তিনি মূলত উদীচ্য বৌদ্ধধর্মেরই চর্চা এবং অনুসন্ধান করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত। ইতোপূর্বে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে বৌদ্ধধর্মের এই শাখাটি অপরিচিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগীজদের দ্বারা বাহিত হয়ে ইয়োরোপে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত যে সংবাদ পৌঁছেছিল তা দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম। ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা তথা দক্ষিণ এশিয়া ছিল দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম-চর্চার কেন্দ্র। উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ দক্ষিণী বৌদ্ধবিদ্যার চর্চাই করেছেন। দক্ষিণী বৌদ্ধরা থেরবাদী। অপর শাখা উদীচ্য বৌদ্ধরা মহাযানী। থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে বিবাদ অনেকদিনের। থেরবাদী বৌদ্ধরা সংস্কার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন রীতি-নীতি আঁকড়ে থাকার পক্ষপাতী। কুষাণ যুগে কঠোর নিয়ম-নীতি কিছুটা শিথিল হয়ে যায়। ঠিক হয় ভিক্ষু অথবা গৃহী যে কেউ 'পারমিতা' অনুষ্ঠান করে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারবে। এই নতুন মতাদর্শ মহাসাঙ্ঘিকগণ প্রচার করেন। এই মতাদর্শে বিশ্বাসীরা মহাযানী। নাগার্জুন এই মতের ব্যাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করেন। কণিষ্ক আহুত বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশনে বৌদ্ধধর্ম থেরবাদ বা হীনযান এবং মহাযান এই দুটি শাখায় স্পষ্টতই ভাগ হয়ে যায়। সমাজ জীবন থেরবাদী কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, কিন্তু মহাযানীদের ভূমিকা ছিল অন্য রকম, অর্থাৎ কিছুটা উদারধর্মী। উদীচ্য মহাযানী বৌদ্ধরা সমাজ জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।[৯]

এক সময় বাংলা তথা গোটা পূর্ব ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের উত্থান এবং আক্রমণে বৌদ্ধরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। মানুষের মনভূমিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে। বাঙালির নানা আচার-আচরণের

মধ্যে যে বৌদ্ধ অবশেষ রয়ে গেল তাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম।[১০] কিন্তু যেখানে, অর্থাৎ এই বাংলায়, বৌদ্ধধর্মের প্লাবন দেখা গিয়েছিল, সেখান থেকে তা লুপ্ত হয়ে গেল কেন— এই প্রশ্ন পণ্ডিতদের ভাবিয়েছে।[১১]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুজন পশ্চিমী পণ্ডিত— আলেকজান্ডার চোমা দ্য কোরস [১২] এবং ব্রায়ান হটন হজসন [১৩] বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। চোমার কর্মক্ষেত্র তিব্বত, হজসনের নেপাল। দু'জনে একই সময়ে তিব্বত-নেপালে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। প্রকাশিত হয়েছে লুপ্তপ্রায় উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অনেক তথ্য।

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে চোমা দ্য কোরস নিজ পূর্ব-পুরুষের বাসভূমির সন্ধানে হাঙ্গেরি থেকে যাত্রা শুরু করেন। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে অবশেষে তিনি হিমালয়ে এসে পৌঁছান। সেখানে একজন ভ্রাম্যমাণ ইংরেজ অনুসন্ধানী মুরক্রফ্‌টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মুরক্রফ্‌ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি তৈরির উপায় নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি চোমাকে ফাদার গিয়র্গির লেখা *Alphabetum Tibetanum* (1762) উপহার দেন। চোমা একজন তিব্বতি লামার কাছে তিব্বতি ভাষা শেখেন।

চোমার *তেঙ্গুর* ও *কেঙ্গুর* আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তিব্বতি বৌদ্ধ সাহিত্যের দ্বার উন্মোচিত হলো। প্রকাশ পেল উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের বহু তথ্য। এক সময় বাংলা তথা পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্মের যে প্লাবন দেখা দিয়েছিল তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান এবং ইসলামের আগমনে মিলিয়ে গেল ; এমন-কি বহু পুথিপত্রও হারিয়ে গেল।[১৪] ফলে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম অজানা থেকে গিয়েছিল। কিন্তু *তেঙ্গুর* ও *কেঙ্গুর*-এর আবিষ্কার বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে ।

চোমা যখন তিব্বতে *তেঙ্গুর-কেঙ্গুর* নিয়ে কাজ করছেন, ঠিক সেই সময় ব্রিটিশ রেসিডেন্ট হজ্‌সন নেপালে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত। একই বিষয়ের চর্চাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। চোমার জীবনীকার থিয়োডোর দুকার বইতে [১৫] উদ্ধৃত দুটি চিঠি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ৩০ ডিসেম্বর ১৮২৯-এ লেখা চিঠি থেকে তিব্বতি আকরগ্রন্থ এবং সেকালের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ২৯ এপ্রিল ১৮৩০-এ চোমা কাজ করতে গিয়ে যে অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছেন সে কথা হজসনকে লিখেছেন, "I Know not how to write Sanskrit and Tibetan words in Roman character,"[১৬] কারণ তিনি লিখেছিলেন "unacquainted with the Sanskrit"[১৭] এবং ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর দক্ষতার অভাব ছিল।

তিব্বতে ভারতীয় তান্ত্রিক দেবীর উপাসনা শুরু হয়েছিল আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী থেকে। এর মূলে হয়ত রাজা স্রং-সান গাম্পোর নেপালি স্ত্রী। অষ্টম শতাব্দীতে অনেক ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ শাস্ত্র

রক্ষিত রাজার গুরু হয়েছিলেন। আরও একজন গুরু ছিলেন রিম্পোছি, যাঁর আসল নাম পদ্মসম্ভব। ইনি তিব্বতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম মোঙ্গলদেরও প্রভাবিত করেছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। পদ্মসম্ভব বজ্রযান মতবাদ চালু করার সময় অনেক ভারতীয় তান্ত্রিক পুথি তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিতেরা, যাঁরা তিব্বতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম বা মহাযান মতবাদের বিভিন্ন প্রশাখা— বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান— তিব্বতি তান্ত্রিক বৌদ্ধমতবাদকে প্রভাবিত করেছিল। পদ্মসম্ভবের পরবর্তীকালে অতীশ দীপঙ্করশ্রী জ্ঞান 'প্রজ্ঞাপারমিতা'-নির্ভর মতবাদ গড়ে তোলেন। '*হঠযোগ*' মতবাদ অস্বীকার করেন।[১৮]

তিব্বতি বৌদ্ধ-সাহিত্য বুঝতে হলে তিব্বতি ভাষা যেমন জানা দরকার তেমনি প্রয়োজন সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান। বস্তুত পক্ষে উত্তর-পূর্ব ভারতের ধর্ম ও সমাজের অনেক অজানা তথ্য তিব্বতি সাহিত্য থেকে জানা গেছে। জানা গেছে নেপালে রক্ষিত পুথিপত্র থেকেও। এ ব্যাপারে হজসনের কৃতিত্ব স্মরণীয়। চোমা ২৯ এপ্রিল ১৮৩০-র চিঠিতে হজসনকে লিখেছিলেন, নেপাল এবং তিব্বতে একই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের চর্চা হয়েছিল দেখে তিনি তৃপ্ত।[১৯]

ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম গিয়েছিল। তিব্বতে কয়েক শ' খণ্ড বইতে বৌদ্ধ মতবাদ ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত বই কতটা সংস্কৃতের মূলানুগ তা প্রমাণ করা সহজ সাধ্য নয়। এ জন্য সংস্কৃত ও তিব্বতি ভাষায় সমান দক্ষতার প্রয়োজন (দ্র. থিয়োডোর দুকা, পৃ. ১১০)। চোমা এই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ১৮২৩ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত তিনি *কেঙ্গুর-তেঙ্গুরের* অনুবাদ ও পাঠ পর্যালোচনা করেন। এই বৃহৎ কর্মকাণ্ড *এশিয়াটিক রিসার্চেস*-এ (ভলুম-২০, কলকাতা, ১৮৩৬-৩৯) প্রকাশিত হয়।[২০] তিনি তিব্বত থেকে অনেক পুথি নিয়ে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৮৩৭ সালে চলে আসেন।

হজসন আবিষ্কৃত নতুন তথ্যের মধ্যে বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ক অজানা একটি ধারার আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বৌদ্ধদের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বই লক্ষ করেছেন। সেই তথ্য দিয়ে তাঁরা বৌদ্ধদের ইতিহাস উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড়ো করে নাই; করিয়াছেন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইয়োরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান।"[২১] কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের আবিষ্কারের ফলে চলতি ধারণায় ফাটল দেখা দিল, বৌদ্ধদের ইতিহাস নতুন করে লেখার দরকার হয়ে পড়ল। এই খোঁজ "হজসন সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্মে পাইলেন। তিনি দেখিলেন বৌদ্ধদের অনেক দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর।"[২২] এই দর্শনের সঙ্গে দক্ষিণী ধর্মমত বা দর্শনের মিল নেই। ফলে এই ধর্মীয় মতাদর্শ উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম হিসেবে চিহ্নিত হলো। উদীচ্য বৌদ্ধধর্মই মহাযান বৌদ্ধধর্ম।

হজসনের বৌদ্ধপুথি আবিষ্কারের আগেও নেপালে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব অজানা ছিল না। মৌর্য-সম্রাট অশোকের সময় থেকেই সেখানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। তাঁর ধর্মপ্রচারকরা সেখানে নিয়মিত যেতেন। ধর্মপ্রচার করতেন। এবং তা "...is strongly confirmed by the fact that Nipal have been time immemorial, attributed to Asoka as their founder."[২৩] বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম নেপালের মানুষজনের মধ্যে প্রোথিত হয়েছিল। এবং তা স্থায়িত্ব পেয়েছিল। এই প্রোথিত ধর্মের অনেকগুলি ভাগ এবং ভিন্নতা সমাজে বড়ো ছাপ ফেলেছিল। গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বছরের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের দুটি শাখা— হীনযান ও মহাযানের উৎপত্তি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, ''আগে কিন্তু দুটি যান ছিল— ১. প্রত্যেক বুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর ২. শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেক বুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ... বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম শ্রাবক।''[২৪] কিন্তু বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির সময় ভাবটা অন্য রকম হয়— স্থবিরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক। স্থবিরবাদ বা থেরবাদ ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রসার লাভ করে। ভিত্তি পালি ভাষায় লেখা *ত্রিপিটক*। এটিই দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, মহাসাঙ্ঘিকরাই মহাযানপন্থী হয়ে গেল।[২৫] *মহাবস্তু অবদান*-এর নির্দেশনা মেনে চলত মহাসাঙ্ঘিকেরা। তা ছাড়া *ললিতবিস্তর*, *অবদানশতক*, *সদ্ধর্মপুণ্ডরীক*, *দিব্যাবদান*, *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা* প্রভৃতি মিশ্র সংস্কৃতে[২৬] লেখা বইগুলিতে মহাযানী বিশ্বাসের নিবিষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। থেরবাদী বা হীনযানীরা ধর্মীয় আচারে খুব রক্ষণশীল ছিল। অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলত। বিশেষ করে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন মূর্তি পুজো তারা এড়িয়ে চলত। কিন্তু গোড়া থেকে মহাযানীরা রক্ষণশীলতার পথে যায় নি। বৌদ্ধধর্মের এই শাখা যেমন হিন্দু আচার দ্বারা প্রভাবিত হয় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আঞ্চলিক ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতিগুলিকে মহাযানীরা আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলে। নানা রকমের মূর্তির উপাসনা, তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান পালন বৌদ্ধদের মধ্যে আবার পরিবর্তনের স্রোত বয়ে নিয়ে এল। মহাযান থেকে সৃষ্টি হল সহজযান বজ্রযান প্রভৃতি। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্ মধ্যযুগীয় সমাজে বৌদ্ধদের এই সমস্ত শাখা-প্রশাখা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল এবং তা ক্রমান্বয়ে নেপাল-তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ে।

নেপালের মহাযানী বৌদ্ধদের বিশ্বাস, ধর্মের দুটি ভাগ—১. দেবভাজু, ২ গুভাজু। দেবভাজুরা ঈশ্বরের উপাসনা করে। গুভাজুদের উপাস্য গুরু। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজুতে বিশ্বাসী, অপর পক্ষে বৌদ্ধরা গুভাজুতে।[২৭] সুতরাং নেপালে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ফারাক অনেকটা বেশি কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, নেপালে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বৌদ্ধমঠগুলি তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হারাচ্ছিল। ফলে বৌদ্ধধর্ম অধঃপাতে যায়, বিকৃতিতে আচ্ছন্ন হয়, দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। ধর্মের নৈতিক দিকটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বস্ত হয়। কিন্তু তত্ত্বগত দিক থেকে ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে।[২৮] বস্তুতপক্ষে, নেপালের বৌদ্ধরা মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় চেতনার পথ থেকে সরে আসে। হিন্দুয়ানী বৌদ্ধদের আত্মভূত

করে। এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দুরা নেপালী সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। নেপালের একটি মিশ্র জাতি "derived from Indian and Tibetan stocks"[২৯] কিন্তু "mixture of Hindu with Buddhist principles became almost necessary feature of their religion."[৩০] অনেক হিন্দু দেশান্তরী নেপাল ভ্রমণে গিয়ে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। তারা নেপালের আদিবাসীদের সঙ্গে অন্তর্বিবাহে আবদ্ধ হয়।[৩১] কিন্তু, বস্তুতপক্ষে, তারা হিন্দুত্বেই বিশ্বাসী থেকে যায়।[৩২] মোটকথা, নেপালি সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধে মেশামেশি হয়ে এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই হজসন নেপাল থেকে আবিষ্কার করলেন সংস্কৃত, তিব্বতি এবং নেওয়ারিতে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি। এই সমস্ত পাণ্ডুলিপি বৌদ্ধধর্ম পাঠের ক্ষেত্রে একটা বড়োসড়ো পরিবর্তন নিয়ে এল। পরিবর্তিত এই বৌদ্ধধর্মই উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম হিসেবে পরিচিত। ফরাসি পণ্ডিত ইউজিন বর্নুফ *দ্য হিস্ট্রি অব বুদ্ধিজ্‌ম* নামে একটি বই লিখেছিলেন, তাতে তিনি *এশিয়াটিক রিসার্চেস*-এ প্রকাশিত হজসনের 'নোটিসেস্ অব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, লিটারেচার অ্যান্ড রিলিজিয়ন অব দ্য বুদ্ধস্ অব নেপাল অ্যান্ড ভোট' প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে এই প্রবন্ধ বৌদ্ধদর্শন পাঠে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে বিষয়টি একেবারেই নতুন।

বর্নুফের মতে, হজসনের আবিষ্কারগুলি নেপালে এতদিন সম্পূর্ণই অজানা ছিল বৌদ্ধদের মূল ভাষা সংস্কৃতে লেখা বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অস্তিত্ব এখানে ছিল।[৩৩] এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে হজসন আঠারোটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নানা ধরনের জ্ঞানপ্রদ তথ্যে পরিপূর্ণ। যিনি হজসনের প্রবন্ধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েন নি তিনি নিখুঁতভাবে বৌদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে এখনও কিছুই লিখতে পারবেন না।[৩৪] উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই হজসনের দ্বারস্থ হতে হয়।

হজসন নেপাল থেকে যে সমস্ত সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছেন তা থেকে তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ শুধুমাত্র পালিতে লেখা হয় নি, সংস্কৃতেও লেখা হয়েছে। কোরস মন্তব্য করেছিলেন, "Mr. Hodgson's illustrations of the literature and origin of the Buddhists from a wonderful combination of knowledge on a new subject with the deepest philosophical speculation, and will astonish the people of Europe."[৩৫] আধুনিক গবেষকদের হাতে সেই সমস্ত বৌদ্ধপুথির পাণ্ডুলিপি তিনি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের জন্য তুলে দিয়েছিলেন।[৩৬] সেজন্য তিনি স্বেচ্ছায় পুথিগুলি পাঠিয়েছিলেন বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটিতে, গ্রেটব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের এশিয়াটিক সোসাইটিতে, অক্সফোর্ড বডলিয়ন লাইব্রেরিতে, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এবং পারির সোসাইতে আশিয়াতিক-এ। তাঁর নিপুণ নজরে আসা বৌদ্ধধর্মের নতুন নতুন বিষয়গুলি নিয়ে তিনি *দ্য জর্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*-এ অনেকগুলি

প্রবন্ধ লেখেন। *এশিয়াটিক রিসার্চেস*-এ তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি[৩৭] প্রকাশিত হলে এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক হোরেস হেম্যান উইলসন লিখেছিলেন, "... of the number and character of those works with are the authorities of the Buddhas of Nepal, the only description on which any reliance can be placed in contained in the preceeding communication, from Mr. Hodgson, to whose active and intelligent zeal the society is so largely indebted."[৩৮] কিন্তু নেপালের মানুষ-জনের কাছ থেকে পুথি সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। হজসনের মতে, ইয়োরোপীয়রা নেপাল সরকারের সন্দেহভাজন ছিল, তাই নেপালে সঞ্চিত জ্ঞান তাদের কাছে উন্মুক্ত করতে যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল।[৩৯]

তবু হজসন নানা ফিকিরে যে পরিমাণ পুথি সংগ্রহ করেছিলেন, তা কম নয়। এই পুথিগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের থেকে যে অভিমত বেরিয়ে আসে তাকে তিনি শেষ কথা বলে দাবি করেন নি কখনো। তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত অনেক গবেষক পণ্ডিত্রের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আরও নতুন অনুসন্ধানের জন্য।[৪০] ফলে সেগুলি নতুন নতুন ভাবনায় আলোকিত হয়ে উঠেছে।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে হজসন পারিতে ১৪৭টি পুথি পাঠিয়েছিলেন। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বর্নুফ, যিনি নিজেকে হজসনের কাছে অশেষ ঋণী মনে করতেন, সেই সমাহৃত পুথি থেকে গড়ে তুললেন "great work on the History of Buddhism."[৪১] 'অতি বিশিষ্ট বন্ধু'[৪২] হজসনের নেপাল থেকে সংগ্রহ করা পুথির উপর নির্ভর করে বর্নুফ উদীচ্য বৌদ্ধধর্মতত্ত্বটি গড়ে তোলেন। হজসনের এই যুগান্তকারী কাজের জন্য পারির সোসাইতে আশিয়াতিক তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে।

নেপাল থেকে হজসনের সংগ্রহ করা সংস্কৃত পুথিগুলির একটি তালিকা তৈরি করেন স্যার উইলিয়ম উইলসন হান্টার। এই পুথিগুলি ছিল মূলত উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত। পুথিগুলির অবস্থা সম্পর্কে হান্টারের লেখা থেকে জানা যায়: নেপালের শুষ্ক আবহাওয়ায় পুরানো দলিলগুলি রক্ষা পেয়েছিল। নেপাল মুসলমান আক্রমণকারীদের চোখের আড়ালে থাকায় পুথিপত্র তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ভারতের বহু প্রাচীন সাহিত্য ভাণ্ডার মুসলমান আক্রমণকারীর হাতে ধ্বংস হয়। তা ছাড়া নেপালি পুথিগুলি টেকসই তিব্বতি কাগজে লেখা, কিন্তু ভারতীয় তালপাতা-পুথি ভঙ্গুর। নেপালে শিক্ষার অবক্ষয়ের কালেও প্রাচীন পাণ্ডিত্যের স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে বহু নেপালি পুথি বিস্মৃত এবং অপঠিত হয়েও রক্ষা পেয়েছে।[৪৩] এও প্রমাণিত যে, হজসনের আবিষ্কৃত পুথিগুলি একাদশ শতাব্দীর আগের লেখা।

বাংলায় মুসলমান আগমনের আগে পূর্বভারত জুড়ে উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের খুব প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ক্রমশ বৌদ্ধদের গ্রাস করে।[৪৪] বৌদ্ধদের অবস্থা খুবই সঙ্গিন হয়ে পড়ে এবং বাংলা থেকে তারা প্রত্যক্ষভাবে ক্রমশ মুছে যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'নর্দার্ন বুদ্ধিজম' প্রবন্ধে সমাজ এবং ধর্মীয় বিবর্তনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

করেছেন।[৪৫] কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু হরপ্রসাদ অন্য কথা বলেন। তাঁর মতে মুসলমানদের বিজয় আংশিক, পাঠানরা সামরিক ক্ষমতার দ্বারা কিছু অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে মাত্র। তাদের পক্ষে গোটা দেশের বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না।[৪৬] মুসলমান শাসকদের কাছে হিন্দু ও বৌদ্ধে কোন তফাত ছিল না। তাদের দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ই ছিল সমান। সুতরাং হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়কেই সমান দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। কিন্তু একসময় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ সিসিল বেন্ডাল হরপ্রাসাদ শাস্ত্রীকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন : "Where was all that Buddhism gone ?"[৪৭] উভয়ে একসঙ্গে নেপাল গেছেন। নেপাল ও তিব্বতি পুথি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ থেকে আহৃত ফল এবং হজসনের আবিষ্কৃত পুথিগুলি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম নেপালে আশ্রয় নিয়েছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম নেপালে ভুঁই-ফোঁড় নয়। বেন্ডাল কেম্‌ব্রিজে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি সেখানে বসে একদা হজসনের পাঠানো এবং কেমব্রিজে সংরক্ষিত বিপুল সংখ্যক পুরানো পুথি দেখেছেন এবং ক্যাটালগ প্রস্তুত করেছেন।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে *দি জর্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি*-তে হজসন 'ইয়োরোপীয়ান স্পেকুলেশান্‌স অন বুদ্ধিজ্‌ম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের আলোড়িত করেছিলেন। এই প্রবন্ধই গতানুগতিক বৌদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে বড়ো রকমের পরিবর্তন আনে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে *তেঙ্গুর-কেঙ্গুর*-এর মতো উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কথা। বুদ্ধের বাণী এবং ভারতীয় ও তিব্বতীয় পণ্ডিতদের তাত্ত্বিক রচনার সংকলন *তেঙ্গুর-কেঙ্গুর* বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে নতুন আলোকপাত করেছে। এর মধ্য দিয়ে নেপাল ও তিব্বতের উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হজসন সংগ্রহ পরীক্ষা করেন। এই সংগ্রহ ব্যবহার করে তিনি লিখলেন *দি স্যান্‌সক্রিট লিটারেচার অব নেপাল* (১৮৮২ খ্রি.)। রাজেন্দ্রলালের মতে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।[৪৮] এই কাজটি তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে করেন। নেপাল থেকে হজসন *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা*-র পুথি আবিষ্কার করেন। রাজেন্দ্রলাল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে পুথিটি সম্পাদনা করেন। তাঁর মতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।[৪৯] ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে দি *এশিয়াটিক রিসার্চেস*-এ প্রকাশিত রচনায় হজসন *প্রজ্ঞাপারমিতার* অর্থ বিশ্লেষণ করেন।

চোমা দ্য কোরস এবং হজসন ছাড়াও ড্যানিয়েল রাইটস, সিসিল বেন্ডাল এবং অন্যান্য পণ্ডিতেরা নেপাল ও তিব্বত থেকে মূল্যবান পুথি এবং নানান চিহ্নাদি আবিষ্কার করেন। তাঁদের অনুসন্ধান এটাই প্রমাণ করে যে, উত্তর-পূর্ব ভারত, বিশেষ করে বাংলায় সংস্কৃত নির্ভর বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের দার্শনিকদিকও উল্লিখিত অঞ্চলের সমাজ জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

হজসনের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা, বিশেষ করে নেপালের বৌদ্ধপুথি পাঠ ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে নতুন ভাবনার জোয়ার এনেছিল। এবং তাঁর আবিষ্কার ভারত ও নেপালের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লুপ্ত ইতিহাস রচনায় সহায়ক হয়েছে।[৫৫] নেপালের বিভিন্ন মন্দিরের মূর্তির সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৌদ্ধমূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন।[৫১] মূর্তিগুলি মিলিয়ে দেখার সময় বৌদ্ধপুথি ব্যবহার করে তিনি বুঝতে চেয়েছেন ঐগুলির প্রকৃত অর্থ। হজসনের অনুসন্ধান আমাদের জানিয়ে দেয় যে, নেপালে তান্ত্রিক আচারের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। গড়ে উঠেছিল গূঢ় রহস্যময় সাধন ভাবনা।

কোরস এবং হজসনের প্রচেষ্টায় উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিপুল সংখ্যক পুথি আবিষ্কৃত হল। দেখা গেল, তিব্বতি ও নেপালি পুথির উৎসও সেই সংস্কৃত পুথি। অথচ আগে ধারণা ছিল, বৌদ্ধ পুথির ভাষা মূলত পালি। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুথিগুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক পৃথক।"[৫২] তা ছাড়া পুথিগুলি অনেক সময় মিশ্রভাষায় লেখা হতো, "উহার কতক সংস্কৃত কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণ স্বরূপ পদ্য। পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরানো। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ 'মহাভাষ্যে'র ভাষা নয়। কোনো প্রাকৃতের তর্জমা মাত্র।... নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম।"[৫৩] অনেক বৌদ্ধ দার্শনিক ভালো সংস্কৃত লিখলেও তাঁদের ভাষা নিয়ে কখনো কখনো প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, অনেকে "অবুৎপন্ন শব্দ অশুদ্ধ শব্দ" লিখতেন। ফলে "তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা ব্রাহ্মণদের মতো সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল।"[৫৪] অর্থাৎ, পালি ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ পুথি লেখা হতো। সেই পুথিই মূলত উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম মতের ধারক-বাহক।

কিন্তু থেরবাদী বা হীনযানী বৌদ্ধধর্মের চর্চাই প্রথম শুরু হয়েছিল। এই চর্চার মূলে ছিল রীজ্ ডেভিডসের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা পালি টেক্সট সোসাইটি। কারণ, এই সংগঠন প্রকাশিত থেরবাদী পুথিগুলি থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম চর্চার সহায়ক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সংস্কৃত মহাযানী পুথি আবিষ্কারের পর বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। হজসনের সংগ্রহ নিয়ে দেশে-বিদেশে মহাযান বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত হলো। ইউজিন বর্নুফ ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ভাষায় *Introduction l'Histoire du Bouddhisme Indien* প্রকাশ করেন। এর ইংরেজি অনুবাদ *Legends of Indian Buddhism* প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। তিনি *সদ্ধর্মপুণ্ডরীক*-এরও অনুবাদ (১৮৫২) করেন। মহাযান বৌদ্ধতত্ত্ব বুঝতে এই বইটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ড্যানিয়েল রাইট্স নেপালের মন্দির থেকে ফেলে দেওয়া অনেক পুথি সংগ্রহ করে সেগুলিকে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[৫৫] তেমনি উল্লেখযোগ্য

হজসনের 'ইয়োরোপীয়ান স্পেকুলেশন্‌স অন্‌ বুদ্ধিজ্‌ম' এবং 'এস্যেস্‌ অন্‌ দ্য ল্যাংগুয়েজেস্‌, লিটারেচার অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন অব নেপাল অ্যাণ্ড টিবেট' প্রভৃতি রচনাবলী। সিসিল বেন্ডাল হজসন সংগৃহীত নেপাল পুথির ক্যাটালগ তৈরি করেছেন কেমব্রিজে বসে — *ক্যাটালগ অব দ্য বুদ্ধিস্ট স্যান্‌স্‌ক্রিট ম্যানাস্‌ক্রিপ্টস্‌ ইন দ্য ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, কেমব্রিজ* (১৮৮৩)। আবার কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হজসনের নেপাল পুথি নিয়ে কাজ করলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। প্রকাশিত হল *দি স্যানস্‌ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব নেপাল* (১৮৮২)। এই কাজের সঙ্গে হরপ্রসাদের সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘদিন ধরে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে কাজ করে তিনি পুথি নিয়ে কাজ করতে পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়।

তাই রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর (১৮৯১) পর খুবই সঙ্গত কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এশিয়াটিক সোসাইটি 'দি অপারেশন্‌স ইন্‌ সার্চ অব স্যান্‌স্‌ক্রিট ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট'-এর ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করে। বলা বাহুল্য, এই সময় থেকেই হরপ্রসাদ স্বাধীনভাবে পুথিপত্র নিয়ে কাজ-কর্ম করতে থাকেন। এক সময় হজসন নেপাল থেকে সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্য উদ্ধার করেছিলেন। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদও পুথির সন্ধানে নেপাল যান এবং দরবার লাইব্রেরির পুথিগুলি পরীক্ষা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে তিনি লেখেন, 'নোট্‌স অন পাম-লিফ ম্যানাস্‌ক্রিপ্টস ইন দ্য লাইব্রেরি অব এইচ. ই. দ্য মহারাজা অব নেপাল'। এর পর তিনি নেপালের তালপাতার ও অন্যান্য পুথির তালিকা তৈরি করেন— *ক্যাটালগ অব পাম্‌-লিফ অ্যান্ড সিলেক্‌টেড পেপার ম্যানাস্‌ক্রিপ্টস্‌ বিলঙ্গিং টু দ্য দরবার লাইব্রেরি, নেপাল*। উদীচ্য মহাযানী বৌদ্ধ বিদ্যার যে উৎস হজসন কর্তৃক সংগৃহীত তা পরবর্তীকালে সিসিল বেন্ডাল এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ক্রমান্বয়ে খোঁজ চালিয়ে গেছেন। ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেন্ডালের সঙ্গে পুথির সন্ধানে নেপালে যান। এর পরেও তিনি নেপালে গেছেন ইতিহাসের উৎস সন্ধানে। ১৯০৭ সালেই হরপ্রসাদ যুগান্তকারী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া নেপালের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর এবং দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। পাশ্চাত্যদেশীয় ভারততত্ত্বান্বেষী এবং হরপ্রসাদের প্রচেষ্টায় অনেক অজানা তথ্য উদঘাটিত হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত নেপাল-তিব্বতে রক্ষিত আকর নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে নেপালের ভূমিকা অনস্বীকার্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার' প্রবন্ধে লিখেছেন, "ভারতবর্ষের সকল লোক জানিত না সত্য কিন্তু হিমানীবেষ্টিত শিখরাবলী পরিবৃত নেপাল রাজ্যে অনেকেই বৌদ্ধ এবং তাহারা গ্রন্থাবলীর আদর জানুক আর নাই জানুক বৌদ্ধগ্রন্থগুলিকে তাহারা বিশেষ যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়াছিল সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল জগৎকে সেই সংবাদ প্রচার করিবার জন্যই যেন নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ মঠগুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া আপন বক্ষঃস্থলে জরাজীর্ণ তালপত্র লিখিত গ্রন্থগুলি ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, যেন উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহারা এই রত্নগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল।"[৫৬]

সেই "রত্নগুলি" হজসন, ড্যানিয়েল রাইট, সিসিল বেন্ডাল, সিলভ্যাঁ লেভি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ভারততত্ত্বান্বেষীগণ আবিষ্কার এবং সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলি হয়ে উঠেছে ইতিহাস রচনার উপাদান। ১৮৯৭ সালে নেপালে পুথি সংগ্রহ দেখে হরপ্রসাদ মন্তব্য করেছিলেন যে, এটিই প্রাচীন ভারতবর্ষ বা আর্যাবর্তের একমাত্র অঞ্চল যেখানে বৌদ্ধধর্ম এখনো একটি সজীব ধর্ম, যদিও তেমন ব্যাপক নয়। কিন্তু এখানকার টিকে থাকা বৌদ্ধধর্ম তিব্বত, সিংহল এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম থেকে আলাদা। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের পাণ্ডুলিপি নেপালে পাওয়া গেছে। কয়েক বান্ডিল প্রাপ্ত পুথির মধ্যে দশটিরও বেশি সম্পূর্ণ পুথি। দরবার লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারী ২০০ তালপাতার পুথির হিসেব দিয়েছেন যেগুলি প্রাচীন। নেওয়ারি, কুটিল, নাগরি এবং বাংলায় এগুলি লেখা হয়েছে।[৫৭] তা ছাড়া তিনি বারবার নেপাল গেছেন, পুথির সন্ধান করেছেন, পরীক্ষা করেছেন ; এবং "নেপালের ভিন্ন ভিন্ন বিহারে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির মূর্ত্তি সংরক্ষিত ছিল তিনি সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে আলোচনা করিবার জন্য তাহাদিগের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন।"[৫৮] এইভাবে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম এবং সেই বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি সম্পর্কে হরপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের ক্ষেত্রটি পাকাপাকিভাবে তৈরি হয় সন্দেহ নেই। এই ক্ষেত্র প্রস্তুতের পর্বপর্বান্তরে হজসন-কোরস থেকে হরপ্রসাদ যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন তারই ফলশ্রুতি দেখি পরবর্তীকালের সামাজিক ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষায়।

প্রসঙ্গত হরপ্রসাদের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রচনা 'দি নর্দার্ন বুদ্ধিজম্'-এর নাম এখানে করতেই হয়।[৫৯] উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব এবং এর নানা দিক সম্পর্কে এই রচনায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁর উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম-চর্চা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে নেপাল যাত্রার সুযোগ পাওয়ায় তিনি ভাবলেন পুথিতে উল্লিখিত স্থানগুলি শনাক্ত করবেন। কিন্তু দরবার লাইব্রেরিতে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। কাঠমাণ্ডুতে ছড়ানো পুথিগুলি প্রধান মন্ত্রী স্যার বীর সামসের জং রানা লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করছিলেন। ফলে হরপ্রসাদ এই তথ্যখনির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন। অপর পক্ষে তিনি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পান। ইন্দ্রনাথ তাঁকে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।[৬০] নেপাল থেকে সংগৃহীত পুথির শুধু তালিকা প্রস্তুত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* (১৮৮৮-৯৭), *বৃহৎস্বয়ম্ভুপুরাণ* (১৮৯৪-১৯০০), *চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ* (১৮৯৮), *বৌদ্ধন্যায়শাস্ত্রের পুথি* (১৯১০), *সৌন্দরনন্দ* (১৯১০), *চতুঃশতিকা* (১৯১৪), *অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ* (১৯২৭) প্রভৃতি পুথি সম্পাদনা এবং অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এগুলি উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের আকরগ্রন্থ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের পুথিপত্র, আকরগ্রন্থাদি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, "... পূর্বভারতের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তাহার পূর্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরাই বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন।.... পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। ...

বাংলা ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছিল।"[৬১] কিন্তু সঙ্গত কারণেই হরপ্রসাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে: "এ বৌদ্ধ সাহিত্য গেল কোথায়?"[৬২] এই বৌদ্ধ সাহিত্য হিন্দু গ্রাস করেছে। বিশাল বৌদ্ধসমাজও হিন্দু গ্রাস করেছে। এই সমস্ত বৌদ্ধ সাহিত্য নেপাল-তিব্বতে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল। সেখান থেকেই পরবর্তীকালে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। আর হরপ্রসাদ বৌদ্ধসমাজের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির অবশেষ বাংলায় প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন *ডিসকভারি অব লিভিং বুদ্ধিজম ইন্ বেঙ্গল* (১৮৯৭)। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রভাবের ফলে বৌদ্ধদের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়েছিল, তার উপর ছিল পূর্বভারতে মুসলমান আক্রমণ : ফলে "মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধ-মন্দিরের ও বৌদ্ধদর্শনের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গেল।"[৬৩] বৌদ্ধদের আধিপত্য নষ্ট হল। "বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল,"[৬৪] বাকি যারা বৌদ্ধ ছিল হিন্দুরা তাদের "অনাচরণীয়"[৬৫] করে দেয় এবং "মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল।"[৬৬] তা সত্ত্বেও, হরপ্রসাদের মতে, বৌদ্ধধর্মের অবশেষ ধর্ম পুজোতেই রক্ষা পেল। এই ধর্ম কী? ধর্মের অনুগামী ও বুদ্ধের অনুগামীরা একইভাবে বিশ্বাস করে যে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে 'নাস্তি' থেকে। দেখা গেছে ধর্মের মূর্তি ও চৈত্যের বুদ্ধমূর্তির সর্বদ্রষ্টা চোখগুলি স্পষ্ট। বৌদ্ধদের কাছে 'ধর্ম' শব্দটি নতুন নয়। বৌদ্ধ 'ত্রিত্ব'তে ধর্মের ধারণা স্বচ্ছ। নেপালি চৈত্যগুলিতে বিভিন্ন পদাধিকারী ধ্যানী বুদ্ধরা পূজিত হন। এতে কোনো বিস্ময়ের কারণ নেই যে, কয়েক শতাব্দী ধরে অজ্ঞ বৌদ্ধভক্তরা সংঘ ও বুদ্ধকে বাদ দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্ম পুজোয় নিজেদের নিয়োজিত করেছে। বৌদ্ধরা ধর্মপূজক হিসেবে পরিচিত হলো কী কারণে সে ব্যাপারে আর-একটি যুক্তি আছে। তারা তাদের ধর্মকে সদ্ধর্ম বা ধর্ম বলত। নিজেদের 'সদ্ধর্ম-চিন্তকঃ' বলত। বিরাট সংখ্যক বৌদ্ধ নিহত হলে নিম্ন শ্রেণীর বৌদ্ধরা সাক্ষর ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পন্ন হয়ে বিভিন্ন থাকে (grade) হিন্দুতে পরিণত হয়। অজ্ঞ ব্যাক্তিরা উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে নতুনকে গ্রহণ করে।[৬৭] নেপালে বৌদ্ধধর্মের কী পরিণতি হয়েছিল তা দেখেই হরপ্রসাদ বাংলার ধর্মঠাকুর-ধর্মপুজোই যে বৌদ্ধদের শেষ অস্তিত্ব সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। ধর্মপুজোর মধ্যে তিনি "living Buddhism" দেখেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালের গবেষণায় হরপ্রসাদের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সমর্থিত হয়নি। কিন্তু তাতে যে কিছু বৌদ্ধ উপাদান আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক পরিচয়ও পাওয়া যায় এর থেকে। আর শুধু 'ধর্ম' কেন, সামাজিক নানা আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি প্রভৃতির মধ্যে হরপ্রসাদ বৌদ্ধ অবশেষ খুঁজেছেন।

'ধর্ম' পুজোয় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত নয়। হিন্দুত্বের নিয়মাবলী সেখানে বিরল। পুজোপদ্ধতিতে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ্য রীতি গৃহীত হলেও তা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর

আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুকূল। "ধর্মঠাকুরের পুরোহিত কোথাও কৈবর্ত, কোথাও দুলে, কোথাও বাগ্‌দি, কোথাও আগুরি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ডোম বা পোদ।" [৬৮] শুধু তাই নয়, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে কোনো ব্রাহ্মণের নাম নেই। কায়স্থের প্রাধান্যও নেই। হরপ্রসাদের মতে, "যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইল যে ধর্মপুজো বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ। বৌদ্ধরা তো আপনাদিগকে কখনো বৌদ্ধ বলিত না, তাহারা আপন ধর্মকে সদ্ধর্ম বা ধর্ম বলিত। সেই ধর্ম নামটাই বজায় রহিয়াছে।" [৬৯] শুধুমাত্র ধর্মঠাকুরেই বৌদ্ধধর্মের অবশেষ বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন না। "উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ।" [৭০] সেখানে 'সরাকি' জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। 'সরাকি' 'শ্রাবক' থেকে উদ্ভূত বলে হরপ্রসাদ মনে করেন। [৭১] ওড়িশায় বহুদিন ধরেই বৌদ্ধধর্মের চর্চা হয়েছে। অশোকের সময়ের অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গেছে। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে সেখানে বজ্রযানের চর্চা শুরু হয়। ওড়িশার রাজা ইন্দ্রভূতি নিজেই বজ্রবারাহির পুজো করতেন এবং তিনি বজ্রযান বিষয়ে অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। "উড়িষ্যা, বাংলা, মগধ, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁহার [ইন্দ্রভূতি] মতের খুব আদর ছিল। তাঁহার এক মেয়ে ছিলেন, নাম লক্ষ্মীংকরা। তিনি বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুস্তকেরই তিব্বতি ভাষায় তর্জমা আছে এবং তিব্বতি লোকে আদর করিয়া পড়ে।" [৭২] এক সময়ে পূর্বভারত থেকে বহু বৌদ্ধপুথি তিব্বত ও নেপালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেগুলি ঐ সমস্ত অঞ্চলে রক্ষা পেয়েছিল। ওড়িশা থেকে বৌদ্ধধর্মের অবসানের পিছনে হিন্দুরাজাদের পক্ষপাতিত্ব অনেকটাই দায়ী। "প্রতাপ রুদ্রের সময় ১৫০০ হইতে ১৫৩৩ পর্যন্ত বৌদ্ধদিগের উপর উড়িষ্যায় অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল।" [৭৩] নিরুপায় বৌদ্ধরা বৈষ্ণব সেজে থাকতেন। কালক্রমে বৌদ্ধদের মধ্যে নানা পন্থা গৃহীত হয়। সেখানে মহিমা ধর্মের মতো ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। "এ ধর্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল আছে।" [৭৪] নগেন্দ্রনাথ বসু ওড়িশার বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ধর্মগীতিগুলি তাঁকে খুবই আগ্রহী করে তুলেছিল। টেক্সটগুলিতে তিনি মহাযান মতবাদের ইঙ্গিত দেখলেন। অল্পদিন পর কয়েকজন বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা পাল রাজাদের নিয়ে গান গাইছিলেন। তাঁর মতে ঐ সময়েও ওড়িশায় বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। [৭৫] নগেন্দ্র নাথ বসুর ওড়িশার বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে মতামতের সঙ্গে হরপ্রসাদের মতের মিল লক্ষ করা যায়। তা হলো, বাংলা-বিহার-ওড়িশা-আসাম অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে এক সময় বৌদ্ধধর্মের দাপট ছিল, পরে তা প্রচ্ছন্নভাবে টিকে যায়। এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্মের অনুসন্ধান হরপ্রসাদ করেছেন তাঁর সারা জীবনের বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়ে।

নারায়ণ-এর ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধধর্ম কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?' প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃত প্রভাবের কথা লিখেছেন। চট্টোগ্রাম, রাঙামাটি, আরাকান, ওড়িশার গড়জাত মহলে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। "বৌদ্ধেরা এই সকল মহলে অনেকদিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন।" [৭৬] হরপ্রসাদের মতে

"মহিমাপন্থ"[৭৭] এবং "ধর্মঠাকুর" পুজোর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে। মহিমা গোঁসাই ওড়িশার কেওনঝর অঞ্চলে দীর্ঘ তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর মতে, ধর্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্মীয় আচার ও মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিল লক্ষ্যণীয়। তাই অনেকে এটিকে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। আর ধর্মঠাকুর সম্পর্কে হরপ্রসাদের নিজস্ব একটি তত্ত্ব আছে। "বৌদ্ধরা তো আপনাদিগকে কখনো বৌদ্ধ বলিত না, তাহারা আপন ধর্মকে সদ্ধর্ম বা ধর্ম বলিত। সেই ধর্ম নামটাই বজায় রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের উপাস্য বস্তু তিনটি বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ। সংঘ অর্থে সন্ন্যাসী দল। কালে বুদ্ধদেব লোপ পাইয়াছেন। ধর্ম বজায় আছেন। পাকা বারোমেসে সন্ন্যাসীর দল লোপ পাইয়াছে। গাজনি সন্ন্যাসির দল হইয়াছে।"[৭৮]

ধর্মঠাকুরের উপাসনা পদ্ধতিতে হরপ্রসাদ "লুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম"[৭৯] দেখেছেন। রমাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরকে "ললিত অবতার" বলেছেন। "ললিতবিস্তরের ললিত আর ললিত অবতারের ললিত একই অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া বোধ হয়।"[৮০] শুধু তাই নয়, প্রজ্ঞাপারমিতার শূন্যতা ও মহাশূন্যতার বিচার বা নির্বাণলাভে শূন্যতাপ্রাপ্তির কথা— এ সমস্তই বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক আলোচনা এবং বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত বিষয়। তাই হরপ্রসাদ ধর্মঠাকুরের শূন্যমূর্তি লক্ষ করে বলেছেন, "আমাদের ধর্মঠাকুর নিজেই শূন্যমূর্তি ও শূন্য হইতেই সৃষ্টি করেন। সুতরাং আমাদের ধর্মপূজার ব্যাপার যেরূপেই পরীক্ষা করিয়া দেখি, ঘুরিয়া ফিরিয়া বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ বলিয়া বোধ হয়।"[৮১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই অভিমত সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ বঙ্গাব্দে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁর অভিমত সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত না হলেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় নি। হরপ্রসাদ যে ধর্মঠাকুরের মধ্যে বৌদ্ধ অবশেষ দেখেছেন তা তাঁর অন্যান্য গবেষণাধর্মী রচনাতেও ছড়িয়ে আছে। *ডিসকভারি অব লিভিং বুদ্ধিজ্‌ম ইন বেঙ্গল*, 'ডিসকভারি অব দ্য রেম্‌ন্যান্টস্ অব বুদ্ধিজ্‌ম ইন বেঙ্গল', *শ্রীধর্মমঙ্গল: এ ডিস্ট্যান্ট ইকো অব দ্য ললিতবিস্তর* প্রভৃতি রচনায় হরপ্রসাদের ধর্মঠাকুর ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

"মহিমাপন্থ" বা "ধর্মঠাকুর" ছাড়াও দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতি ও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বৌদ্ধ আচার-রীতি-নীতি হরপ্রসাদ লক্ষ করেছেন এবং তা তাঁর বিভিন্ন রচনাতে উল্লিখিত হয়েছে।

"এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরো বিস্তার হইয়াছিল।"[৮২] নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার এবং কী হাল হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের দেশে তেমন চর্চা হয়নি। "মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বৌদ্ধধর্মের নামও শুনেন নাই।"[৮৩] অথচ তাঁদের সময়ও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাঁরা বৌদ্ধধর্ম যে একটা আলাদা ধর্ম তা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু হিন্দু, এমন কি বৌদ্ধগণও বৌদ্ধদের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন নি। "বৌদ্ধদের

ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা ... করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান।"[৮৪] চীন-জাপান-তিব্বত-সিংহল-ভারতবর্ষের মধ্যে পার্থক্য অনেকটাই। আবার ভারতবর্ষে আচরিত বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও তফাত লক্ষ্যণীয়। দক্ষিণী এবং উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। সিংহলি বা পালি বৌদ্ধগণ মনে করেন, সংসারত্যাগী এবং 'বিহার'-বাসীগণই খাঁটি বৌদ্ধ। "গৃহস্থ বৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে রাজি নহেন।" [৮৫] পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে "প্রাণীহিংসা করিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করে" [৮৬] এমন অনেকগুলি জাতিই বৌদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু দক্ষিণী বৌদ্ধ অর্থাৎ "পঞ্চশীল" [৮৭] মত অনুযায়ী " জেলে, মালা, কৈবর্ত, শিকারী, ব্যাধ, খেট, খেটক প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের অধিকার একেবারেই থাকে না।"[৮৮] দেখা যাচ্ছে, "মহাযান মতে তাহা হইলে জীবমাত্রেই বৌদ্ধ।" [৮৯] শুভাকর গুপ্ত তাঁর *আদিকর্ম্ম রচনা* বইতে বলেছেন যে, যে "ত্রিশরণ গমন করিয়াছে সেই বৌদ্ধ।"[৯০] মহাযানীদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম থেকে গৃহস্থের ধর্মে রূপান্তরিত হলো। শ্রাবক যানের গুরু এবং মহাযানের গুরুর মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রাবকযানে স্থবির বা থেরা নানা প্রশ্ন করে সন্তুষ্ট হলে সংঘের অন্যান্যদের অনুমতি নিয়ে নবিশকে সংঘে প্রবেশাধিকার দিতেন। শিক্ষানবিশ শ্রমণেরা উপাধ্যায়কে মান্য করে চলত। "মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে 'কল্যাণমিত্র' বলিত।"[৯১] গুরু-শিষ্য উভয়ে উভয়ের কল্যাণ কামনা করত। কিন্তু মন্ত্রযানে "গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটাআঁটি হইয়া গেল।"[৯২] গৃহস্থ শিষ্যগণ গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করতেন, এবং গুরুকে মান্য করে চলতেন। শ্রাবকযান এবং মহাযানের গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম-সম্পর্ক বজায় ছিল, কিন্তু "মন্ত্রযানের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড়ো ও একজন ছোটো হইয়া গেল।"[৯৩] বজ্রযানের গুরু শিষ্যদের কাছে আরও বড়ো হয়ে উঠলেন। তিনি " দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন।"[৯৪] সহজযানে গুরুর উপদেশের উপর আর কিছুই নেই। আর কালচক্রযানে গুরু "স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর-কেহ নহেন।"[৯৫] তিব্বতের লামাযানে লামা "সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।"[৯৬] সেই লামাযান ক্রমে দলাইলামাযানে পরিণত হয়। "দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার।"[৯৭] এইভাবে বৌদ্ধধর্ম শ্রাবকযান থেকে মহাযান এবং মহাযান থেকে পরবর্তীকালে অন্যান্য যানে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং গুরু প্রবল হয়ে ওঠেন। গোড়া থেকে বৌদ্ধধর্ম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, ক্রমাগত রূপান্তরই তার ইতিহাস। আর বৌদ্ধধর্মে গুরুর প্রাধান্য "হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে।"[৯৮]

এই সমস্ত যানের মূলে বৌদ্ধধর্ম। সেই বৌদ্ধধর্মর উৎপত্তি এবং ধর্ম গড়ে ওঠার মূল ভিত্তি কী সে সম্পর্কে *নারায়ণ* (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২১ ব.)-এ প্রকাশিত 'কোথা হইতে আসিল?' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ গভীর এবং বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই ধর্মে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি কতটা, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মে মিল-অমিল, বন্ধুতা-শত্রুতা এসমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার

এবং প্রাধান্য দমন করার জন্যই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, তা আর্যদেবের *চতুঃশতিকা* থেকে প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ আর্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত। *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ আছে "বঙ্গ বগধ-চেরজাতি পক্ষীবিশেষ; উহাদের ধর্ম নাই, উহারা নরকগামী হইবে।"[৯৯] এই প্রচার আর্যদের, কারণ আর্যরা পূর্বভারতে বসতি বিস্তার করতে পারে নি। "বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখির দেশেই জন্মান।"[১০০] এবং পূর্বাঞ্চলে অনেকগুলি ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল। "পশ্চিমাঞ্চলে যখন আর্যগণ যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল করিতে ব্যস্ত"[১০১] সেই সময় পূর্বাঞ্চলে "তীর্থংকরের পর তীর্থংকর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে সুখে থাকা যায় তাহারই উপায় দেখিতেছিলেন।" [১০২] সুতরাং আর্য বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অনার্যগণের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ব্যবধান যে ছিলই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্বাঞ্চলে প্রচারিত ধর্মগুলি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি ধর্ম ছিল। "বুদ্ধদেবের সময় ছয়টি ধর্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম, যথা, আজীবক — ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম, নির্গ্রন্থ — ইহা মহাবীরের ধর্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্ম প্রবর্তক, অজিত কেশ-কম্বল, সঙ্গয় একজন ও পোকুদ কত্তায়ন একজন।"[১০৩] পূর্বাঞ্চলের মানুষ শুধু যে ধর্মাচরণ করে দিনাতিপাত করতেন তা নয়, তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, বিদ্যাচর্চা করতেন। "অস্ত্র চিকিৎসা পূর্বাঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। হস্তিশাস্ত্র এই দেশেই রচিত হয়। ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও পূর্ব-ভারতে" [১০৪] কিন্তু আর্যদের আক্রমণে এই সুসভ্য অঞ্চলটির "সমাজ আচার ব্যবহার ভাঙিয়া তাহাদিগকে আর্যসভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ" [১০৫] চলতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের একটা নিজস্বতা ছিল। কারণ, এই ধর্ম "আর্যধর্ম হইতে আসিল এ কথা বলা যায় না।" [১০৬] এর উত্থান ও প্রতিষ্ঠা প্রথমত ভারতের পূর্বাঞ্চলেই। পরে ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের সাংগঠনিক শৃংখলার মূলে বুদ্ধদেব স্বয়ং। "তিনি [বুদ্ধদেব] রাজার ছেলে, রাজা হইবার সব শিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশজনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালানো তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসংঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার যে সব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন ... তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।"[১০৭] এই ধর্মীয় সাংগঠনিক শৃংখলা আর্যধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। বৌদ্ধধর্মকে একটি সামাজিক সংগঠন বলেই মনে হয়। ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণের সঙ্গে সামাজিক কর্তব্য এবং কর্মের সাযুজ্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। গোটা বঙ্গ সমাজকে জড়িয়ে বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়েছিল। তাই সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখা গেছে। কিভাবে "দেশটা বৌদ্ধধর্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল"[১০৮] তা হরপ্রসাদের একটি বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। "বাংলাদেশে তখন [সপ্তম শতাব্দী] এক লক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন সংঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন।... ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিন বাড়িতে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বাড়িতে যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। আবার একবার যে বাড়িতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, এক মাসের

ভিতরে সে বাড়িতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাঁহাদের নিয়ম ছিল। সুতরাং একটি যতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্তত একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাকা চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্তত এক কোটি বৌদ্ধ গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই—"[১০৯] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য বা অন্যান্য ধর্মের প্রাদুর্ভাব বঙ্গসমাজে হলেও বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা যে পিছিয়ে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই বৌদ্ধধর্মেরই একটি শাখা মহাযান বৌদ্ধধর্ম বাংলা তথা পূর্বভারতে প্রসার লাভ করে। কিন্তু মহাযান ধর্ম ক্রমশ অন্যান্য যানে রূপান্তরিত হয়েছে। আর্যদের সমাজে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় রীতি-নীতি চর্চা মানার জন্য সহজ যানের সৃষ্টি হয়েছে। মহাযানীদের জন্য নাগার্জুনের শিষ্য খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে *চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ* লিখেছিলেন। এই *চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন।[১১০] চরিত্র-বিশুদ্ধিতে মহাযানীদের মহত্ত্ব যে কত উচ্চে তা এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। কিন্তু "সহজযানে সেই চরিত্র বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম 'নেড়ানেড়ি'র দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় গান লিখিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলো-আঁধারি ভাষা। কানে শুনিবা মাত্র একরকম অর্থবোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন।"[১১১] বৌদ্ধদের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রবলভাবে দেখা দিল। এর প্রভাব সমাজের মানুষকেও নাড়া দিল। বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত শুরু হল। কৃষ্ণমিশ্র একাদশ শতাব্দীতে *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নামে একটি নাটকে অধঃপতিত বৌদ্ধদের নানা কেচ্ছাকাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা "খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত।"[১১২]

তন্ত্র-মন্ত্র পূজা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করল। বৌদ্ধরা তারাদেবীর পূজা শুরু করল। "যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্তি লইয়া বৌদ্ধধর্ম চলিতে লাগিল।"[১১৩] ক্রমে ক্রমে গুহ্য সাধনাই তাদের কাছে গুরুত্ব পেতে থাকে। ফলে গুহ্যতন্ত্রের উপর অনেক গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছিল। "প্রয়োগ পদ্ধতিপ্রকরণ"[১১৪] এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ টীকা-টিপ্পনীগুলি অশ্লীল;[১১৫] আর "... ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে।"[১১৬] সেখানে দেখা গেল বৌদ্ধধর্মের মূল ক্ষেত্র থেকে সরে এসে বৌদ্ধতন্ত্র বা তন্ত্রযানের প্রতি একদল সাধকের আস্থা ও বিশ্বাস ক্রমশই বাড়াতে থাকে। তারা "ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপুতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল— সঙ্গে সঙ্গে দেশশুদ্ধ অধঃপাতে দিল।[১১৭] এই অধঃপাতের একেবারে মূলে গৃহস্থ ভিক্ষুর সৃষ্টি, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর অবাধ মেলা-মেশা, বিহার ও সংঘগুলির পবিত্রতা নষ্ট করা এবং ভিক্ষুদের বিবাহ প্রথা মেনে নেওয়া। "এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই

ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল।"[১১৮] পাশাপাশি গৃহী নয় এমন আসল ভিক্ষুদের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। গৃহস্থাশ্রমের সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি অবশ্য হীন হয়ে পড়ছিল, কারণ, তাদের ধর্মীয় আচার ও রীতি-নীতি সমাজকে অধঃপতনের দিকেই ঠেলে দিচ্ছিল। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্বাহ করিত — ভিক্ষাও করিত— কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রি হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত — অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্মও করিত, পূজা-পাঠও করিত। বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল।"[১১৯] ফলে বৌদ্ধদের মধ্যে লেখাপড়া, বুদ্ধিচর্চা এবং ভাবনা-চিন্তা করার যে খ্যাতি ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। সমাজ-সংস্কৃতিতে বৌদ্ধদের পরিশীলিত অবদান আর থাকে না। " বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যটা মুর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল।"[১২০]

বাংলায় বৌদ্ধদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। পাল রাজাদের পতনের ফলে বৌদ্ধরা আরও অসহায় হয়ে পড়ল। রাজসম্মান বা রাজ-প্রতিপালনের উপায় আর রইল না। ছোটো ছোটো বৌদ্ধ রাজাদের ভিক্ষু বা বৌদ্ধ পণ্ডিত পরিপোষণের সাধ্যও ছিল না। বাংলায় ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্মের উত্থান শুরু হয়ে যায়। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "আশে পাশে চারিদিকে অনেক ছোটো ছোটো রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল। আটশত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু হিন্দু ছিল — অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ।"[১২১]

বৌদ্ধদের অধঃপাতের বিভিন্ন দিক এবং এই অধঃপাতের মূল কারণগুলি কি কি সে সম্পর্কে হরপ্রসাদ নিরন্তর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এমন কি ১৩২৫-২৬ বঙ্গাব্দে *নারায়ণ*-এ ধারাবাহিক ভাবে এবং ১২২৬ বঙ্গাব্দেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হরপ্রসাদের *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে বৌদ্ধধর্মের ভাঙন ও হিন্দুধর্মের উত্থান চিত্রিত হয়েছে। একটি যুগ-সন্ধিক্ষণকে এ উপন্যাসে ধরার চেষ্টা হয়েছে। কাহিনির সময় কাল ১০০০ খ্রিস্টাব্দ। অবশ্য দীনেশচন্দ্র সরকার অন্য মত প্রকাশ করেছেন, "১০০০ খ্রিস্টাব্দের কাহিনী হিসাবে 'বেনের মেয়ে'তে আমরা কিছু কিছু ইতিহাস বিষয়ক ত্রুটি দেখিতে পাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশের পর এই দীর্ঘকালে আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞান অনেক বর্ধিত হইয়াছে। আমরা এখন জানি যে, হরিবর্মা ও ভবদেব ভট্ট ঐ সময়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হন।"[১২২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাসের সময়-কালের ত্রুটি অনস্বীকার্য। হরিবর্মা এবং ভবদেব ভট্ট একাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি ১০০০ শতাব্দীর যে সামাজিক চিত্র এঁকেছেন তা একাদশ শতাব্দীতেও যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। বৌদ্ধ-হিন্দু দ্বন্দ্বে বৌদ্ধদের সামাজিক মর্যাদা অবনমিত হয়েছে দশম-একাদশ শতাব্দীতে। এর মূলে হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রকার ভবদেব ভট্ট বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর

সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "ভবদেব সমসাময়িক কালের বাঙালী চিন্তানায়কদের অন্যতম, তিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র গণিতফল-সংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিলভট্টের *মীমাংসা* গ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতিগ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র, অস্ত্রবেদেও তিনি সুপণ্ডিত।"[১২৩] এই ব্যক্তির উপরই ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের দায়িত্ব ছিল। তিনি সমাজকে নানা নিয়মের নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের প্লাবন থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এমন কি জাত-পাতের উৎপাত সৃষ্টিতেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। সমাজে কোনো রকম বৌদ্ধপ্রভাব যাতে না থাকে সেজন্য সারাজীবন তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "কুমারিল ভট্ট মীমাংসাসূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় বৈদিক ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনোজের ব্রাহ্মণগণের নেতা। কনোজ তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী মহারাজার রাজধানী। সুতরাং সেখান হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি ? কনোজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এ দেশে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছুই জানেন না।"[১২৪] কনৌজ থেকে আনীত ব্রাহ্মণেরাই বাংলার বৌদ্ধ প্রভাব প্রতিহত করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। ঐ কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারই পরবর্তীকালে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিশাল ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে তোলে। এই ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রধান নেতা ভবদেব ভট্ট। তাঁর পূর্বপুরুষ কনৌজ থেকে আগত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা বঙ্গ থেকে বৌদ্ধধর্ম দূর করতে চাইলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের শিকড় বাংলার মাটিতে বহুদিন ধরে অনেক দূর পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কবে আরম্ভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যাহা মূল স্থান বাংলা তাহার অতি সন্নিকট। ইহা হইতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তিনি নির্বাণের দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, 'বাংলার রাজকুমার বিজয় আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে।' সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিতকালে শুধু যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইয়াছিল এমত নহে কিন্তু বাংলা দেশ হইতে অন্যদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকও যাইতেছিল।"[১২৫] কিন্তু শেষপর্যন্ত বাংলার বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ায়। নানা ধরনের তান্ত্রিক আচার-আচরণ শুরু করে । বহু দেব দেবীর জন্ম হয়।[১২৬] হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে তার মিল-অমিল দুই-ই আছে। ধীরে ধীরে বৌদ্ধদের মধ্যে মূর্তিপূজা চালু হল। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম গোটা সমাজকে গ্রাস করে নিল। এমন-কি হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের উপরও গভীর প্রভাব ফেলল। বৌদ্ধদের মতো গুরু ভজনা শুরু হলো। ব্রাহ্মণ্য পূজো-পার্বণে বৌদ্ধ দেব-দেবীর সাক্ষাৎ মেলে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলার বৌদ্ধসমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের

পাঁচটি শক্তি আছেন। তাঁহাদের নাম — রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্যতারিকা। ইঁহাদের দুজনের — মামকী ও পাণ্ডরার পূজা দুর্গোৎসবের মধ্যে হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের যে পঞ্চ রক্ষা আছেন— মহাপ্রতিসরা, মহামায়ূরী, মহাশীতবতী, মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, মহামন্ত্রানুসারিণী— দুর্গোৎসবের মধ্যে ইঁহাদেরও পূজা হইয়া থাকে।"[১২৭] বৌদ্ধ ও হিন্দু অনেক দেবতার ধ্যান একই রকমের।

পালযুগের শেষ দিক থেকেই হিন্দু দেব-দেবীর পুনরুত্থান শুরু হয়। যদিও পালরা বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি নানা পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক কারণে হিন্দুধর্মের ক্রম উত্থানকে তাঁরা রোধ করতে পারেন নি। বর্মবংশ পাল রাজাদের অধীনস্থ হলেও তাঁরা ধর্মের দিক থেকে হিন্দু ; বিষ্ণুর উপাসক। ভবদেব ভট্ট বর্মরাজবংশের হরিবর্মদেবের মন্ত্রী হিসেবে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল গভীর। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের জন্যই সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাংলার গোটা সমাজে আমূল পরিবর্তন এনে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ভবদেবের লক্ষ্য। এ ব্যাপারে বর্মরাজবংশের সমর্থন ও সাহায্য নিশ্চয় ছিল। জাতবর্মার সৈন্যরা সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার পুড়িয়ে দেয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সমাজের সরাসরি সংঘর্ষ এই সময় থেকেই শুরু হয়। এর মধ্যে সেনবংশ রাজত্ব শুরু করে। তাঁরাও ছিলেন ঘোর বৌদ্ধ-বিরোধী এবং হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পক্ষে। ব্রাহ্মণ্য সমাজের সংরক্ষণের জন্য কঠোর নিয়ম-কানুন এবং সামাজিক সংস্কার করা হয়। বৌদ্ধদের তন্ত্র, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠানকে স্পর্শ করায় বর্ম বা সেন বংশ কেউই খুশি হয় নি। রাষ্ট্রশক্তি যখন ব্রাহ্মণ্য-সমাজের হাতে এল তখন তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের জন্য চিন্তিত হবেনই তা বলা বাহুল্য মাত্র। হলায়ুধ, হরিবর্মা, সামলবর্মা, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন বৌদ্ধ-বিরোধী হিন্দু-সমাজ গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ভবদেব ভট্ট সর্বাপেক্ষা বেশি কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন।

বাংলার সমস্ত ব্রাহ্মণকেই ভবদেব সৎব্রাহ্মণের মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না। নির্দিষ্ট উপবর্ণ ছাড়া অন্ত্যজ পর্যায়ের কারো পৌরোহিত্য করলে 'পতিত' হতে হতো। এবং সেই ব্রাহ্মণ যজমানের বর্ণ পেত। এভাবে পতিত বর্ণ-ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পতিত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্রোত্রীয়-ব্রাহ্মণদের কোনো রকম সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ছিল নিষিদ্ধ। বিবাহ বা অন্য কোনো আদান-প্রদান তো দূরের কথা বর্ণ-ব্রাহ্মণের ছোঁয়া শ্রোত্রীয়-ব্রাহ্মণের খাওয়া নিষিদ্ধ। ভবদেব ব্রাহ্মণদের অনেক বৃত্তি গ্রহণই নিষিদ্ধ করে দেন। ধর্মকর্মানুষ্ঠান, পৌরোহিত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাই ব্রাহ্মণদের মূল কাজ। তবে ব্রাহ্মণদের কৃষিকার্য স্বীকৃতি পেয়েছিল। ভবদেব ভট্ট নিজে মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনেক বৃত্তি গ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন।

তিনি সমাজের বিভিন্ন জাতির স্থান নির্ণয় করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে ভবদেব ভট্ট চরিত্র নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, সমাজে কাদের জল চল,

কাদের জল অচল। এবং বৌদ্ধদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় কৈবর্ত (মৎসজীবী), চণ্ডাল, মেদ প্রভৃতিকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। ভবদেবীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজ নতুন রূপে গড়ে উঠলেও সমাজ থেকে বৌদ্ধধর্ম এবং তার আচার-আচরণ-অনুষ্ঠানকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করা যায় নি । বৌদ্ধধর্ম আমাদের সমাজকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। এবং হরপ্রসাদের মতে, "আমরা বাঙালি ব্রাহ্মণেরা এখন অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কানে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।"[১২৮]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সারা জীবন অনেক বৌদ্ধপুথি আবিষ্কার করেছেন, পড়েছেন, বিবরণ ও তালিকা রচনা করেছেন এবং ঐগুলির মধ্য থেকে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত *বৃহৎস্বয়ম্ভুপুরাণ* (১৮৯৪-১৯০০), *চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ* (১৮৯৮), সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* (১৯১০), অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দ কাব্য* (১৯১০), আর্যদেবের *চতুঃশতিকা* (১৯১৪), *অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ* (১৯২৭), *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*, (১৩২৩ ব.) প্রভৃতি গ্রন্থাবলী; এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল, *জর্নাল অব বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি, ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলি, ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, নারায়ণ* প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধাবলী থেকে বোঝা যায় হরপ্রসাদ নিরন্তর বৌদ্ধ-বিদ্যার চর্চা করেছেন, তিনি অন্বেষণ চালিয়ে গেছেন বৌদ্ধ প্রভাবিত বাংলার সামাজিক ইতিহাস উদ্ধারের জন্য।

বাংলায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে বিভিন্ন যানের পথ ধরে তন্ত্রযানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে দশম-একাদশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক অভিচার আকীর্ণ বৌদ্ধধর্ম বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছিল। দেখা দিয়েছিল সামাজিক অবক্ষয়। বৌদ্ধধর্ম অধঃপতিত হল, সেই সঙ্গে সমাজও অধঃপতিত হল। হরপ্রসাদের মতে, "এক-একবার মনে হয় তিন-চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাত গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধু অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত।"[১২৯]

অনেকে মনে করেন, মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল; অর্থাৎ হিন্দু পুনরুত্থানের পর যেটুকু বৌদ্ধ অবশেষ ছিল তা পূর্বভারতে মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়ে যায়। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। হরপ্রসাদ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে *জর্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*-এ 'বুদ্ধিজম্ ইন্ বেঙ্গল সিন্স দ্য মুহামেডান কন্‌কোয়েস্ট' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, মুসলমান আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হওয়া "physically impossible. The Muhammadan conquest itself was not a complete conquest, the Pathans held the country simply in

military occupation.[১৩০] তাঁদের পক্ষে গোটা দেশের বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না। এমন-কি হিন্দু-বৌদ্ধে তফাতটা কোথায় তাও তাঁরা ধরতে পারেন নি। "In fact, the pressure of the conquest was felt by both Hindus and Buddhists alike."[১৩১] মুসলমানরা পৌত্তলিকতার বিরোধী। তাই পৌত্তলিক হিন্দু ও বৌদ্ধ তাঁদের কাছে সমান ছিল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁরা আঘাত হেনেছেন। কখনো কখনো বৌদ্ধ মঠ ও বিহার আক্রান্ত হয়েছে। বাংলা-বিহারের বৌদ্ধরা ক্রমশ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়ও পায় নি। ফলে, শেষ পর্যন্ত, "The helpless Buddhists would naturally be inclined more to Muhammadanism."[১৩২]

এইভাবে আস্তে আস্তে বৌদ্ধধর্ম কি মুছে গেল? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, সমাজের নানা রকমের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেল। "A sort of corrupt Buddhism mixed up with a variety of Aryan and non-Aryan forms of worship, still obtains in Bengal amongst a very large number of lower class people."[১৩৩]

হরপ্রসাদ আজীবন বৌদ্ধ-বিদ্যা চর্চার মধ্য দিয়ে এই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস উদ্ঘাটনের জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি বুঝতে চেয়েছেন ধর্মীয় সমৃদ্ধি কিভাবে একটি অঞ্চলের সমাজ এবং তার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে; বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির সময় মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবন, শ্রেণী বিন্যাস এবং বৌদ্ধধর্মের বিলয়ের কালে হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্বে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো তা হরপ্রসাদের অনুসন্ধানের বিষয়। তিনি গোটা বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখেছেন! ধর্মীয় ও দার্শনিক মতামতগুলির তুলনামূলক আলোচনা এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি বিষয় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি স্নানের নিয়ম, কামানো, পোশাক, মুখধোয়া, কাপড়কাচা ও তেলমাখা ইত্যাদি হিন্দু-বৌদ্ধের দৈনন্দিন কাজের প্রভেদ দেখিয়েছেন। হরপ্রসাদের বৌদ্ধ-বিদ্যা চর্চা শুধুমাত্র ভাববাদী ধর্মীয় ব্যাখ্যা নয়। এর বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক ইতিহাস উদ্ধার করতে চেয়েছেন।

সূত্রনির্দেশ

১. রামদাস সেন, 'On the Modern Buddhistic Researches'. 1870, *রামদাস গ্রন্থাবলী*, তৃতীয় ভাগ, বহরমপুর, ১৩২২ ব.।

২. রামদাস সেন, ' বৌদ্ধধর্ম', *বঙ্গদর্শন*, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।

৩. *তদেব।*

৪. রামদাস সেন, 'পালিভাষা ও তৎসমালোচনা', *বঙ্গদর্শন*, চতুর্থ বর্ষ, দশম সংখ্যা, মাঘ ১২৮২; 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচনা', *বঙ্গদর্শন*, চতুর্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন ১২৮২।

৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ', *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ, ১২৮৪।

৬. 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৫৯।

৭. *তদেব*, পৃ. ৬০।

৮. Rajendralal Mitra, *The Sanskrit Buddhist Literature of Bengal.* Calcutta. 1971.

৯. 'মহাযান কোথা হইতে আসিল?', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ৩৩৯-৪৬।

১০. 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ৪৮৩-৯৪।

১২. দ্র. Duka, Theodor, *Life and Works Of Alexander Csoma de Koros,* London, 1885 ; Hunter, W.W., 'A Pilgrim Scholar', *The Indian o. the Queen and Other Essays,* London, 1903 ; Haraprasad Shastri, 'Northern Buddhism', *IHQ*, March, June & Sept. 1925 ; Hirendranath Mukherjee, *Hermit-Hero and Hungary : Alexandei Csoma de Koros.The Great Tibetologist,* New Delhi, 1981 ; নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, 'উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের সন্ধানে আলেকজান্ডার চোমা দ্য কোরোশ', আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ সম্পাদিত *ইতিহাস অনুসন্ধান-৯*, কলকাতা-১৯৯৪, পৃ. ৭৫২-৬০।

১৩. দ্র. Hunter, Wiliam, *Life of Brian Houghton Hodgson, British Resident at the Court of Nepal,* London, 1896 ; Haraprasad Shastri, 'Northern Buddhism', *IHQ,* March, June, Sept.,1925; নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, 'উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম : ব্রায়ান হটন হজসন', আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ সম্পাদিত *ইতিহাস অনুসন্ধান-১০*, কলকাতা ১৯৯৫, পৃ ২১৭-২৬।

১৪. Haraprasad Shastri, 'Buddhism in Bengal Since the Muhammadan Conquest', *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* 1895.

১৫. Duka, Theodor, *Life and Works of Alexander Csoma de Koros,* London, 1885

১৬. *তদেব*, পৃ. ১১০।

১৭. *তদেব*, পৃ. ১১০।

১৮. অতীশ "based himself and his elucidation on Prajnaparamita literature which Csoma found engrossing and important to an understanding of the human mileu in the Asian Middle Ages. .... Nagarjuna, whose name well deserves to be in the worlds pantheon of learning, wrote great commentary on 'Prajna-paramita' and apropos of the same theme, a momnumental work on Hinayanic and Mahayanic lore, but the original Sanskrit is lost

while Kumarjivas chinese translation is luckily extant. Many of the originals of Buddhist literature in Pali, Buddhist Sanskrit and pure Sanskrit are lost but can be recovered only from Tibetan and Chinese translations. It was Csoma de Koros, finding his treasure-trove, who drew attention first to this phenomenon and lighted the way ahead."– Hirendranath Mukherjee, *Hermit Hero from Hungary : Alexander Csoma de Koros the Great Tibetologist*, New Delhi, 1981, p. 63.

১৯. Duka, Theodor, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

২০. দ্র. De Jong, J. W. 'Preface', Alexander Csoma de Koros, *Analysis of Kanjur*, Delhi, 1982, p.V.

২১. ' বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?', হ-র-সং-৩, পৃ. ২৪১।

২২. তদেব, পৃ. ২৪১-৪২।

২৩. Oldfield, Henry Ambrose, *Sketches from Nipal*, Vol. II, London, 1880, p.71.

২৪. 'হীনযান ও মহাযান', হ-র-সং-৩, পৃ. ৩২৩।

২৫. 'মহাযান কোথা হইতে আসিল?', হ-র-সং-৩, পৃ. ৩৩৯-৪৬।

২৬. " যে সকল অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না সংস্কৃত, না মাগধী, না কোশলী ; একরূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্রভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন Mixed Sanskrit ('বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?' হ-র-সং-৩, পৃ. ২৪২-৪৩)। মহাবস্তু অবদান, ললিতবিস্তর, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গুণরত্ন, সঞ্চয় গাথা, নাসিক কার্লি প্রভৃতি গুহায় সাতকর্ণি রাজাদের শিলালেখগুলি "কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম দিয়াছেন গাথাভাষা। সিনার সাহেব (E. Senart) এ ভাষার নাম দিয়াছেন মিক্সড সংস্কৃত (Mixed Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন ভারনাকুলারাইজড্ সংস্কৃত (Vernacularised Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যানস্কৃটাইজড্ ভারনাকুলার (Sanskritized Vernacular) — যেমন আমাদের পণ্ডিতি বাংলা।" ('মহাযান কোথা হইতে আসিল?' হ-র-সং-৩, পৃ. ৩৪২-৪৩)। " বৌদ্ধরা আর এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্র ভাষা, উহার কতক সংস্কৃত কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণ স্বরূপ পদ্য। পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরানো। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ 'মহাভাষ্যে'র ভাষা নয়, কোনো প্রাকৃতের তর্জমা মাত্র। এসব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু 'সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক' নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা এই রকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলামাকান মরু খুঁড়িয়া যে 'সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীকে'র প্রাচীন

পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।" ('হিন্দু বৌদ্ধে তফাত', হ-র-সং-৩, পৃ. ৫১৩)। এ ছাড়া দ্র. Sukumar Sen, 'An Outline Syntax of Buddhistic Sanskrit', *Journal of the Department of Letters*, Vol. XVII, Calcutta University, 1928.

২৭. 'মহাযান কোথা হইতে আসিল', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ৩৪৪।

২৮. Oldfield, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

২৯. *তদেব*, পৃ ৭৩।

৩০. *তদেব*, পৃ. ৭৩।

৩১. *তদেব*, পৃ. ৭৫।

৩২. *তদেব*, পৃ. ৭৫।

৩৩. Rajendralal Mitra, *The Sanskrit Buddhist Literature of Bengal*, Calcutta, 1971, p. XXVI.

৩৪. *তদেব*, পৃ. ২৬।

৩৫. Hunter, William Wilson, *Life of Brian Houghton Hodgson, British Resident at the Court of Nepal.* London, 1896, p. 278.

৩৬. *তদেব*, পৃ. ২৬১।

৩৭. Hodgson, B.H., 'Notices of the langueges, Literature, and Religion of the Buddhas of Nepal and Bhot', *As. Res.*, Vol. XVI, Calcutta, 1828.

৩৮. Wilson, Horace Hayman, 'Notices of Three Tracts Received from Nepal', *As. Res.*, Vol. XIV. Calcutta, 1928, p. 45.

৩৯. Hodgson, *As. Res.*, Vol. XVI, p. 409.

৪০. "The various contributions which I have had the nonour to forward to the library and Museum of the Asiatic Society, and the lists by which they have been accompanied, will have put the society in possession of such information as I have been able to collect respecting the articles presented. Some connected observations, suggests by the principal of them, may, however, be not unacceptable, as derived from enquiry on the spot, and communication with learned Nepalese. I do not pretend to offer a couplet or detailed view of the Literature or Religion of the Nepalese, ... A few general remarks are all, therefore, that can be attempted at present, and may prepare way, it is hoped, for further investigation." — *তদেব*, p. 409.

৪১. Hunter, *তদেব*, p.267.

৪২. *তদেব*, p.268.

৪৩. "The dry climate of Nepal is admirably adapted for the preservation of documents. Its isolated position saved it from the havoc of the Muslim invasions, amid with which so many of the literary treasures of ancient India perished. The very early use of paper in Tibet supplied an alternative substance more enduring than the brittle palm-leaves employed for the purpose in India, and to some extent also in Nepal. Even the decline of learning in Nepal tended to conserve the memorials of its ancient scho larship. Many of the old Nepalese manuscripts survived for centuries forgotton and unread." তদেব, p.265.

৪৪. Nikhileswar Sengupta, 'Revival of Brahmanism in Bengal under the aegis of Bhavadeva Bhatta', N.R. Ray and P.N. Chakraborti (ed.) *Studies in Cultural Development of India*. (Collections of Essays in Honour of Prof. Jagadish Narayan Sarkar), Calcutta, 1991, pp. 96-104.

৪৫. Haraprasad Shastri, 'Northern Buddhism', *IHQ*, Calcutta, March, June, Sept. 1925.

৪৬. ". .the Muhammadan conquest itself was not complete conquest, the Pathans held the country simply in military occupation. They held some of the big cities and left the rest of the country govern itself the best it could. It was not possible for them to destroy Budhism all over the country."– Haraprasad Shastri, 'Budhism in Bengal since the Muhammadan Conquest', *JASB*, 1895.

৪৭. Haraprasad Shastri, 'The Northern Buddhism', *IHQ*, May, 1925, p.24.

৪৮. "Believing the authenticity and great historical value of the Mss. presented to the Asiatic Society of Bengal, often urged me to examine them and prepare an analysis of their contents; but the magnitude of the work deterred me."– Rajendralal Mitra, *The Sanskrit Buddhists Literature of Nepal*, Calcutta, 1971, p. XXII.

৪৯. "Abhidharma of the Ceylonese includes philosophical works; and the Prajnaparamitas and their commentaries take in place in the Nepalese collection."– তদেব, p. XVIII.

৫০. দ্র. Haraprasad Shastri, 'Northern Buddhism', *IHQ*, March, June, Sept. 1925.

৫১. দ্র. Hodgson, B.H. 'European Speculations on Buddhism', *JASB*, 1834.

৫২. 'হিন্দু বৌদ্ধে তফাত', হ-র-সং-৩, পৃ. ৫১৩।

৫৩. তদেব, পৃ. ৫১৩।

৫৪. তদেব, পৃ. ৫১৩।

৫৫. 'ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার', হ-র-সং-৩, পৃ. ১৯৪।

৫৬. তদেব, পৃ. ৫৯৩।

৫৭. Haraprasad Shastri, 'Notes on Palm Leaf Mss. in the Library of his Excellency the Maharaja of Nepal', *JASB*, Vol. LXV(1), pp. 310-11.

৫৮. গোপীনাথ কবিরাজ, 'মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১৮৮।

৫৯. Haraprasad Shastri, 'Northern Buddhism', *IHQ*, 1925, March, pp. 18-30, June pp. 201-13, Sept. pp.464-72.

৬০. Narendra Nath Law, 'Mr. Haraprasad Shastri', *IHQ*, March, 1933, p. 345.

৬১. 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ: হিন্দু ও বৌদ্ধ', হ-র-সং-৩, পৃ. ৫৭৫-৭৬।

৬২. তদেব, পৃ. ৫৮৩।

৬৩. 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম', হ-র-সং-৩, পৃ. ৪৯২।

৬৪. তদেব, পৃ. ৪৯২।

৬৫ তদেব, পৃ. ৪৯২।

৬৬. তদেব, পৃ. ৪৯২ ।

৬৭. Haraprasad Shastri, *Discovery of Living Buddhism in Bengal*, Calcutta,

1897, pp. 26-27.

৬৮. 'রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল', হ-র-সং-৩, পৃ. ২০৬।

৬৯. তদেব, পৃ. ২১৫।

৭০. 'উড়িষ্যার জঙ্গলে', হ-র-সং-৩, পৃ. ৪১৭।

৭১. দ্র. Gait, E.A., *Census of India,* Vol. I, Part II, Tables, 1911, p.222; Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Ethnographic Glossary, Vol. II. Calcutta, 1891, Haraprasad Shastri, *Discovery of Living Buddhism in Bengal,* Calcutta, 1897; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে "বীরভূমে একটি জাতি আছে সরাক। মাছ মাংস খায় না। তাঁত বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, চাষবাসও করে। পরে অবশ্য আমি জানিয়াছি ইহারা জৈন ছিল। উপাধি ছিল সরওয়াগী। সরওয়াগীর অপভ্রংশে এখন নাম হইয়াছে সরাক। লোকে বলে সরাকী তাঁতি।" — 'আচার্য হরপ্রসাদ', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১২০ ।

৭২. 'উড়িষ্যার জঙ্গলে', হ-র-সং-৩, পৃ. ৪১৯।

৭৩. তদেব, পৃ. ৪১৯-২০।

৭৪. তদেব, পৃ. ৪২২।

৭৫. Nagendra Nath Vasu, 'Preface', *The Modern Buddhism and its followers in Orissa*, Calcutta, 1911.

৭৬. 'বৌদ্ধধর্ম কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ২৪০।

৭৭. উনবিংশ শতাব্দীতে মহিমা গোঁসাই ওড়িশার কেওনঝরে নিরাকার ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করেন। এই ধর্ম যাঁরা মানতেন তাঁরাই মহিমাপন্থী। দ্র. Mayadhar Mansinha, *History of Oriya Literature*, Sahitya Akademi, New Delhi, 1962, p. 151; Nagendra Nath Vasu, *The Modern Buddhism and its followers in Orissa*, Calcutta, 1911.

৭৮. 'রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ২১৫।

৭৯. *তদেব*, পৃ. ২১৬।

৮০. *তদেব*, পৃ. ২১৬।

৮১. *তদেব*, পৃ. ২১৬।

৮২. 'বৌদ্ধধর্ম কাহাকে বলে ও তাহার গুরু কে?', *হ-র-সং-৩*. পৃ. ২৪০।

৮৩. *তদেব*, পৃ. ২৪০-৪১।

৮৪. *তদেব*, পৃ. ২৪১।

৮৫. *তদেব*, পৃ. ২৪৩।

৮৬. *তদেব*, পৃ. ২৪৩।

৮৭. "যাহারা 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করে অর্থাৎ 'প্রাণাতিপাত করিব না', 'মিথ্যা কথা কহিব না', 'চুরি করিব না', 'মদ খাইব না', 'ব্যাভিচার করিব না'— এই পাঁচটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাহারাও বৌদ্ধ।"— *তদেব*, পৃ. ২৪৩।

৮৮. *তদেব*, পৃ. ২৪৩।

৮৯. *তদেব*, পৃ. ২৪৫।

৯০. *তদেব*, পৃ. ২৪৬।

৯১. *তদেব*, পৃ. ২৪৮।

৯২. *তদেব*, পৃ. ২৪৯।

৯৩. *তদেব*, পৃ. ২৪৯।

৯৪. *তদেব*, পৃ. ২৪৯।

৯৫. *তদেব*, পৃ. ২৫০।

৯৬. *তদেব*, পৃ. ২৫১।

৯৭. *তদেব*, পৃ. ২৫১।

৯৮. *তদেব*, পৃ. ২৫১।

৯৯. 'কোথা হইতে আসিল?', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ২৯৬।

১০০. *তদেব*, পৃ. ২৯৭।

১০১. *তদেব*, পৃ. ২৯৭।

১০২. *তদেব*, পৃ. ২৯৭।

১০৩. *তদেব*, পৃ. ২৯৮।

১০৪. *তদেব*, পৃ. ২৯৮।

১০৫. *তদেব*, পৃ. ২৯৮।

১০৬. *তদেব*, পৃ. ৩০০।

১০৭. *তদেব*, পৃ. ৩০১।

১০৮. 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ৪৮৭।

১০৯. *তদেব*,পৃ. ৪৮৭।

১১০. খ্রিস্টীয় সপ্তম/অষ্টম শতাব্দীর আর্যদেব ছিলেন *চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণের* লেখক। হরপ্রসাদ এই পুথি আবিষ্কার করেন। দ্র. H.P. Shastri, ' The discovery of a work by Aryadeva in Sanskrit', *JASB*, LXVI(I) 1898; H.P. Shastri, ' The Northern Buddhism', *IHQ,* Sept. 1925, p.464; বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের মতে বৌদ্ধতান্ত্রিক দ্বিতীয় আর্যদেব *চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ*-এর লেখক। দ্র.Benoytosh Bhattacharyya, *Sadhanamala,* Vol. II. Baroda, 1968, p. CXXXIV.

১১১. 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ৩৭২। এখানে যে 'চরিত্র বিশুদ্ধি'-র কথা বলা হয়েছে তা *চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ* হওয়াই সঙ্গত। দ্র. পাদটীকা নং ১১০।

১১২. 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত', *হ-র-সং-৩*, পৃ. ৩৭৪।

১১৩. *তদেব*, পৃ. ৩৭৬।

১১৪. *তদেব*, পৃ. ৩৭৯।

১১৫. *তদেব*, পৃ. ৩৭৯।

১১৬. *তদেব*, পৃ. ৩৭৯ ।

১১৭. *তদেব*, পৃ. ৩৭৯।

১১৮. *তদেব*, পৃ. ৩৭৯।

১১৯. *তদেব*, পৃ. ৩৮০।

১২০. *তদেব*, পৃ. ৩৮০।

১২১. *তদেব*, পৃ. ৩৮১।

১২২. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ২৪৮। দ্র. Manomohan Chakraborti, 'Bhatta Bhavadeva of Bengal', *JASB*, Sept., 1912, pp. 333-47; Haraprasad Sastri, 'Remarks on M M Chakrabarti's paper on 'Bhatta Bhavadeva of Bengal', *JASB*, 1912, p. 347-48; Nikhileswar Sengupta, 'Revival of Brahmanism in Bengal under the Aegis of Bhavadeva Bhatta', N.R. Ray & P. N. Chakraborti (ed.) *Studies in Cultural Development of India*,

(Collection of Essays in Honour of Prof. Jagadish Narayan Sarkar), Calcutta, 1991, pp. 96-104.

১২৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, প্রথম খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩০৪।

১২৪. 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম, *হ-র-সং-৩*, পৃ. ৪৮৬-৮৭।

১২৫. *তদেব*, পৃ. ৪৮৭-৮৮।

১২৬. "... It may be noticed that the images, sculptures, bronzes, drawings, miniatures, and the gods and goddesses represented by these, together with the literature explaining them all belong to the Tantric mode of thought and culture... It leads therefore to a consideration of that form of Buddhism which is well known as Vajrayana."-- Benoytosh Bhattacharyya, *The Indian Buddhist Iconography,* Calcutta, 1986, p.7.

১২৭. 'বাংলার বৌদ্ধ সমাজ', হ-র-সং-৩, পৃ. ৬০১ ।

১২৮. *তদেব*, পৃ. ৬০৩ ।

১২৯. 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত', হ-র-সং-৩, পৃ. ৩৮১-৮২ ।

১৩০. 'Buddhism in Bengal since the Muhammadan Conquest', হ-র-সং-৩, পৃ. ৬৫৩।

১৩১. *তদেব*, পৃ. ৬৫৩।

১৩২. *তদেব*, পৃ. ৬৫৩।

১৩৩. *তদেব*, পৃ. ৬৫৫।

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে ইতিহাসের উপাদান

সৃজনধর্মী সাহিত্য রচনায় হরপ্রসাদের ঝোঁক ছিল। *কাঞ্চন মালা* ও *বেনের মেয়ে* উপন্যাস দুটি এবং অন্যান্য সৃজনধর্মী রচনা তাঁকে সাহিত্যিক-মর্যাদা এনে দিয়েছিল। তাঁর সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত বঙ্গদর্শন-এ। *বঙ্গদর্শন*-গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা সাহিত্য পরিচালনে তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে গোপীনাথ কবিরাজ লিখেছেন, "তাঁহার তীব্র সমালোচনার কশাঘাতে অনেক আত্মম্ভরী অযোগ্য লেখক সাহিত্য চর্চ্চা হইতে চিরদিনের জন্য বিরত হইয়া পড়িত। অপরপক্ষে, প্রতিভাশালী যথার্থ সুলেখক তাঁহার নিকটে কখনোই যথোচিত সম্মান ও উৎসাহ প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেন না।"[১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সাহিত্য রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উৎসাহিত করেছেন। তাঁর প্রথম রচনা 'ভারত মহিলা' *বঙ্গদর্শনে* (মাঘ-চৈত্র ১২৮২) প্রকাশ করেছেন। পরে হরপ্রসাদ *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় নানা বিষয় নিয়ে নিবন্ধ রচনা করেন। *কাঞ্চন মালা* উপন্যাসটিও ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত (আষাঢ়-মাঘ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ) হয়। তখন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদন পায় নি।[২] এর পর, হরপ্রসাদের ভাষায়, "নানা কারণে আমি অনেকদিন ধরিয়া বাংলা লিখি নাই।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন হরপ্রসাদের সাহিত্য-গুরু। কিন্তু তাঁর উপন্যাস লেখার ঝোঁক বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। ইতিহাস বা ইতিহাসাশ্রিত রচনায় হরপ্রসাদের মনোনিবেশই সম্ভবত তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। হরপ্রসাদ তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য-চর্চায় সমাজ, সামাজিক মানুষ, ইতিহাস ও পরম্পরার অন্বেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না; কিন্তু ইতিহাসে তাঁর আগ্রহ ছিল। দেশের ইতিহাস উদ্ধারে তাঁর প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য।[৪] হরপ্রসাদ লিখেছেন, "কাব্যের চেয়ে ইতিহাসে তাঁহার [বঙ্কিমচন্দ্রের] বেশি শখ ছিল। ...রিনাইসেন্স *(Renaissance)* ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাংলারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাংলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশেই তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বলিয়া *বঙ্গদর্শনে* সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য প্রাচীন পুঁথি ঘাটিয়া তাঁহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম।"[৫] ইতিহাস চর্চায় ও ইতিহাস-দৃষ্টি তৈরিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। হরপ্রসাদের সাহিত্যচর্চার পেছনে সব সময়েই ইতিহাস নিষ্ঠ বোধ কাজ করেছে। সমস্ত কিছুর মধ্যেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে বার করা তাঁর কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হরপ্রসাদের প্রথম রচনা *ভারত মহিলা*। ছাত্রাবস্থায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য

রচনাটি লিখেছিলেন।[৬] হরপ্রসাদ লিখেছেন, এই রচনাটির " প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকিগুলি সমস্ত পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রী চরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে।"[৭] পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় মহিলাদের যে চরিত্র-বর্ণনা রয়েছে তাতে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি দিক পরিস্ফুট হয়েছে। হরপ্রসাদ প্রাচীন ভারতের সমাজে মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে বহু প্রাচীন তথ্য ব্যবহার করে 'highest ideal of woman's Character' রচনা করেছেন।

১২৮৭ বঙ্গাব্দের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় হরপ্রসাদের আর- একটি সৃজনধর্মী রচনা *বাল্মীকির জয়* প্রকাশিত হয়। তখন *বঙ্গদর্শনের* সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। *বঙ্গদর্শনে* এই রচনা আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে পূর্ণাঙ্গ রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *বাল্মীকির জয়* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় সমালোচনা করেন, "দুঃখের বিষয় সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত জানি, কেননা ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নবেলও বলিতে পারিলাম না .....ইহাতে বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের কথা আছে কিন্তু পুরাণ নহে; দিগ্বিজয়ের কথা আছে কিন্তু ইতিহাস নহে; একটা সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্রনীহারিকার কথা আছে কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ '*Origin of species*' নহে।"[৮] এই রচনার মাল-মশলা রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরণাদি থেকে গৃহীত। কিন্তু এটিকে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন। কাল্পনিক একটি জগৎ তৈরি করেছেন লেখক — সেখানে "The three forces physical, intellectual and moral"[৯] বিষয়গুলি রচনার উপজীব্য বিষয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত *বঙ্গবাসী* পত্রিকায় দেবেন্দ্রবিজয় বসু *বাল্মীকির জয়*-এর একটি সমালোচনা লেখেন (২৩ পৌষ ১২৮৯ ব.)। এই সমালোচনায় তিনি *বাল্মীকির জয়ের* মূল উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "...মনুষ্যের মনের কি অসীম ক্ষমতা, মানুষ ইচ্ছা করিলে, প্রতিভাবলে, সমস্ত বাহ্যজগত কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, হরপ্রসাদবাবু একথাগুলি বাল্মীকির জয়ে অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ কল্পনা সম্ভব নহে। ...যেকথা শাক্যসিংহ হইতে রুশো পর্যন্ত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন — হরপ্রসাদবাবু অতি সুন্দর রূপে তাহা বুঝাইয়াছেন। বুদ্ধিই বল, আর বীর্য্যই বল, এ সংসারে সাম্য ও একতা সংস্থাপনে অক্ষম। ...কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম বলই প্রধান বল। ...বাল্মীকি প্রতিভায় নূতন উপায়ে এ কথাটী সুন্দর রূপে বুঝান হইয়াছে।"[১০] *দ্য ক্যালকাটা রিভিউ*-তে ১৮৮২ সালে *বাল্মীকির জয়ের* সমালোচনায় লেখা হয় : ইতিহাসের এমন কোনো নজীর জানা নেই যেখানে

ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে সম্পূর্ণ বুদ্ধি নির্ভর সমাজ গড়ে তোলা হয়। কিন্তু শাস্ত্রীর মতো দৃঢ় কল্পনা শক্তির অধিকারী মানুষ অনায়াসে অনেক উপাদান একত্রিত করে ইংলন্ডের পিউরিটান পণ্ডিতদের মতো বৌদ্ধিক নিরীক্ষা নির্ভর সমাজের কথা লিখেছেন।[১১] ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর *নিউ এস্যেস ইন্ ক্রিটিসিজ্‌ম* গ্রন্থের 'দি নিও-রোমান্টিক মুভমেন্ট ইন লিটারেচার' প্রবন্ধে *বাল্মীকির জয়* প্রসঙ্গে লিখেছেন, বস্তুত পক্ষে *বাল্মীকি জয়ের* ভাব বৌদ্ধিক ও কায়িক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নৈতিক জয় যে অপর্যাপ্ত ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা নশ্বর, গভীর এবং চিরন্তনভাবে প্রযোজ্য। যাই-হোক এইটি জীবন এবং সমাজের সমালোচনা নয়, কিন্তু এইটি একটি সম্ভ্রম উৎপাদনকারী উচ্ছ্বাসপূর্ণ অথচ অসংলগ্ন রচনা।[১২]

সিলভ্যাঁ লেভি *Journal Asiatique* (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯১০)-এ রমনীরঞ্জন সেন কৃত *বাল্মীকির জয়*-এর অনুবাদ *The Triumph of Valmiki*-র সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "সাহিত্য সমালোচনার দৃষ্টিতে 'বাল্মীকির জয়' নানা দিক থেকে রোচক। সমকালীন কল্পনায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব কতটা প্রবল, তাও স্পষ্ট অনুভূয়মান।"[১৩]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বাল্মীকির জয়*-এ যে সমাজ-দর্শন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষণীয় তা দেবেন্দ্রবিজয় বসু এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সমালোচনায় যথার্থই ধরা পড়েছে। ভারতীয় সমাজ এবং সমাজ-চিন্তনের ঐতিহ্য হরপ্রসাদের রচনায় ফুটে উঠেছে।

বাল্মীকির জয় প্রকাশের পর বৎসর *বঙ্গদর্শন* (আষাঢ় - মাঘ, ১২৮৯) পত্রিকায় হরপ্রসাদের *কাঞ্চনমালা* উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩২২ সালে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কেন এতদিন পরে প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা জনের নানা মত আছে। প্রথমত, হরপ্রসাদ তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, " ১২৯০ [১২৮৯] সালে যখন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক তখন 'কাঞ্চনমালা' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ হয়েছিল। তাহার পর নানা কারণে আমি অনেক দিন ধরিয়া বাংলা লিখি নাই; সুতরাং 'কাঞ্চনমালা' প্রকাশের জন্য যত্ন করি নাই। কেন, কি বৃত্তান্ত — সে অনেক কথা — বলিয়া কাজ নাই।"[১৪] হরপ্রসাদ আবার বলেছেন, "আমার সঙ্গে তাঁহার [বঙ্কিমচন্দ্রের] দুই তিন বার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল এমন কি, তাহার জন্য আমাকে কিছু দিন বাংলা লেখা ছাড়িতেও হইয়াছিল।"[১৫] এবিষয়ে গোপীনাথ কবিরাজের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, " ... কাঞ্চনমালা' উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনা প্রণালী এবং ভাবমাধুর্য্যে এমন একটি বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় যাহা ঐযুগে অভুতপূর্ব বলিয়া বিবেচিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইহার গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কোনো কারণবশতঃ অগ্রজ সঞ্জীববাবুর দ্বারা তিনি শাস্ত্রিমহাশয়কে এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন। ... শাস্ত্রিমহাশয় বঙ্কিমবাবুর মনোগত ভাব অবগত হইয়া যারপর নাই নিরুৎসাহ এবং ভগ্নহৃদয়ে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।"[১৬] জীবনীকার গণপতি সরকার তাঁর *হরপ্রসাদ জীবনী*-তে এ প্রসঙ্গে

লিখেছেন, " এই উপন্যাস বাহির হইলে স্বয়ং ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বীই বা হরপ্রসাদ হইয়া পড়েন ; এই চিন্তা তাঁহার আসিয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু মহলে এ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া রাজকুমার বাবু হরপ্রসাদকে উপন্যাস লিখিতে মানা করিয়া বলিয়াছিলেন — তুমি এখন নাই লিখিলে you will survive him long, লেখার সময় তো ঢের পাবে, বন্ধু বিচ্ছেদ নাই বা করিলে।"[১৭] *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের মধ্যে মন কষাকষির পিছনে প্রকৃত কারণ কী সে বিষয়ে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত কোনো প্রকাশভঙ্গিই বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভের কারণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাইপো মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন, " জ্যাঠাবাবু আমাকে বলেছিলেন, তিষ্যরক্ষিতা কুণালের চোখ উপড়িয়ে এনে পা দিয়ে পিষ্ট করেছে এই বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র খুব রেগে যান। বলেন, এরকম সব ভয়ানক ব্যাপার যদি লেখ তবে আমি তোমার বিরুদ্ধে যাব।"[১৮] উভয়ের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ এটি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

কাঞ্চনমালা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। মৌর্য সম্রাট অশোকের ছেলে কুণাল ও তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনমালাকে নিয়ে কল্পনাশ্রয়ী এই ঐতিহাসিক আখ্যানটি গড়ে উঠেছে। তবু এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গত ব্যবহারের দিকটিও আমাদের দেখা দরকার। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে অনেক বৌদ্ধ পুথি ব্যবহৃত হয়েছে। *অবদানশতক, ললিতবিস্তার, মহাবস্তু অবদান* প্রভৃতি পুথিগুলি এই কাহিনি নির্মাণে সাহায্য করেছে। বৌদ্ধপুথি পাঠ করে তিনি প্রাচীন ভারতের একটি বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যকে নিয়ে কল্পনা মিশ্রিত বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধপুথি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে আসেন। নেপাল থেকে ব্রায়ান হটন হজসনের সংগ্রহ করা পুথিগুলি এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ছিল। সেই পুথিগুলির সূচি ও সংক্ষিপ্তসার তৈরির দায়িত্ব পড়ে রাজেন্দ্রলালের উপর। পুথির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে রাজেন্দ্রলালকে সাহায্য করেন হরপ্রসাদ। তিনি পনেরটি পুথির সার সংক্ষেপ করে দেন। সূচিপত্রে এর উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত এই গ্রন্থটির ভূমিকায় তার স্বীকৃতিও আছে।[১৯]

অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম মৌর্য সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সমসাময়িক বা তৎপরবর্তীকালের বৌদ্ধপুথিসমূহ দেখার এবং তা নিয়ে চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন হরপ্রসাদ। ফলে মৌর্য সাম্রাজ্য এবং বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁর একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র মতামতও গড়ে উঠেছিল। তাঁর সেই মতামতের ছাপ *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। এই উপন্যাসের সূত্র ক্ষেমেন্দ্রের লেখা *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা*-র 'কুণাল-অবদান' কাহিনি। কুণাল সম্রাট অশোকের ছেলে। কুনালের স্ত্রী কাঞ্চনমালা। তাদের ভালোবাসা বৌদ্ধ জীবনাদর্শ আশ্রিত। তারা সুখী। কিন্তু অশোকের স্ত্রী, কুণালের বিমাতা তিষ্যরক্ষিতা, কুণালের প্রতি কামজমোহে নির্জন কেলিগৃহে তাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

ক্ষিপ্তা তিষ্যরক্ষিতা কুণালের সুন্দর চোখ দুটি উপড়িয়ে নিয়ে পদদলিত করে। অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তিষ্যরক্ষিতা তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিষ্যরক্ষিতার পরিবর্তন হল। সে শান্তির আকাঙ্ক্ষায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। " শুনা গিয়েছে, তিষ্যরক্ষিতা কাঞ্চনের অনুগ্রহে আপনার ঋদ্ধিমতী নাম সার্থক করিয়াছিল।"[২০] কুণাল চোখ ফিরে পেলে, অশোক বোধিসত্ত্ব কুণালের অভীষ্ট কী জিজ্ঞাসা করলেন। তখন কুণাল বললেন, "তবে ঘোষণা করিয়া দিন যে, বিশাল মগধ সাম্রাজ্যে অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্মই প্রচলিত হইবে। এবং সাম্রাজ্যের বাহিরেও যাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তক্ষশিলায় সদ্ধর্ম প্রচার হয় নাই। আর আমায় তক্ষশিলার ধর্মাধ্যক্ষ করিয়া দেন ।"[২১] এর ফলে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হল — "এই দিবস যে কার্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে ।"[২২]

কাঞ্চনমালা ইতিহাস নয়, উপন্যাস। কিন্তু এতে ইতিহাসের উপাদান আছে। এবং এই উপন্যাসে একটি ঐতিহাসিক মূল সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন হরপ্রসাদ। বৌদ্ধপুথিপত্র ঘেঁটে মৌর্য সাম্রাজ্যের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর একটি অভিমত তৈরি হচ্ছিল। তারই চূড়ান্ত পরিণতি তাঁর ইতিহাস-সম্মত সিদ্ধান্ত 'কজেজ অব দ্য ডিসমেম্বারমেন্ট অব দ্য মৌর্য এম্পায়ার' প্রবন্ধ। [২৩] এই প্রবন্ধে মৌর্য রাজবংশের ধ্বংসের পিছনে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের কারণকেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের কাছে এই তত্ত্ব পুরোপুরি মাননা পায় নি। যাইহোক, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এই উপন্যাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন, " অশোক রাজা ছিলেন অতি পরাক্রমী এবং দুর্দ্ধর্ষ ; কাজেই, তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন প্রতিবাদীরা কার্য্যে বড় কিছু করিতে পারিতেন না। তদানীন্তন দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবটিকে গ্রন্থকার বারবার সুস্পষ্ট রূপে 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন ।"[২৪] ঐতিহাসিক উপন্যাসে একটি বিশেষ সময়ের মূল সুরটি ধরা পড়ে। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে অশোকের সময়, তাঁর সাম্রাজ্য এবং বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্রিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে।

কাঞ্চনমালা প্রকাশের পর হরপ্রসাদ দীর্ঘদিন উপন্যাস লেখেন নি। পরবর্তীকালে আর-একটি মাত্র উপন্যাস *বেনের মেয়ে* লিখেছিলেন। বেনের মেয়ে ১৩২৫-২৬ বঙ্গাব্দে *নারায়ণ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

বেনের মেয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসের পটভূমি বাংলায় মুসলমান আগমনের ঠিক আগের সময়ের সামাজিক অবস্থা। অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক। অবশ্য হরপ্রসাদ শুরু করেছেন একটু আগে "৯৯৫ সালে সে দেখিল, ৩/৪ খেপে

তাহার লোকসানই হইয়াছে, লাভ হয় নাই।"[২৫] বাণিজ্যে লোকসান হওয়ার ফলে বিহারী দত্ত নিজেই বিদেশে বাণিজ্য করতে বের হলেন।

দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলার বণিকদের অবস্থা কেমন ছিল, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিই বা কতটা ছিল, সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে। বাংলার বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। "অষ্টম শতকের পর হইতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির পতন ঘটে।"[২৬] ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে বাঙালি ব্যবসায়ীরা দেশ-বিদেশের সঙ্গে যে ব্যবসা-বাণিজ্য করত তা অনেকটাই ব্যহত হয়। পরবর্তীকালে সপ্তগ্রাম ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বিহারী দত্ত সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ-এর অধিবাসী। সে বণিক। সাতগাঁ-এর গোলীন গ্রামের ঘাটে "বিহারী দত্তের শত শত ডিঙা বাঁধা থাকিত।"[২৭] তখন রূপা বাগদি "মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরম সৌগত শ্রী শ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ উপাধি লইয়া প্রবল - প্রতাপে সাতগাঁ শহর ও সপ্তগ্রামভুক্তি শাসন করিতেছেন।"[২৮] তিনি বৌদ্ধ। রাজা রূপা বাগদি এবং বিহারী দত্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি না হলেও সমসাময়িক অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র এই উপন্যাসে উপস্থিত।[২৯] বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই পথে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকগণ চলেছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের "…. ঐতিহাসিক বিষয় বলতে বুঝতেন দেশের রাজবৃত্তের কাহিনী। প্রশাসন কর্তৃত্বের শীর্ষতম পুরুষেরাই তাঁদের উপন্যাসের প্রধান পুরুষ। তাঁদের দৃষ্টি বিশেষ কালখণ্ডের আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় উত্থানপতনের কার্যকারণ সন্ধান করেছে। রাজকীয় পরিবেশের জমকালো বিবরণ এবং বীরত্বময় যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণে তাঁরা উপন্যাসের পরিসর ভরাট করেছেন। সেসব যুগের সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার শোভাযাত্রার আড়াল থেকে দু-এক জায়গায় আভাসিত হয়েছে মাত্র, কখনো প্রাধান্য পায়নি"।[৩০] কিন্তু হরপ্রসাদের এই উপন্যাসে জন-জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ এবং সমাজের খুঁটি-নাটি, রীতি- নীতি, আচার-আচরণবিধিও সেখানে পরিস্ফুট। হরপ্রসাদ উপন্যাসের "মুখপাত"-এ লিখেছেন, "'বেনের মেয়ে' ইতিহাস নয় ; সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞানসঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাইনা। 'বেনের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ-কালের কথা নেই। সব সেই কালের, যে কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।"[৩১] অর্থাৎ রাজবৃত্তের কাহিনি বা বিন্যাস *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে কখনোই মুখ্য হয়ে ওঠেনি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের বাংলার সমাজ চিত্র এই উপন্যাসে যথার্থই ফুঠে উঠেছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় *প্রবাসী* পত্রিকার ১৩৩০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় লিখেছিলেন, "তাঁহার 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস নহে, ইহা

ইতিহাসের এসেন্স, শর্করা-মণ্ডিত গুটিকা, পাঠ করিবার সময় নীলমণি চক্রবর্তী অথবা 'আর ডি বন্দ্যো'র গলাতেও সময়ে সময়ে আট্‌কাইয়া যায়। সহজিয়াবাদের এমন সুন্দর সুললিত ম্যানুয়েল আর নাই। যে কোনো বিদ্যালয়ে ইহা বৌদ্ধ দর্শনের পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে.... 'বেনের মেয়ে' ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের গীতাবলী আবিষ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কীর্ত্তিস্তম্ভমালার অন্যতম। ইহাতে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম আছে, একথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না।"[৩২]

রাখালদাস নিজে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন তার থেকে হরপ্রসাদের উপন্যাসের চরিত্র আলাদা। রাখালদাসের উপন্যাসে রাজবৃত্তের কাহিনিই মুখ্য। তাঁর *শশাঙ্ক* (১৯১৪) *ধর্মপাল* (১৯১৫), *করুণা* (১৯১৭) এবং *ধ্রুবা* (১৯২১)-তে গুপ্তসাম্রাজ্য ও পালরাজাদের সময়ের যে চিত্রাবলী ফুটে উঠেছে তা রাজবৃত্তের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস *রাজসিংহ* (১৮৮২), রমেশচন্দ্রের *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত* (১৮৭৮) রাজবৃত্তেরই কাহিনি, তবু এই সমস্ত উপন্যাসে ইতিহাস কতটা বিশ্বস্তভাবে ব্যবহৃত সে সংশয় ইতিহাস-সমালোচকদের মধ্যে আছে। আসলে, সেকালে, ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রাজবৃত্তের কাহিনি নির্ভর ছিল। এমন-কি হরপ্রসাদের প্রথম উপন্যাস *কাঞ্চনমালা*-তেও রাজবৃত্তের ছায়া ঘটেছে। অবশ্য সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাই বড়ো হয়ে উঠেছে। আর, তাঁর জনবৃত্ত নির্ভর শেষ উপন্যাস *বেনের মেয়ে*-তে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসে স্তর-বিন্যস্ত সামাজিক জীবনের ছবিই ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের কাহিনিতে রাজার যুদ্ধজয়ের আড়ম্বরপূর্ণ সংবাদ বিশ্লেষণ নেই, আছে সমাজে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য কে বা কারা নিয়ন্ত্রণ করে, কোন্ শ্রেণী সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে, সামাজিক -অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কী চেহারা নিয়েছে, বৃত্তিগত জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশে কী ভূমিকা নিয়েছে — এই সমস্তের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ *বেনের মেয়ে*-তে স্থান পেয়েছে। উপন্যাস হিসেবে রাখালদাসের স্বীকৃতি না পেলেও এর "ঐতিহাসিক সত্য-প্রচারের" উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা যায় নি।

বেনের মেয়ে উপন্যাসে হরপ্রসাদ যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশই অপ্রকাশিত পুথিপত্র। হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত চর্যাপদ, চর্যাপদের কবি, বাংলার বৌদ্ধ-সমাজ, হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখানো হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের বিলয় এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তির উত্থান। শুধু তাই নয়, পুরানো বাঙালি সমাজের সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং জনজীবনের টানাপোড়েন এই উপন্যাসে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। হরপ্রসাদ ইতিহাস বলতে জনসমাজের ইতিহাসই বুঝতেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র "বড় বড় জিনিসগুলিই

দেখিতেন; ভাল ও বড় জিনিসগুলিই দেখিতে চাহিতেন, বাছিয়া লইতেন। তাই তাঁহার বইয়ে দুঃখী গরীবের স্থান নাই; যাহারা খেটে খায় তাহাদের স্থান নাই। তাঁহার সকল নায়ক-নায়িকাই বড় মানুষ। অভাবের তাড়নায় ক্লেশ পায় না।''[৩৩] কিন্তু হরপ্রসাদ চিন্তাধারার দিক থেকে একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত। *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে সমস্ত স্তরের মানুষের উপস্থিতিই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ''রূপা-রাজার বৌদ্ধরাজ্য নাশ ও হরিবর্মার হিন্দুরাজ্য স্থাপন হইয়া গেল।''[৩৪] কিন্তু রাজবৃত্তের কাহিনি এখানে প্রাধান্য পায়নি। হিন্দুধর্মের নেতৃস্থানীয় এবং ঐতিহাসিক চরিত্র ভবদেব ভট্ট নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজে নতুন নতুন বিধান দিলেন যাতে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। উচ্চ ও নিম্নবর্গ উভয় স্তরের মানুষকেই এই বিধানের বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করা হল এমনভাবে যাতে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্যের একটা সীমারেখা টানা যায়। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ভবদেব বিধান দিচ্ছেন —

১. ''....সব কাপড়েই ভাতের মাড়। নীচ জাতির এঁটো ছুঁয়ে অশুচি হইতে হয়। তাই আমরা রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের গ্রামে জাত-তাঁতি বসাইয়া কাপড়ে খই-এর মাড় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যুগির কাপড় একেবারে পরি না স্পর্শও করি না।....

''আপনারা যদি মনে করেন, শুচি কাপড়ই চলিবে, অশুচি কাপড় চলিবে না, যাহারা যুগির কাপড় পড়িয়া জল আনিবে, তাহাদের জল লইবেন না বা স্পর্শ করিবেন না, ইহাতেই তাঁতির কাপড় চলিয়া যাইবে।

২. ''এখানে ঘানির মুখে চামড়া দেওয়া থাকে, চামড়ার ঠোঙা বাহিয়া তেল একটি কলসিতে পড়ে। চামড়ার স্পর্শে সে তেল অশুচি হয়। সে তেল কিছুতেই মাখা উচিত নয়। আমরা ব্রাহ্মণের গ্রামে বন্দোবস্ত করিয়াছি, একটা কাঠের কেট্‌কোর ঠিক মাঝখানে ছিদ্র করিয়া ঘানিটি তাহাতে খুব আঁট করিয়া বসানো হয়। ঘানি বাহিয়া তেল একটি কলসিতে তুলিয়া রাখা হয়। যাহারা এইরূপ পবিত্রভাবে তেল তৈয়ারি করিবে, আমরা তাহাদেরই জল আচরণ করিব।

৩. ''রাঢ় দেশের জঙ্গলে একদল খেউরি করা লোক আছে, তাহাদের দ্বারাই বাঙালি বৌদ্ধেরা কাজ চালাইয়া লইয়া থাকে। ভিক্ষুরা চেষ্টা করে নিজে নিজে কামাইতে, কিন্তু সবসময় পারিয়া উঠে না। এই নাপিতেরা তাহাদেরও খেউরি করিয়া থাকে। কিন্তু এক বিষম সমস্যা আছে — এই নাপিতেরা সকলেই কাকের মাংস খায়। সুতরাং উহাদের স্পর্শ করিতে নাই, জল আচরণ করিতে নাই, উহাদের হাতে কোনো কাজ লওয়া ব্রাহ্মণের উচিত নয়; সুতরাং নাপিত আনাইতে হইয়াছে।

৪. ''এখানকার গোয়ালারা খুব প্রবল, দলেও খুব পুরু; কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার ভালো নয়।... তাহাদের স্বভাব এত খারাপ যে, তাহারা দুধে জল না দিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের জল আচরণ করা ব্রাহ্মণের কোনো মতেই উচিত নয়। ব্রাহ্মণের গ্রামে

সেইজন্য আমরা সদ্‌গোপ নামে আর-একটা গোপজাতির সৃষ্টি করিয়াছি।... তাহারা অনেকটা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে শিখিয়াছে, ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার শিখিতেছে।

৫. "শিক্ষা পাইয়া অনেক জেলে ছেলে হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে আমাদের দলে লইয়া আসা কিছু কঠিন। কারণ, ইহাদের সঙ্গে কোনোরূপ আচার-ব্যবহারই আমাদের চলিবে না। কিন্তু বৌদ্ধদের হাত হইতে উহাদের উদ্ধার করিতে হইবে। নইলে বৌদ্ধেরা এই ছেলেদের লইয়াই প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া বসিবে।"[৩৫]

এই যে সমাজ-জীবনে বৃত্তিকে কেন্দ্র করে বিবর্তন ঘটিয়ে দেওয়ার উদ্যম ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর নেতৃত্বে দেখা গেল সেটাই ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজবৃত্তের কাহিনি এ উপন্যাসে গৌণ হলেও বৌদ্ধ রাজা থেকে হিন্দুরাজার হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর সামাজিক স্তরের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। হরপ্রসাদ এ বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষিত হয়েছে দশম-একাদশ শতাব্দীর বাংলার লৌকিক জীবন।

এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদান ও নানা ধরনের তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর আবিষ্কৃত চর্যাপদ এবং বৌদ্ধপুথিগুলি থেকে। চর্যাপদের লুইসিদ্ধা এই কাহিনির একটি চরিত্র। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি। তা ছাড়া ভবদেব ভট্ট, শ্রীহর্ষ, আর্য ক্ষেমীশ্বর, রত্নাকর শান্তি, উদয়নাচার্য প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে তিনি এই উপন্যাসে সঙ্গতভাবেই হাজির করেছেন।

বেনের মেয়ে উপন্যাসের শেষপর্বে দেখা যাচ্ছে, "পরম শত্রু দরজায় ঘা দিতেছে। ইহারা আসিলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ হইয়া যাইবে। এখন একমনে একপ্রাণে যাহাতে উহাদের হটাইতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।"[৩৬] পরম শত্রু বলতে মুসলমান আক্রমণকারীদের কথাই বলা রয়েছে।

বেনের মেয়ে উপন্যাসে সামাজিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত চিত্র ফুটে উঠেছে।

২

সৃজনধর্মী সাহিত্য রচনার পাশাপাশি হরপ্রসাদের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে নিরন্তর অনুসন্ধান নতুন দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতা বা অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে তাঁর গবেষণার সাহায্য নিতে হয় প্রতিনিয়ত। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি অনেকটাই পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। তবু তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, "'ভাষাতাত্ত্বিক' বলতে আমরা যা বুঝি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঠিক তা ছিলেন না। ভাষার কোনো সার্বজনিক বা সার্বভূমিক 'তত্ত্ব' তিনি পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজকে উপহার দেননি।"[৩৭] ভাষার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানই তাঁর মূল লক্ষ্য। এই অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক

কাল ও তার নানা সমস্যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁর ভাষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার মূলে মানুষ, মানুষের সমাজ এবং তার ইতিহাস। "ভাষার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান জন্মেছে পুরাতত্ত্ব চর্চা থেকে।"[৩৮] সেই জ্ঞান সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

ভাষার প্রাচীনত্ব আবিষ্কার ও প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই যে হরপ্রসাদ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তা নয়, তবে বৌদ্ধপুথির খোঁজে তিনি নেপালে যান (১৯০৭) এবং সেখান থেকে ভাষা ও সাহিত্যের তিনখানি অভিনব পুথি পান। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এই তিনটি হল— ১. *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*, বৌদ্ধগানের সংগ্রহ; ২. কৃষ্ণাচার্যের *দোহাকোষ* এবং ৩. সরোরুহ বজ্রের *দোহাকোষ*। এর আগে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ডাকার্ণব পুথি। এগুলি একত্রিত করে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (অর্থাৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান* ও *দোহা* নাম দিয়ে প্রকাশিত করেন। বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চারখানি পুঁথির মধ্যে *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*-এর বিশেষ স্থান আছে।"[৩৯] *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*-এর ভাষাকে হরপ্রসাদ হাজার বছরের পুরানো বাংলা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এবং বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তাঁর এই অভিমত ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার যে উপকরণ তিনি পেয়েছিলেন তার যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন। নিছক ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কিংবা প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হন নি। ভাষা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সামাজ-ধর্ম-কালকে বুঝতে চেয়েছেন; দেখিয়েছেন বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য। সিদ্ধাচার্যদের গানগুলিকে বাংলা বলার পিছনে তিনি যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন, সিদ্ধাচার্য্যরা বাঙালি ছিলেন। ১২ আষাঢ় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'সভাপতির অভিভাষণে' বলেন, "অনেকে বলেন যে, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি বাংলা নয়। কেহ বলেন উহা অপভ্রংশ ভাষা, কেহ বলেন, উহা প্রাকৃত, কেহ বলেন, উহা বৌদ্ধ প্রাকৃত; আবার একজন আছেন; তিনি বলেন, উহা ভাষাই নয়; নানা ভাষা হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া কোনো রকমে সাজাইয়া দিয়াছে মাত্র। ... আমি বলি, তা হয় হউক; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু লুই বাঙালি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহার চেলারাও অনেকে বাঙালি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কালে বাংলাদেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ প্রাকৃতই বলো, প্রাকৃতই বলো, অপভ্রংশই বলো, আর যা-ই বলো; ওটা তো নাম দেওয়া মাত্র। আমি না-হয়, বাংলাদেশের ভাষাকে বাংলা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কী?"[৪০] কিন্তু *হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধ গান* ও *দোহা*-তে ডাকার্ণবের "কিছু কিছু লেখা আছে"[৪১] সেগুলি সম্পর্কে হরপ্রসাদ পরবর্তীকালে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে "সে ভাষাটা বাংলা একেবারেই নয়।" [৪২] *প্রাচী* (শ্রাবণ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডাক ও

খনা' প্রবন্ধে তিনি প্রচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের কাল ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। খনা ও ডাকের প্রবচনগুলি ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন, খনা মধ্যযুগের বাঙালি মেয়ে এবং ডাক পূর্ব বাংলার লোক। বাঙালির লোকাচার ও সংস্কৃতির পরিচয় তাঁদের রচনায় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ডাকার্ণব এবং বাংলার ডাক ভিন্ন ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, খনা সম্পর্কেও তিনি নতুন তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রচলিত বিশ্বাস : "খনা বরাহমিহিরের পুত্রবধূ। ...তিনি [বরাহমিহির] আপনাকে আবন্তক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবন্তক বলিলে অবন্তীদেশের লোক বুঝায় অথবা একজাতীয় ব্রাত্য ব্রাহ্মণ। .... তাঁহার পুত্রের নাম পৃথুযশ। তিনিও একজন বড়ো জ্যোতিষী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নাম বরাহমিহির । আমাদের খনার শ্বশুরের নাম বরাহ, স্বামীর নাম মিহির। ....অবন্তীর বরাহমিহিরের সহিত খনার সম্পর্কটা ঠিক নয়। তিনি বাংলা দেশেরই মেয়ে।"[৪৩] হরপ্রসাদের এই সিদ্ধান্ত বাংলার ইতিহাসে প্রয়োজনীয় সংযোজন। খনার বচনগুলি "যে কবে লেখা হইয়াছে তাহাও বলা যায় না কিন্তু ভাষা যেরূপ চোস্ত, বেশি দিনের বলিয়া মনে হয় না ।"[৪৪]

তিনি বচনগুলির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন : তাতে অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি "বাঙালির মেয়েও বটে, আর মুসলমান আমলের মেয়েও বটে।"[৪৫] এই বচনগুলি থেকে মধ্যযুগের বাংলার একটি সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে। ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ একটি দেশের সামাজিক ইতিহাস উদ্ঘাটনে সহায়ক হতে পারে তা হরপ্রসাদের রচনায় পরিস্ফুট। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে *বিভা* পত্রিকায় তিনি 'মুসলমানি বাংলা: শুজ্জু উজাল বিবির কেচ্ছা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি মুসলমানি বাংলার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে লিখেছেন, "উহা [মুসলমানি বাংলা] বাংলা ভাষায় একটি অবান্তর ভাগ মাত্র। মুসলমান লেখক যে জেলায় বাস করেন, সেই জেলার অনেক প্রচলিত কথা তাঁহার গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয়। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উর্দু, আরবি ও পারসি মিশ্রিত হইয়া থাকে।"[৪৬] শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, "মুসলমানি বাংলার ছত্রগুলি বামদিক হইতে ডান দিকে যায়। কেবল কেতাবখানি আমরা যাহাকে শেষ দিক বলি, সেই দিক হইতে আরম্ভ হয়। মুসলমানি বাংলাগ্রন্থ অধিকাংশ কলিকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহ জেলারও কোনো কোনো স্থানে মুসলমানি বাংলার ছাপাখানা আছে।"[৪৭] হরপ্রসাদ নিজেই বলেছেন, "বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ।"[৪৮] হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের এই দেশের প্রতি টান কিছু মাত্র কম নয়। ভাষা এবং লিখন পদ্ধতির তারতম্য থাকলেও উভয় সম্প্রদায়কে সামাজিক দিক থেকে আলাদা করে দেখার কোনো কারণ নেই। প্রসঙ্গত মীর মশারফ্ হোসেনের *গো-জীবন* (১৮৮৯) বইটির বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তিনি সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে গোরু সংরক্ষণের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন, গো-রক্ষা আন্দোলন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও বাংলার হিন্দুদের মধ্যে

তেমন কোন উৎসাহ দেখা যায় নি এবং হিন্দুদের রচনায় বিষয়টি সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। এ বিষয়ে মুসলমান লেখকদের লেখা দুটি বই পাওয়া গেছে তার মধ্যে মশারফ হোসেনের *গো-জীবন* বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেখানে তিনি ভারতের এই উপকারী জীবটির জীবন রক্ষার জন্য মানবিক নীতির পক্ষে সওয়াল করেছেন।[৪৯]

মীর মশারফ্ হোসেনের রচনায় অসাম্প্রদায়িক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তন পরিস্ফুট। কিন্তু তাঁর রচনায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার ও ভাষা বিন্যাসের পিছনে সমাজতাত্ত্বিক কারণ অন্বেষণের যথেষ্ট সুযোগ আছে। তবে একথা তো বলা যেতেই পারে যে, তাঁর ধর্মবোধ, হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি এবং "*still a staunch Muhammadan*",[৫০] তাঁর সামাজিক অবস্থান ও প্রেক্ষিত ভাষাকে প্রভাবিত করেছে।

বাংলা গদ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ সময় অর্থাৎ কাল ও সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। বুঝতে চেষ্টা করেছেন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত। তাঁর মতে মধ্যযুগে বাংলা গদ্য অপেক্ষা বাংলা পদ্য ছিল অনেকটাই সাধারণ মানুষের কাছাকাছি ভাষা। কারণ, "....বাংলা পদ্য কোনো কালেই পণ্ডিতের জন্য লেখা নয়। বৌদ্ধরা ধর্ম প্রচারের জন্য লিখিত, হিন্দু কবিরাও ধর্ম প্রচারের জন্য লিখিত, সুতরাং যাদের কাছে প্রচার করিবেন, তাদের ভাষায় লিখতে হত। ..... বাংলা গদ্যের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। উহার উৎপত্তি ইউরোপীয় মিশনারিদের হাতে — উঁচু নিচু, এবড়ো থেবড়ো এক রকম ফিরিঙ্গি বাংলা বললেও হয়। তারপর সে বাংলা ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে। সেটা হল সংস্কৃতের গণ্ডি। তার ভাবও সংস্কৃত, ভাষাও সংস্কৃত। ইহার পরের বিকাশ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের হাতে। কিন্তু সে ভাষা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে' না।"[৫১]

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের ব্যাপক চর্চার সূত্রপাত। ইংরেজি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলা গদ্যকে বাংলা ভাষা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন হরপ্রসাদ। "ইংরাজি বাংলাটাই শেষ ইংরাজি-শিক্ষিত মহলে বড়োই চলিয়া গিয়াছে।"[৫২] হরপ্রসাদের অভিযোগ, ইংরাজি-শিক্ষিত "ব্রাহ্মসমাজের ভাষায় এই দোষ অত্যন্ত বেশি।"[৫৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কটাক্ষের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজ নয়, তাদের ইংরেজি-নির্ভর ভাষা; শুধু ব্রাহ্মরা নয়, সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের বাংলা গদ্যে কৃত্রিমতা লক্ষণীয়। হরপ্রসাদ বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এই সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে সাহিত্য শাখার লেখাগুলির একটি ভূমিকা লিখতে গিয়ে হরপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন, "ইংরাজি শিক্ষার প্রাদুর্ভাব এবং বাংলা শিক্ষার অভাবে সেকালের সুপ্রচলিত অনেক বাংলা কথা এখন উঠিয়া যাইতেছে এবং তাহার বদলে যে সকল কথা গড়া হইতেছে সেগুলি না শুনিতে মিষ্ট না মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ। পণ্ডিত মহাশয়েরা পারসি শব্দ ব্যবহার করিতে চান না, তাহাতে কতকগুলি আভাঙা সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ঢুকিতেছে। .... যাঁহারা

ইংরাজিতে ভাবেন তাঁহারা ইংরাজি কথার তর্জমা করিতে গিয়া নানা অলৌকিক শব্দের সৃষ্টি করিয়া বসেন।"[৫৪] হরপ্রসাদের এই বক্তব্য তাঁর 'নূতন কথা গড়া' (*বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "কাচ ভঙ্গপ্রবণ"-এর বদলে ভঙ্গুর বা ঠুন্‌কো, "দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান"-এর অর্থ "উপত্যকার" পরিবর্তে "দুন", *observatory* -র তর্জমা "পর্যবেক্ষণিকা"র জায়গায় "মানমন্দির" বা "তারাঘর" — হরপ্রসাদের কাছে অনেক বেশি উপযুক্ত মনে হয়েছে।[৫৫]

বাংলা ভাষায় শব্দ ব্যবহার থেকে বাক্য গঠন-রীতি পর্যন্ত নানা রকমের বৈপরিত্য লক্ষণীয়। বাংলা ভাষার প্রকৃত চেহারা কী সে সম্পর্কে হরপ্রসাদ সুন্দরভাবে ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা করেছেন ১২৮৮ বঙ্গাব্দের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধে। তাঁর একই মত আবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের *নারায়ণ* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা "তীর্থভ্রমণে"। এই রচনাটি একটি গ্রন্থ সমালোচনা। যাইহোক, প্রচলিত তিন ধরনের বাংলা ভাষা সম্পর্কে হরপ্রসাদ একটি তত্ত্ব দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিন প্রকার বাংলা ভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত তাঁহাদের বাংলায় অনেক উর্দু শব্দ মিশানো থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহু-সংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাংলায় উর্দু ও সংস্কৃত দুই মিশানো থাকিত। কবি ও পাঁচালিওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিষয়ী লোক, ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিন রকম বাংলা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাংলা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাংলা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত।"[৫৬] বিষয়ী বাংলায় অনেক উর্দু-পারসি শব্দ ব্যবহৃত হতো। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, আদালতের ভাষাই এর মূলে। উর্দু-আরবি-পারসি শব্দ সমূহ বাংলা ভাষায় জাঁকিয়ে বসেছে। সেকালে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে, পণ্ডিতি ও বিষয়ী ভাষা-লেখকদের মধ্যে ভাষার চরিত্র রক্ষার জন্য দ্বন্দ্ব, বিতর্ক এবং টানা-পোড়েন লক্ষ করা গেছে। সংস্কৃত পণ্ডিতগণের বাংলা ভাষা সংস্কৃত শব্দ বহুল। তাঁদের "সংস্কার বাংলাভাষা সংস্কৃতের কন্যা।"[৫৭] কিন্তু হরপ্রসাদের সিদ্ধান্ত : "সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অনেক দূর।"[৫৮] সংস্কৃতের পথে আর বাংলা চলে না। বাংলার গতি পরিবর্তিত হয়েছে, তাকে উল্টো দিকে চালনা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, "সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাংলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে-সব জিনিস বাংলার হাড়ে মাসে জড়িত রহিয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে যেমন বদলাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোনো ভাষাকে সেরূপ পারে নাই।"[৫৯]

বাংলা ভাষা সম্পর্কে হরপ্রসাদের মতামত স্পষ্ট। এবং সম্পূর্ণভাবেই তিনি

সংস্কার মুক্ত। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি তথাকথিত উঁচু-নিচু স্তরের মানুষের ভাষা, সংস্কৃত-আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা প্রভৃতির ছুৎমার্গ দূর করার পক্ষে ছিলেন। ভাষা আপন গতিতে তার পথ তৈরি করে নেয়। কিন্তু এই 'আপন গতি'র পিছনে একটা সামাজিক প্রেক্ষিত থাকে। হরপ্রসাদ ভাষা-বিষয়ক আলোচনায় এই পরিপ্রেক্ষিতটিকেই বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তিনি "খাঁটি বাংলা" বলতে বাঙালির ভাষা-সাহিত্য- সংস্কৃতিকেই বুঝিয়েছেন। এখানে বাঙালির মৌলিকতা আছে। রূপ ও প্রকৃতিগত দিক থেকে আর্য-ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও বাঙালি জীবন-সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক খুবই কম। এবং হরপ্রসাদ বাঙালির মধ্যে আর্যত্ব কতটা আছে সে বিষয়ে বৃথা সময় নষ্ট করেন নি। "…. মোহমুক্তভাবে তিনি বাঙালির জীবন-প্রকৃতির যাবতীয় অভিব্যক্তির মূলে এখানকার আদি জনবৃত্তের বনিয়াদটি সত্য বলে মেনে নেন।"[৬০] তাই আর্য ধর্ম-সংস্কৃতি ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে "যখন বাংলায় আসিয়া উপনীত হইবে তখন দেখা যাইবে আর্যের মাত্রা বড়োই কম, দেশীয় মাত্রা অনেক বেশি।"[৬১] বহু ভাষা সংমিশ্রণে বাংলা ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যিক উপাদান থেকে তিনি বাংলা ভাষার স্বকীয়তা, প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর থেকে বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। ১৩২০ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে হরপ্রসাদ বলেন, অতি প্রাচীন বাংলা ভাষায় কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়া পাইয়াছি; তাহার অনেক *idioms* বাংলাতেই আছে, অন্য দেশে নেই। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙালির লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই"।[৬২]

শুধু তাই নয়, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য- বৌদ্ধ-ইসলাম ও লৌকিক সমাজের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এই সমস্ত স্তরের নানা উপাদানের উপর ভিত্তি করে হরপ্রসাদ বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সাহিত্য আলোচনায় সমাজ, কাল এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনার উদ্দেশ্যে পুথি আবিষ্কার এবং পুথি নিয়ে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কাজ করেছেন। এ কাজের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছ থেকে। পুথি নিয়ে তাঁর প্রথম কাজের জায়গা এশিয়াটিক সোসাইটি, পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। তাছাড়া কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়াও, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি অনেক পুথি উদ্ধার করেছেন এবং দেখেছেন। পুথির তালিকা তৈরি করেছেন, লিখেছেন সেগুলির বিস্তৃত ভূমিকা। তাঁর সম্পাদিত *ক্যাটালগ অব পাম-লিফ্ অ্যান্ড সিলেক্ট পেপার ম্যানাস্‌ক্রিপ্টস্ টু দ্য দরবার লাইব্রেরি, নেপাল*; *ক্যাটালগ*

অব ম্যানাসক্রিপ্টস্ ইন দ্য বিশপ কলেজ লাইব্রেরি, ক্যালকাটা; *এ ডেসক্রিপ্টিভ ক্যাটালগ অব স্যানসক্রিট ম্যানাসক্রিপ্টস্ ইন দ্য গভর্নমেন্ট কালেকশন আন্ডার দ্য কেয়ার অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* ; *নোটিশেস অব স্যানসক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্টস* প্রভৃতি পুথি পরিচয় ও চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া তাঁর *রিপোর্ট অন দ্য সার্চ অব স্যান্সক্রিট ম্যানাসক্রিপ্টস্ ১৯০১-০২ টু ১৯০৫-০৬* ; *রিপোর্ট অন দ্য স্যান্সক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্টস্ ১৯০৬- ০৭ টু ১৯১০-১১* ; *রিপোর্ট অন্ এ ট্যুর ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয় ইন সার্চ অব ম্যানাস্ক্রিপ্টস্ বার্ডিক ক্রনিক্লস* ; *প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অন দ্য অপারেশন ইন সার্চ অব ম্যানাস্ক্রিপ্টস্ অব বার্ডিক ক্রনিক্লগুলি* থেকে আমরা পুথির জগতের অনেক তথ্য জানতে পারি। *ক্যাটালগ* এবং *রিপোর্টগুলি* থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, বিদ্যাপতির *কীর্তিলতা*, আনন্দভট্টের *বল্লালচরিত*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*, গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজের *অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ* সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই সমস্ত গ্রন্থ সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এবং এগুলি ইতিহাসের আকর গ্রন্থ হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে। এই আকরগুলি তাঁকে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগোতে সাহায্য করেছিল। তাঁর কর্মধারা থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে, তিনি সামাজিক ইতিহাসের মূল সূত্রের অনুসন্ধান করেছেন তাঁর উপরিউক্ত কাজগুলির মধ্যে দিয়ে। এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ও অভিভাষণগুলি পড়লে স্বভাবতই মনে হবে, তিনি বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রস্তুত করতে সচেষ্ট। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্য এবং ধর্ম ও দর্শনের পুথির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তাঁর ইতিহাস-বোধ আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পুথি ব্যবহারে তিনি রাজেন্দ্রলালের উত্তরসূরী। রাজেন্দ্রলাল মারা যাওয়ার পর তিনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'ডিরেক্টর অব দি অপারেশন্স ইন সার্চ অফ ম্যানাস্ক্রিপ্ট' হন। এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি সরকার তরফে পুথি পরীক্ষার জন্য নেপাল রাজার দরবারে যান। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখেছেন, "এই স্থানে তিনি কতকগুলি বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার পুঁথির সন্ধান পান। এখানকার পুঁথিগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকারীদিগের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।"[৬৩]

পুথির আকর্ষণে হরপ্রসাদ বারবার নেপাল গেছেন। উদ্দেশ্য ছিল সেই সমস্ত পুথি থেকে প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা। ব্রায়ান হটন হজ্সন নেপাল থেকে যে সমস্ত পুথি সংগ্রহ করেছিলেন তার একটা বড়ো অংশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। সেই সমস্ত সংগৃহীত পুথি পরীক্ষা করে হরপ্রসাদের ধারণা হয়েছিল নেপালে অনুসন্ধান চালালে উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব। এবং এই উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেই নিহিত আছে সামাজিক ইতিহাসের বীজ। তাই তিনি অনুসন্ধানের প্রয়াসে ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০৭

এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মোট চারবার নেপাল গেছেন। সেখান থেকে তিনি প্রচুর পরিমাণে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সেই সংগ্রহ থেকে বাংলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজের সমাজিক আচার আচরণ ও নিয়ম শৃঙ্খলার যে তথ্যগুলি পাওয়া গেছে সেগুলিকে হরপ্রসাদ তাঁর সৃজনী-প্রতিভার দ্বারা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নেপালের বৌদ্ধধর্মে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করেছেন। এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি ''বাংলার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম'' তত্ত্ব তৈরি করতে তাঁকে সাহায্য করেছে।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ নেপাল রাজার দরবার থেকে *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় চর্য্যাগীতি* আবিষ্কার করেন। দরবার লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান সুপণ্ডিত বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারী চর্যাপদের তালপাতার পুঁথি হরপ্রসাদকে দেন। হরপ্রসাদ তাঁকে বলেন যে, ঐ পুথি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক উন্মোচনে সাহায্য করবে।[৬৪]

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় আবিষ্কারের আগে হরপ্রসাদ এবং সিসিল বেন্ডাল নেপালে *সুভাষিত সংগ্রহ* ও *দোহাকোষ পঞ্জিকা* নামের দুটি পুথি দেখেছিলেন। বেন্ডাল *সুভাষিত সংগ্রহ* পুথিটি সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। কিন্তু *দোহাকোষ পঞ্জিকা* পুথিটির কপি হারিয়ে যায়। হরপ্রসাদ নেপাল থেকে আরও দুটি দোহাকোষের পুথি পেয়েছিলেন — একটির রচয়িতা সররুহবজ্র এবং এর টীকাকার অদ্বয়বজ্র, অপরটির রচয়িতা কৃষ্ণাচার্য। এই পুথি দুটিতে বাংলার প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* গ্রন্থে তেত্রিশ জন পদকর্তা বা কবির পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের কবিতাগুলি বাংলার সহজিয়া বৌদ্ধদের গুহ্য সাধনতন্ত্রের গান। গানগুলি আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। হরপ্রসাদ আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদকে অন্যতম কবি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে লুই ছিলেন রাঢ়-বঙ্গের মানুষ। তেঙ্গুরেও তিনি বাঙালি হিসেবে উল্লেখিত। লুই সংস্কৃতে চারটি পুথি রচনা করেছিলেন, যথা— *বজ্রসত্ত্বসাধনা, বুদ্ধোদয়, শ্রীভগবদভিসময়* এবং *অভিসময়বিভঙ্গ*। বাংলায় লেখা তাঁর *লুইপাদ-গীতিকা সঙ্কীর্তন পদাবলী* নামেও পরিচিত। আর-একজন কবি সররুহ বা সরহের পরিচয় পাওয়া যায়। সরহের বক্তব্য তাঁর নিজের লেখাতে পরিস্ফুট। তিনি আস্তিক্যবাদী, ক্ষপণক এবং শ্রমণদের সাধন-পদ্ধতি সম্পর্কে আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি সহজধর্ম বা সহজপন্থার প্রচারক ছিলেন। তাঁর মতে সহজপন্থাতেই মানুষের ধর্মীয় মুক্তি আসবে। সরহের মতোই কবি কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদও ছিলেন সহজপন্থী। তিনি বৌদ্ধতন্ত্রের বই লিখেছেন। হরপ্রসাদ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে চর্যাপদের কবিরা বাঙালি ছিলেন এবং তাঁরা বাংলা ভাষায় গান রচনা করেছেন।[৬৫] প্রবোধচন্দ্র বাগচী সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিয়ে চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই গানগুলি বাংলাভাষাতেই লেখা।[৬৬] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বের বিচারে চর্যাপদকে প্রাচীন বাংলায় লেখা গান বলেছেন।[৬৭] কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই তত্ত্ব রাহুল সাংকৃত্যায়ন মানেন নি।[৬৮]

চর্যাপদগুলি প্রধানত মহাযানীদের রচনা। হরপ্রসাদ বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উত্থান, প্রসার ও পতন সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম কিভাবে বজ্রযান, মন্ত্রযান এবং সহজযানে রূপান্তরিত হয়েছে। তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান পরবর্তী বৌদ্ধধর্মকে প্রভাবিত করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারত ধর্মানুশীলনের অন্যতম প্রধান, বিশেষ করে গুহ্যধর্মাচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। হরপ্রসাদ তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যাবলী দিয়ে প্রমাণ করেছেন, ক্রমশ মহাযানী পন্থা মানবিক মূল্যবোধগুলি হারিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতের ফলে সমাজ তার গতি হারিয়েছে। মুসলমান আগমনের কাল পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে সমাজকে প্রভাবিত করে, সেগুলি ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজ গ্রাস করে ফেলে। এই সামাজিক ও ধর্মীয় বিবর্তনের বিষয়টি হরপ্রসাদ তাঁর উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৬৯]

অষ্টম শতাব্দী থেকে একদল বাঙালি তন্ত্র-চর্চা করতেন। এই তন্ত্র চর্চা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল — ১. শৈব নাথপন্থ এবং ২. বৌদ্ধ সহজযান পন্থা। এদের মধ্যে গুরুতর কোনো দার্শনিক মতভেদ ছিল না। যাইহোক, তান্ত্রিকরা অ-সামাজিক জীবন যাপন করত। সহজযানীরা দেহ বা কায়ার উপাসনা করতেন এবং তাঁদের সাধনায় প্রয়োজন হত সাধন-যোগিনী অথবা অবধূতি। উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের শাখা সহজযান ছিল বস্তুতপক্ষে তন্ত্র-আচার সর্বস্ব। চর্যাগীত থেকে সহজযান সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য পাই। পদগুলি প্রাচীন বাংলায় লেখা এবং এই পদগুলির দুটি অর্থ — ১. সহজ আক্ষরিক অর্থ এবং ২. গোপন ও গূঢ় ধর্মতত্ত্ব যা ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুরূহ।

দর্শন ও ধর্মচর্চা ছাড়াও চর্যাপদের কবিগণ তাঁদের রচিত সাহিত্যে বাঙালি সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। ফুটে উঠেছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবন-চর্যা ও সামাজিক রীতি-নীতি। সে সময়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজের গুরুত্ব তেমন ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সমাজের পার্থক্য খুব কঠোরভাবে মানা হতো না। অবশ্য বাংলায় বৌদ্ধদের একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু "... the power of the Brahmin community as a whole was based on no less on social foundations of economic prosperity than on their intellectual superiority and devotion to religious pursuits."[৭০] পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনাটা ছিল সেখানেই। অবশ্য পারস্পরিক প্রভাবও যে একেবারে পরিলক্ষিত হয়নি তা নয়। কখনো কখনো ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বাড়তে থাকে। হরপ্রসাদের মতে, "...the Brahmin gradually became dominant element in the socio-economic life in ancient Bengal from the earliest times to about the end of the 13th century."[৭১] পাল রাজত্বকাল থেকেই দেশের মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পড়তে থাকে। পাল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ধর্মপাল " extended his patronage to Brahmins in conformity with the customary practice."[৭২] অপর পক্ষে পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের বিকাশ

এবং বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করেছেন। এই সময় " a good number of Tantric scholars of Buddhism"[৭৩] প্রাধান্য অর্জন করেন "and many of the authors of the Dohas and Caryas probably flourished during this time."[৭৪]

চর্যাপদে সমাজ-জীবন চিত্রিত হয়েছে। পদকর্তাগণ গুহ্য-সাধনতত্ত্ব এবং তাঁদের দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। দেখা যাচ্ছে ডোম্বী গঙ্গা ও যমুনার মাঝি। নৌকো রূপক, প্রতীক। শান্তিপদ, সরহপাদ প্রমুখ পদকর্তা বা কবিদের রচনায় ফুটে উঠেছে গ্রামের মাঝিদের সুন্দর, বাস্তব, পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবন-চিত্র। কম্বলাম্বরপাদ একজন কবি তিনি নৌকা পারাপারের বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচনা থেকে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি। "সোনে ভরিতি করুণা নাবি, রূপা থোয়ি নাহিক ঠাবি।" (আমার নৌকো সুবর্ণে পূর্ণ, এখানে রুপো রাখার জায়গা নেই।) বাঙালি বণিকরা প্রায়ই বাংলার বাইরে যান এবং তাঁরা সেখানে অনেক উপার্জন করেন। বাংলা কৃষি-নির্ভর দেশ। সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় বেশ সুখেই কালাতিপাত করতেন। "পুত্ত পবিত্ত ধন ভত্তি কুটুম্বিনী সুদ্ধমন, হক্ক তরাসি বিচ্চগণ কো কর বব্বর সগগমন।" (স্ত্রী-পুত্র, স্বজন এবং সম্পদ ছেড়ে কেউই স্বর্গে যেতে চান না)। অপর পক্ষে, দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। ধনী গৃহে অনুষ্ঠিত উৎসবে দরিদ্রেরা যোগ দিতেন । এইভাবে তাঁরা তাঁদের দারিদ্র ও দুঃখ ভুলতে চাইতেন।

বৌদ্ধ সহজিয়ারা ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করত সহজপন্থায়। তারা সাধনার ক্ষেত্রে জটিল পন্থা অবলম্বন করত না। চর্যাপদে দেখা যায়, যে সমস্ত ধর্মীয় শাখা ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক এবং জটিল পথ অবলম্বন করে তাদের সহজিয়া সিদ্ধাচার্য ও পদকর্তাগণ তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বৈদিক ধর্ম এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে গেছেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলায় বৈদিক ধর্মের সূত্রপাত হয় গুপ্ত শাসনকালে। অভিজাত হিন্দু পরিবারগুলো যাগ্-যজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদনের জন্য পশ্চিম ভারত থেকে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে আনিয়েছিলেন। কিন্তু বাইরে থেকে আগত ব্রাহ্মণরা এখানে প্রতিষ্ঠা পায়নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির প্রতি পদকর্তাগণ বিদ্বেষ পোষণ করতেন। আবার জৈনরা মোক্ষ লাভের জন্য নগ্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। বিরোধিতা করতেন সহজিয়াপন্থিরা। সরহ বলেছেন, "জয়ি নগ্‌গ বিয়া হোই মুক্তি সুনহ সিয়ালহ" (যদি নগ্নতাই মোক্ষ আনে তবে পশুরাও মোক্ষ পেতে পারে)। সহজিয়ারা শুধু ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে তাই নয়, তারা জৈন এবং বৌদ্ধদের বিভিন্ন শাখারও বিরোধিতা করেছে। তাদের ধ্যানে বিশ্বাস ছিলো না।

সহজিয়া যোগীদের মধ্যে অনেকেই তন্ত্র মতে উপাসনা করত। তারা মহাসুখ প্রাপ্তির আশায় কাপালিক হওয়ার চেষ্টা করত। জাগতিক সুখ-স্পৃহার জন্য তাদের মধ্যে এসেছে যৌন বিকৃতি। যোগী কাহ্ন একজন কাপালিক। তিনি তাঁর শাশুড়ি এবং শ্যালিকাকে

হত্যা করে ডোম্বীর সঙ্গে মিলিত হতে চাইছেন। ডোম্বীর জন্য তিনি তাঁর পরিবারকে পরিত্যাগ করেছেন। আবার ভুসুকুপাদ লিখেছেন, তিনি চণ্ডালী স্ত্রী গ্রহণ করে বাঙালি হয়েছেন। অর্থাৎ মহাসুখ-স্পৃহা তাঁকে জাতিচ্যুত করেছে। অনার্যদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সরহপাদ লিখেছেন, যখন কেউ বাঙালি স্ত্রী গ্রহণ করে তখন সে তার জ্ঞান হারায়। সুতরাং আর্য-বাঙালি ও অনার্য-বাঙালির মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। অনার্য-বাঙালিদের উৎপত্তি উপজাতি সম্প্রদায় থেকে। নিম্নবর্গের বাঙালিদের ছিল চরম দারিদ্র। কবি ঢেন্ঢণপাদ তাঁর কবিতায় একটি সামাজিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন — আমার ঘর ভেঙে পড়ার মুখে। কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, কিন্তু আগন্তুকেরা প্রায়ই আসে।

ডোম, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ এবং অন্যান্য তথাকথিত নিচু জাতের মানুষ গ্রামের বাইরে বাস করত। ব্রাহ্মণেরা অস্পৃশ্যতা মেনে চলত। সেই নিচু জাতের মানুষ লৌকিক দেব-দেবীর উপাসনা করত এবং যাদু দেখিয়ে বেড়াত। যাদুবিদ্যা ছিল তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ এবং উপার্জনের অন্যতম উপায়। তারা সাধারণত দারিদ্র সীমার নিচে ছিল। *চর্যাপদ* থেকে আমরা সামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কে জানতে পারি। যৌতুক প্রথা সমাজে চালু ছিল। যৌতুকের লোভে অনেকে তথাকথিত নিচুজাতের মেয়ে বিয়ে করত। *চর্যাপদে* আছে: 'ডোম্বীকে বিয়ে করে বংশ মর্যাদা হারালেও যৌতুক লাভে বঞ্চিত হইনি।'

তান্ত্রিকতা সমাজে প্রসার লাভ করে এবং কিছু নতুন আচার-অনুষ্ঠানে তন্ত্রের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। মদ্য পানে অনেকে আসক্ত হয়ে পড়েন। বিরূপাদ মদ তৈরি হয় এমন একটি বাড়ির বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। "এক সে শুণ্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধঅ, চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।" কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তন্ত্র এবং সহজযান সমাজের আদর্শবাদকে মুছে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ লেখকগণ *উপনিষদ*, *পুরাণ*, *রামায়ণ* এবং *মহাভারত* থেকে আদর্শবাদের উদাহরণগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁরা অবহেলিত ছিলেন না। শুধুমাত্র ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হতো না। তাঁদের প্রশাসনিক কাজেও নিয়োগ করা হতো। তাঁদের ক্ষমতা নির্ভর করত তাঁদের পাণ্ডিত্যের উপর যা সামরিক ক্ষমতার চেয়ে কম ছিল না। ব্রাহ্মণদের বিদ্যাচর্চার ফলে তাঁদের প্রভাবিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার লাভ করে।[৭৫] আবার অনেক ব্রাহ্মণ অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র পড়াতেন এবং তাঁরা হয়েছিলেন "Distinguished ....in the field of scholarship."[৭৬] তাঁদের মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলভদ্র এবং বিক্রমশীল মহাবিহারের জেতারি ছিলেন বিখ্যাত। জেতারি অনেক তন্ত্রের পুথি ও সূত্র রচনা করেন।[৭৭]

অন্যান্য সাহিত্যিক উপাদানেও *চর্যাপদে* বর্ণিত সমাজ চিত্র সমর্থিত হয়। "The songs belong to the sect known as Siddhacarya.....Lui is called Adi Siddhacarya on the sect."[৭৮] লুই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পথ অনুসরণ করতেন। এক শ' পঞ্চাশ জনেরও বেশি পদকর্তা বা কবি সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রেখে

গেছেন। তাঁদের রচনা থেকে প্রাচীন বাংলার সমাজ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি।[৭৯]

বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্মিলনের ফলে ধর্মীয় রীতি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হল। দেখা গেল নতুন সমাজের রূপ। হরপ্রসাদের মতে, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম গোটা সমাজকে গ্রাস করে নিল।

৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিকেও নজর দেন। তিনি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন সেকালের ধর্মীয়-অর্থনৈতিক-সামাজিক চিত্র। কিন্তু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সাহিত্য ক্ষেত্রে যে ছাপ ফেলেছিল তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। পাল-সেন যুগের পর মুসলমান আক্রমণ (দ্বাদশ শতাব্দী) কালে পূর্ব ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। পালযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। পাল-রাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছেন এমন নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। সেন আমলে বিষ্ণুর উপাসনা বৃদ্ধি পায়। স্বয়ং লক্ষণ সেন বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "তান্ত্রিক মহাযানের যুগনদ্ধ হেরুক-নৈরাত্মা মূর্তির উপাসনার সমান্তরালে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিপূজা যেমন চলিয়া গিয়াছিল তেমনি সেই সঙ্গে সস্ত্রীক বিষ্ণুমূর্তির পূজার আয়োজনও চলিতেছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তুর্কী-আক্রমণ আসিয়া পড়ায় তাহা বোধ করি উদ্যোগেই থামিয়া গিয়াছিল। পরে অবশ্য তাহা রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে।"[৮০] গৌড় রাজ্যে বৈষ্ণব তথা হিন্দুধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকায় সামাজিক পরিবর্তনও ঘটতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সর্বানন্দ, বৃহস্পতি রায় মুকুট, হোসেন শাহ্-র মন্ত্রী সনাতন, মালাধর বসু প্রমুখের রচনায় হরি বা বিষ্ণুর কথা আছে। হোসেন শাহের আমলে ভক্তিরসাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্মানুশীলনের সূত্রপাত চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে পূর্ণতা পায়। পরবর্তীকালে অসংখ্য বৈষ্ণবকবি তাঁদের রচিত সাহিত্যে যে রস সৃষ্টি করেছেন তাতে 'সমাজ' অনুপস্থিত নয়, বলা-ই বাহুল্য। হরপ্রসাদ ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় সব সময়েই কাল ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন।

চর্যাপদ আবিষ্কার ছাড়াও হরপ্রসাদ আরও কতকগুলি পুথি আবিষ্কার করেন, তার মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ খিস্টাব্দে তিনি নেপাল থেকে *রামচরিত*-এর পুথিখানি এশিয়াটিক সোসাইটিতে নিয়ে আসেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের *প্রসেডিংস অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*-এ 'অন দ্য ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট অব এ ওয়ার্ক অন দ্য বায়োগ্রাফি অব দ্য পাল কিং অব মগধ, রামপাল' প্রসঙ্গে হরপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রকাশিত হয়।[৮১] *রামচরিত*-এর পুথি থেকে পাল যুগের একটি লুপ্ত

অধ্যায় উদ্ধার হয়েছে। পাল যুগ সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য সেকালে লেখা হিন্দু-বৌদ্ধ সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। সেই সমস্ত তথ্য ব্যবহার করে তিনি *জর্নাল অব বিহার এ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি*-তে (১৯১৯) একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লেখেন — 'লিটেরারি হিস্ট্রি অব দ্য পাল পিরিয়ড'।

পাল যুগের ইতিহাস যেমন সাহিত্য থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তেমনি সেন যুগের ঐতিহাসিক তথ্যও আমরা সাহিত্য থেকে পেতে পারি। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসের *প্রসেডিংস অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*-এ হরপ্রসাদ দুটি পুথির কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর 'অন দ্য অথেনটিসিটি অব দ্য টু নিউলি ডিসকভারড ম্যানাসক্রিপ্টস্ অব দ্য বল্লালচরিত বাই আনন্দ ভট্ট অ্যান্ড দেয়ার ইমপরট্যান্স ইন ট্রেসিং দ্য হিস্ট্রি অব দ্য কাস্ট সিস্টেম ইন বেঙ্গল' থেকে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। বল্লাল চরিত-এর পরিচয় দিতে গিয়ে হরপ্রসাদ লিখেছেন যে, *বল্লাল চরিত* মানে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলার সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বল্লাল সেনের জীবন চরিত। বইটি লেখা হয়েছে ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে। লিখেছিলেন আনন্দভট্ট। তাঁর পূর্বপুরুষ অনন্ত ভট্টকে বল্লাল সেন জমি দান করে পূর্ব বাংলায় বসিয়েছিলেন।[৮২] আনন্দ ভট্টের গ্রন্থখানি বল্লাল সেনের জীবৎকালে রচিত নয়। ফলে আনন্দ ভট্টকে তাঁর পূর্বসূরীদের রচনার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। *বল্লাল চরিত* রচনা করতে গিয়ে তিনি যাঁদের উপর নির্ভর করেছিলেন তাঁরা বল্লাল সেনের সমসাময়িক কালের মানুষ। সিংহ গিরির *ব্যাস পুরাণ*, শরণ দত্ত-র *বল্লাল চরিত*, কালিদাস নন্দীর *জয়মঙ্গল গাথা* থেকে আনন্দ ভট্ট উপাদান সংগ্রহ করেছেন। আনন্দ ভট্টর রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হরপ্রসাদ লিখেছেন, "The information given in Ananada Bhatta's work agrees, to a great extent, with the results of modern historical researches, and so it can be accepted as an authentic record of Ballal's reign."[৮৩]

হরপ্রসাদের আর-একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ঐ একই প্রসেডিংস-এ প্রকাশিত হয়েছে। এটি হল — 'এ নোট অন দ্য এক্‌জিসটেনস্ অব দ্য মেডিয়ান প্রিস্টহুড ইন ইন্ডিয়া, অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট ডে', *বল্লাল চরিত*-এর ষোড়শ অধ্যায়ে উল্লিখিত মেজাই (Magi) বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলার গ্রহবিপ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বাসভূমি ছিল শাকদ্বীপ। কাশ্মীরের উত্তরে শাকদ্বীপ অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয়। আবার ভিন্ন মত অনুযায়ী ইরানের পূর্বাঞ্চল ছিল শাকদ্বীপ। শাকদ্বীপের মেজাইরা জ্ঞানী পুরোহিত ছিলেন। তাঁরা জরথুসত্র-র আগে একটি ধর্মমত গড়ে তুলেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। মেজাইরা ভারতে মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এঁদের একদল গৌড়ে বসতি করেন। তাঁরা গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হন। হরপ্রসাদ লিখেছেন, "It is not difficult, therefore, to identify these Saka-dvipi Brahmanas as the Magi of old, and we have the high authority of Simha Giri, the Guru of Ballala, in our support."[৮৪]

বল্লাল চরিত-এ অনেক ইতিহাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে। জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, শরণ, ধোয়ী প্রমুখ কবিদের রচনা থেকে ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি। জুলাই ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসেডিংস-এ মুদ্রিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ইন্ডিয়া ইন লক্ষ্মণ সেন'স টাইম ফ্রম এ রেয়ার ম্যানাসক্রিপ্ট রিট্‌ন্ অ্যাট হিজ কোর্ট' নিবন্ধে এ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়।

হরপ্রসাদের *কীর্তিলতা* বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস উদঘাটনে সহায়ক। তাঁর সম্পাদিত *কীর্তিলতা : মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত* প্রকাশিত হয় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ৩০ বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনে হরপ্রসাদের লেখা 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে তাঁর ইতিহাস সচেতনতার অনেকগুলি দিক প্রকাশিত। হরপ্রসাদ বিদ্যাপতি ও তাঁর কাব্য রচনার কাল নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া এই কাব্যে চিত্রিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ঐতিহাসিক দিক্‌দর্শনেরও সহায়ক। হরপ্রসাদ বিদ্যাপতি এবং তাঁর *কীর্তিলতা* সম্পর্কে লিখেছেন, "বিদ্যাপতিকে আমরা প্রধান তিন মূর্তিতে দেখিতে পাই। এক মূর্তিতে তিনি পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্ন, তিরহুতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ, এবং হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প। আর-এক মূর্তিতে দেখি, তিনি কবি, কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদিরসের পদ্য লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গদ্‌গদ হইতেছেন। তাঁহার আরো এক মূর্তি আছে, তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন — কীর্তিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরী নাশ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্য লাভ করিলেন। এই-সকল কথা তিনি তাঁহার তৃতীয় মূর্তিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসের গানগুলি, তাঁহার 'কীর্ত্তিপতাকা' ও 'কীর্ত্তিলতা' তাহাকে ভারতবর্ষের একজন প্রধান ইতিহাস লেখক করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের যে ইতিহাস একেবারে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ হিন্দু সমাজের ইতিহাস — হিন্দুদিগের দিক হইতে তিনিই শিখিয়াছেন।"[৮৫]

হরপ্রসাদ প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে সমস্ত সাহিত্যকর্মের উদ্ধার বা সম্পাদনা করেছেন, সেখানে নিছক সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। সেই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে তিনি সেই কালকে বুঝতে চেয়েছেন। বুঝতে চেয়েছেন সেই সময়ের ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজকে। সাহিত্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন ধারাকে বুঝতে চেয়েছেন। এইখানেই হরপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য।

৫

হরপ্রসাদ *বঙ্গদর্শন*-এর লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচনায় ছিল সৃজনী-প্রতিভার স্পর্শ। এই সৃজনী-প্রতিভা তাঁর গবেষণা মূলক বা অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। *বঙ্গদর্শন*, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ও অন্যান্য সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছাড়া সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ ও সম্বোধনগুলিতে বাংলা সাহিত্যের অনেক তথ্যর ইতিহাস-নিষ্ঠ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। এই সব রচনায় পাওয়া গেছে অনেক নতুন তথ্য এবং তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু বাংলা ভাষায় লেখা প্রবন্ধ বা অভিভাষণই নয়, 'ভার্নাকুলার লিটারেচার অব বেঙ্গল বিফোর দ্য ইনট্রোডাক্শন্ অব ইংলিশ এডুকেশন' (১৮৯১), 'এনসিয়েন্ট বেঙ্গলি লিটারেচার আন্ডার মুহামেডান পেট্রনেজ' (১৮৯৪) এবং 'বেঙ্গলি বুদ্ধিস্ট লিটারেচার' (১৯১৭)-এর মতো ইংরেজি প্রবন্ধগুলিও তাঁর সাহিত্য-অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। বাংলা পুথিপত্রের আবিষ্কার, সাহিত্য-অনুসন্ধান, সাহিত্য পরম্পরার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলি দেখলে বোঝা যাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তাঁর *চর্যাপদ* আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের বয়স যে হাজার বছর তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের অসমাপ্ত কাজে হাত দেন। প্রকাশিত হয় *নোটিশেস অব স্যানস্‌ক্রিট্ ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট স্‌* (খণ্ড-১০)। এটি হরপ্রসাদ প্রস্তুত করেছিলেন। এখানে বাংলা পুথির কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের পরে তিনি যে *নোটিশেস অব স্যানস্‌ক্রিট ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট স্‌* (খণ্ড-১১) প্রস্তুত করেন তার ভূমিকায় তিনি বাংলা পুথির উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য পূর্ববর্তীকালেও বাংলা সাহিত্য যে রচিত হয়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *নোটিশেস* এর ভূমিকায় লিখেছেন : বিগত তিন বছরে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকটাকে বাংলা সাহিত্যের শুরুর কাল হিসেবে অনেক বিদ্বজ্জন মনে করেন, কারণ, চৈতন্য অনুগামীরাই বাংলা কাব্যের প্রথম পথিকৃত যাঁরা মাতৃভাষা বাংলায় প্রথম বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করেন। গত তিন বছরে বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত পুথিগুলি প্রমাণ করে বাংলা সাহিত্য কতটা প্রাচীন। আবিষ্কৃত একটি পুথির রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ, অপরটি ১৪৯১ থেকে ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে, অর্থাৎ হুসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে। তৃতীয়টি রচিত হয় নসরৎ শাহের রাজত্বকালে। তিনি বাংলার সৈয়দ বংশের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন।[৮৬] (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হরপ্রসাদের এই অভিমত চর্যাপদ আবিষ্কারের আগের।) যাইহোক, বিপ্রদাস পিপ্‌লাই এবং দ্বিজ বংশীদাসের *মনসামঙ্গল*, রূপরামের *ধর্মমঙ্গল*, গুণরাজ খানের *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*, নরহরি

চক্রবর্তীর *প্রেম বিলাস* প্রভৃতি পুথি হরপ্রসাদ তালিকাভুক্ত করে ভূমিকায় আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি বিপ্রদাস পিপ্‌লাইয়ের *মনসামঙ্গল* পুথির বিবরণ অনুসরণ করে 'নোটস অন দ্য ব্যাঙ্কস অব দ্য হুগলি ইন ১৪৯৫' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে হুগলি নদীর উভয় তীরে অবস্থিত যে সমস্ত জায়গার নাম বিপ্রদাসের রচনায় পাওয়া গেছে সেগুলি নিয়ে হরপ্রসাদ নিপুণ ভাবে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, বিপ্রদাসের রচনা থেকে যে সমস্ত তথ্য পাই তা কতদূর গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে ।[৮৭] বিপ্রদাসের পুথিতে প্রাপ্ত অনেক স্থান নাম পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা হয়।[৮৮] রূপরামের *ধর্মমঙ্গল*-এর পুথি থেকেই হয়ত তাঁর ধর্মঠাকুর তত্ত্বের সৃষ্টি বলা যেতে পারে। কারণ এই পুথি দেখার পর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত *ডিসকভারি অব লিভিং বুদ্ধিজম্ ইন্ বেঙ্গল* প্রকাশিত হয়। অবশ্য তাঁর তত্ত্ব ভিত্তি সুদৃঢ় করতে আরো অনেক দৃষ্টান্ত হাতে আসে, যেমন, ময়ূর ভট্টের *ধর্মমঙ্গল*, রমাই পণ্ডিতের *শূন্যপুরাণ*, মানিক গাঙ্গুলীর *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল* প্রভৃতি। তা ছাড়া ধর্মঠাকুরের থান, পূজো পদ্ধতি ও অন্যান্য দিক থেকে হরপ্রসাদের "সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের পরিণাম।" [৮৯] *ধর্মমঙ্গল* থেকে তিনি শুধুমাত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্মের [৯০] তত্ত্বই নির্মাণ করেন নি; সামাজিক ইতিহাসের একটি চিত্রও সেই সঙ্গে অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছেন।

বাংলা পুথির অনুসন্ধান ও সংগ্রহ এবং প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মূলে ছিল বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাস রচনার প্রয়াস। এই কাজে হরপ্রসাদের আগ্রহ তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, অভিভাষণ প্রভৃতিতে পরিস্ফুট। কিন্তু তাঁর *বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্ট*গুলিতেও বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়। তাঁর এই সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনারই প্রস্তুতি। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্নর *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (১ম ভাগ) রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত। এর পরে ঐ পথ অনুসরণ করে আরও কিছু বই লেখা হয়েছিল। "এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খৃস্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল যে বাংলা একটি নূতন ভাষা উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, ..."[৯১] তাই অনেকের ধারণা, এই ভাষায় অনুবাদ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি হরপ্রসাদ বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হলে তাঁর "মনের ভাব ফিরিয়া গেল।"[৯২] হরপ্রসাদ লিখেছেন, "বাংলা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি।... বাংলায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন,..."। [৯৩] কম্বুলেটোলার অভিভাষণটি প্রকৃতপক্ষেই প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের

একটি খসড়া। সেই সঙ্গে সঙ্গে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হরপ্রসাদের 'বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবন্ধটিও পড়তে হবে। এছাড়া সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত অভিভাষণগুলিতে সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক উপাদান আছে। তাঁর কম্বুলেটোলা রিডিং লাইব্রেরিতে প্রদত্ত ভাষণ *ভার্নাকুলার লিটারেচার অব বেঙ্গল বিফোর দ্য ইনট্রোডাকশন অব ইংলিশ এডুকেশন* (১৮৯১) থেকে বৈষ্ণবসাহিত্য ও বৈষ্ণব পদকর্তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের *প্রসেডিংস অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*-এ 'এনসিয়েন্ট বেঙ্গলি লিটারেচার আন্ডার মুহমেডান পেট্রনেজ' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদের এই নিবন্ধটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নেই। বাংলা শাসক আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) বাংলা সাহিত্য শাসক কর্তৃক পরিপোষিত হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী শাসকদের রাজত্বকালে বাংলা দেশে হিন্দু রাজকর্মচারীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হোসেন শাহ্-র আমলেও সেই প্রভাব একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তবে হিন্দু প্রভাব কিছুটা খর্ব হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সুকুমার সেনের মতে, স্বাধীন সুলতানদের সময় "হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিভেদ ছিল সে বিভেদ আচার-নিষ্ঠার দিকে কঠিনতর হইতে লাগিল বটে কিন্তু লোক ব্যবহারে, সাধারণ জীবনে, সে বিভেদ নতুন করিয়া মনান্তর সৃষ্টি করে নাই।"[৯৪] ফলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে "রাজসভাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আপোষ কিছু হইয়াছিল।"[৯৫] মুসলমান শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছিল। হরপ্রসাদ লিখেছেন, হুসেন শাহ্ এবং তাঁর সেনাপতি মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিয়ে হিন্দুদের মন জয় করেছিলেন। হুসেনের আগেও বাঙালিদের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ছিল। কৃত্তিবাস *রামায়ণ* এবং গুনরাজ খাঁ *ভাগবত* অনুবাদ করেছিলেন। তা ছাড়া মনসা, মঙ্গলচণ্ডী এবং ধর্মরাজকে নিয়ে বিপুল সংখ্যক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তাঁর মুসলমান সেনাপতি পরাগল খাঁ বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিয়েছিলেন। পরাগলের রাজসভা ছিল চট্টগ্রামে। তিনি চারণ-কবি পরমেশ্বরকে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁকে কবীন্দ্র উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।[৯৬]

পরাগল খানের ছেলে ছুটিখানও হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন। ছুটিখানের পৃষ্ঠ-পোষকতায় শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। "He treats his work as a supplement to the greater work of Kavindra Paramesvara."[৯৭]

মধ্যযুগের সাহিত্য ও সাহিত্যকারদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ সময়সাময়িক কালের সমাজ চিত্র ফুটিয়ে তুলতেই চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যাই হয়ে উঠেছে তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি সাহিত্য পর্যালোচনা করে এই

সিদ্ধান্তে এসেছিলেন : "...বাংলার গৌরব শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিকার্যে ও উপনিবেশে। শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে খৃ. পূ. ৪র্থ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নানা প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইত। .....ঐ গ্রন্থেই আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে তুলার কাপড়ও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং অতি উৎকৃষ্ট ছিল।"[৯৮] তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাংলার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ তাঁর 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' এবং 'কন্‌ট্রিবিউশন অব বেঙ্গল টু হিন্দু সিভিলাইজেশন' প্রবন্ধ দুটিতে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

শুধুমাত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নয়, আধুনিক সাহিত্যের আলোচনাতেও হরপ্রসাদের ইতিহাস বোধ ও সামাজিক-পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কিত চিন্তা অনেক বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে (১৮৮৬-৯৪) কাজ করার সময় তিনি বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে অবহিত হন। পুরানো এবং হাল আমলের যে সমস্ত বই ছাপা হতো তার বাৎসরিক রিপোর্ট তিনি লিখতেন। এই সমস্ত রিপোর্টগুলিতে হরপ্রসাদের সূক্ষ্ম ইতিহাস -চেতনা ও সাহিত্য-বোধ প্রকাশিত। এই রিপোর্টগুলি সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপযুক্ত উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, তা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দাঁড় করাতে তিনি দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ গবেষকদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এবং তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কে এই কাজের সহায়ক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। হরপ্রসাদ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩২ জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য- পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে বলেন, "ইহা খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গলের জন্য জন্মিয়াছে এবং খাঁটি বাংলার খাঁটি মঙ্গল করিতেছে। ....এখানে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, আচরণীয় অনাচরণীয় ভেদ নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ নাই। ইহার উদ্দেশ্য, বাংলার সীমার মধ্যে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে, সেইগুলি বাহির করা এবং তাহার একটা উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়া....।"[৯৯] হরপ্রসাদের সাহিত্য ও ইতিহাস চিন্তার মধ্যে এক ধরনের জাতীয়তাবোধ সব সময়ে জাগ্রত ছিল। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে না থেকেও তাঁর মধ্যে স্বদেশিয়ানার কোনো ঘাটতি ছিল না। তাঁর সমগ্র কর্মের মধ্যে ফুটে উঠেছে দেশের সামাজিক ইতিহাস, ভালো-মন্দের স্বরূপ ও গৌরবময় দিনগুলির উদ্ধারের প্রচেষ্টা। নিছক সাহিত্য-চর্চার জন্য সাহিত্য-চর্চা তিনি কখনো করেননি। সাহিত্যের মধ্যে তিনি ইতিহাসের উপাদান খুঁজেছেন।

৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকূলে অনেক সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করেছেন। সংগ্রহ করা পুথির *ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ ক্যাটালগস* তৈরি করেছেন। এবং প্রত্যেকটি খণ্ডের

বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন। এই সমস্ত পুথির ভূমিকা এবং সংস্কৃত পুথির *নোটিশেস্‌*গুলি থেকে তার ইতিহাস দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তাঁর এই দৃষ্টি তৈরি হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন," অনুভব করেছিলাম, শাস্ত্রী মশায়ের প্রতি তাঁর [রাজেন্দ্রলাল মিত্রের] বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সে সময় এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে তাঁর সঙ্গে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি যে বিশেষভাবে আদর করেছিলেন পরেও তার প্রমাণ দেখেছি।" [১০০]

বৌদ্ধ, বৈদিক, স্মৃতি, ইতিহাস-ভূগোল, পুরাণ, কাব্য এমন-কি ব্যাকরণের পুথি-সংগ্রহের ভূমিকায় হরপ্রসাদ কাল এবং কালের ঐতিহাসিক কার্য-কারণ অনুসন্ধান করেছেন। খুঁজে পেতে চেয়েছেন এক-একটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণ পড়াবার পিছনে কোন্ সমাজতাত্ত্বিক কারণ নিহিত।

তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বাস্তব ঐতিহাসিক-বোধ দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। *এডুকেটিভ ইনফ্লুয়েন্স অব স্যান্‌স্‌ক্রিট, বার্ড'স আই ভিউ অব স্যান্‌স্‌ক্রিট লিটারেচার, মগধান লিটারেচার, স্যান্‌স্‌ক্রিট কালচার ইন মডার্ন ইন্ডিয়া* এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে লেখা অন্যান্য প্রবন্ধাবলী, বিশেষ করে তাঁর কালিদাস চর্চা খুবই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। কালিদাস কোথাকার লোক ছিলেন, তাঁর সময় এবং রচনাবলীর ক্রম ও বিদ্যা-চর্চা নিয়ে ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে *জর্নাল অব দ্য বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটিতে* তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, কালিদাস মালবের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম চম্বল নদীর পনের মাইল দক্ষিণে, দশপুরে। তাঁর অস্তিত্ব ছিল ৪০৪ থেকে ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই সময়ের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর রচনায় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

৭

রাজপুতানা এবং গুজরাটের লৌকিক সাহিত্য, বিশেষ করে ভাট ও চারণদের গাথা ও গানগুলি এবং তাদের রচয়িতাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে হরপ্রসাদকে একটি রিপোর্ট করতে ব্রিটিশ সরকার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল, ভাট ও চারণদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পুথি-পাণ্ডুলিপিও সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হবে। গ্রিয়ার্সন এই প্রস্তাবটি কার্জন-কে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দিলেও, হরপ্রসাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ : ১৩২১'-এ হরপ্রসাদ

বলেন, "রাজপুতানার ভাট ও চারণদের পুথি সংগ্রহের জন্য ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ঐ গভর্নমেন্ট ঐ বিষয়ে বন্দোবস্তের ভার এশিয়াটিক সোসাইটির উপর দেন। সোসাইটি সে ভার আমার উপর দেন, আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, কার্য এখনো পুরাদস্তুর আরম্ভ হয় নাই।"[১০১] হরপ্রসাদ অনুসন্ধানের কাজে অন্তত তিনবার রাজপুতানায় গিয়েছিলেন এবং তিনি দুটি রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টগুলি হল — *রিপোর্ট অব এ ট্যুর ইন্ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন সার্চ অব ম্যানাসক্রিপ্টস্ অব বারডিক ক্রনিক্লস্* (১৯০৯) এবং *প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অন দ্য অপারেশন ইন্ সার্চ অব ম্যানাস্ক্রিপ্ট স্ অব বার্ডিক ক্রনিক্লস* (১৯১৩)। তা ছাড়া *মাসিক বসুমতী* (চৈত্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় হরপ্রসাদের লেখা 'মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান' নামে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত রিপোর্ট, প্রবন্ধ থেকে, স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* (খণ্ড-৯, অংশ-২, ১৯০৮) থেকে এবং এল. পি. তেস্সিতোরি-র 'এ স্কিম ফর দ্য বারডিক অ্যান্ড হিস্টোরিকাল সার্ভে অব রাজপুতানা' (*জে-এ-এস-বি*, নভেম্বর ১৯১৪) থেকে চারণ ও ভাটদের কবিতা, গান, ভাষা, ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ, ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। হরপ্রসাদের মতে "ইতিহাসের উপর চারণদের বড়োই ঝোঁক। চারণদের সব কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিলে রাজপুতানার একখানি পুরাদস্তুর ইতিহাস হয়। কিন্তু সংগ্রহ করা বড়োই কঠিন, মুখে মুখে কবিতা অনেক লোপ হইয়া গিয়াছে। সময় সময় দেখিয়াছি, এক একটা ঘটনার ইতিহাস কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, দূর-দূরান্তরে অজ পল্লীগ্রামে চারণের মুখের কবিতায় তাহার ইতিহাস পাওয়া গেল।"[১০২] ইতিহাসের নজির হিসাবে মহাকবি মুরারদানের বেশ কয়েকটি কবিতা হরপ্রসাদ উদ্ধৃত করেছেন।

চারণ এবং ভাটদের সম্পর্কে কোথায় কোথায় অনুসন্ধান করেছিলেন ১৯১৩ সালের রিপোর্টে সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, তিনি তিনবার রাজপুতানার কয়েকটি রাজধানী এবং গুজরাটে অনুসন্ধানের জন্য গিয়েছিলেন। ১৯০৯ থেকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সোসাইটিতে তিনি চারটি রিপোর্ট জমা দেন। গত চার বছরের একটি সাধারণ রিপোর্টও তিনি জমা দেন। তিন বছরে তিনি জয়পুর, যোধপুর, বরোদা, বিকানির, ভরতপুর, বুঁদি, উজ্জয়িনি, আজমীড় প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়েছিলেন।[১০৩] হরপ্রসাদ তাঁর রিপোর্টে চারণদের জাতি, কাব্যের 'পিঙ্গল-ডিঙ্গল' ভাষা এবং রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত পুরস্কারের কথা বলেছেন। ভাট ও চরণদের রচনা থেকে রাজবংশের এবং চারণদের বংশ তালিকা উদ্ধার করাও সম্ভব হয়েছে। হরপ্রসাদ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : মতিসার একটি জাতি। তারা চারণদের বংশলতিকা রাখে। তাদের প্রশংসা করে গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করে।[১০৪] ভাট এবং চারণ ছাড়াও বাড়োয়ারা সমস্ত জাতির বংশলতিকার খবর রাখে এবং তাদের নিজেদের লোকেদের সম্মানার্থে গান বাঁধে। ঢুলিরা সমস্ত অনুষ্ঠানে ঢাক বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ এবং ঐতিহাসিক গান রচনা করে।[১০৫]

হরপ্রসাদ অনুসন্ধানের সময় মহামহোপাধ্যায় মুরারদানের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। মুরারদান ছিলেন চারণ, মহাকবি এবং দেশবাসী ও দেশের রাজা কর্তৃক সম্মানিত। তিনি "....একখানি অলংকারের বই লেখেন, তাহার নাম যশোভূষণ। সেখানি খুব বড়ো বই — ডিঙ্গল ভাষায় লেখা।" [১০৬] কিন্তু তাঁর রিপোর্টে হরপ্রসাদ বলেছিলেন, "...Dingal is not a language, not even a dilect as some would allege, but it is a style of poetry peculiar to the Caranas...."[১০৭] তেস্‌সিতোরির মতে "....Dingal is an artificial Language invented by the bards, and to show its real nature and relationship to the other language of India."[১০৮] ডিঙ্গল সম্পর্কে তেস্‌সিতোরির মত হরপ্রসাদ মেনেছিলেন। তাই 'মহাহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান' প্রবন্ধে তিনি ডিঙ্গলকে কৃত্রিম ভাষা-ই বলেছেন।

রাজপুতদের উপর ভাট-চারণদের প্রভাব খুব বেশি। তাঁদের রচিত গান থেকে রাজপুতানার ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদানের খোঁজ করেছেন হরপ্রসাদ। তাঁর *রিপোর্ট*গুলিতে ভাট-চারণ এবং তাঁদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই হরপ্রসাদের ইতিহাস সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যে সমস্ত আলোচনা করেছেন সেখানে মানুষ, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি বুঝতে চেয়েছেন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত। তাঁর প্রাচীন সাহিত্য ও নানা বিষয়ের আবিষ্কৃত পুথি ইতিহাসেরই উপাদান। এমন-কি তাঁর সৃজনশীল রচনাতেও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ

১. গোপীনাথ কবিরাজ, 'মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১৭৯।

২. সম্ভবত সাহিত্যে রুচির প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের মতানৈক্য হয়েছিল। দ্র. *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৩৭৫।

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ভূমিকা', *কাঞ্চনমালা*, কলকাতা, ১৩২৪ ব.।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।" (*বঙ্গদর্শন*, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭)। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় তিনি 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' (ভাদ্র ১২৮০ ব., অগ্রহায়ণ, ১২৮২ ব.), 'বাঙ্গালীর বাহুবল' (শ্রাবণ ১২৮১ ব.) 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (মাঘ ১২৮১ ব.), 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ব.), বাঙ্গালীর উৎপত্তি' (পৌষ, ১২৮৭ ব., জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ ব), 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ ব.) এবং *প্রচার* পত্রিকায়

'বাঙ্গালার কলঙ্ক' (শ্রাবণ, ১২৯১ ব.) প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী লিখেছিলেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে তাঁর ইতিহাস-বোধ এবং পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানের প্রয়াস লক্ষিত হয়।

৫. 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়; *হ-র-সং*-২, পৃ. ২০।

৬. *তদেব*, পৃ. ১৫।

৭. *তদেব*, পৃ. ১৯।

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *বাল্মীকির জয়*-এর সমালোচনা করেন *বঙ্গদর্শন* (আশ্বিন, ১২৮৮ ব.) পত্রিকায়। পরে তা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৬ খৃ.) ছাপা হয়। দ্র. *হ-র-সং*-১, পৃ. ১৫৫।

৯. আখ্যাপত্রে লেখা আছে — বাল্মীকির জয়। *THE THREE FORCES*, (Physical, Intellectual and Moral).

১০. *বাল্মীকির জয়*-এর তৃতীয় সংস্করণে (১৯০২) এই সমালোচনাটি ছাপা হয়েছিল। দ্র. *হ-র-সং*-১, পৃ. ৫৬৫।

১১. *The Calcutta Review*, Vol. LXXIV, No. CXLVIII, 1882. দ্র. *বাল্মীকির জয়*, তৃতীয় সংস্করণ (১৯০২), *হ-র-সং*-১, পৃ. ৫৬৮।

১২. Brajendra Nath Seal, 'The Neo - Romantic Movement in Literature', *The Calcutta Review*, Vol. XCII. No. CLXXXIII, 1891. দ্র. *হ-র-সং*-১, পৃ. ৫৭১।

১৩. দ্র. *হ-র-সং*-১, পৃ. ৫৮৪।

১৪. ২ ও ৩ নং সূত্রনির্দেশ দ্র.।

১৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বঙ্কিমচন্দ্র', *মাসিক বসুমতী*, শ্রাবণ, ১৩২৯ ব.।

১৬. গোপীনাথ কবিরাজ, 'মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', *স্মারকগ্রন্থ*, ১৯৭৮, পৃ. ১৮১।

১৭. গণপতি সরকার, *হরপ্রসাদ জীবনী*, কলকাতা, ১৩৪৩ ব., পৃ. ২৯।

১৮. *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৩৭৫।

১৯. Rajendralal Mitra, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Calcutta, 1882.

২০. 'কাঞ্চনমালা', *হ-র-সং*-১, পৃ. ১৮৭।

২১. *তদেব*, পৃ. ১৮৬।

২২. *তদেব*, পৃ. ১৮৭।

২৩. Haraprasad Shastri, 'Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire', *JASB*, 1910, NS: VI, pp. 259-62.

২৪. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, "মুখবন্ধ", 'কাঞ্চনমালা', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *হরপ্রসাদ-রচনাবলী*, দ্বিতীয় সম্ভার, কলিকাতা, ১৩৬৬।

২৫. 'বেনের মেয়ে', *হ-র-সং* - ১, পৃ. ২২৩।

২৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৫৮।

২৭. 'বেনের মেয়ে', *হ-র-সং* - ১, পৃ. ২২১।

২৮. তদেব, পৃ. ১৯৯।

২৯. আদি সিদ্ধাচার্য লুই (দ্র. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, কলকাতা, ১৩৫৮ ; Sashi Bhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cult*, Calcutta, 1946, pp. 41-45, 444-45; R.C. Mazumder (ed.) History of Bengal, Vol. I, Dacca, 1963, pp. 337-51); ভবদেব ভট্ট (R.C. Mazumdar, প্রাগুক্ত, pp. 202-03, 320-23; Monomohan Chakraborty, 'Bhatta Bhavadeva of Bengal' এবং Haraprasad Shastri, 'Remarks on the Foregoing paper', *JASB*, Sept., 1912); বর্মন-রাজ হরিবর্মদেব (R.C. Mazumdar (ed.) *প্রাগুক্ত*, pp. 199-204), শান্তিদেব (Haraprasad Shastri, 'Santideva' *IA*, Feb., 1913) প্রভৃতি চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র।

৩০. সত্যজিৎ চৌধুরী, 'প্রতিহত ঔপন্যাসিক প্রতিভা: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', *স্মারকগ্রন্থ*, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৮২-৮৩।

৩১. "মুখপাত", 'বেনের মেয়ে', *হ-র-সং*-১, পৃ. ১৯৮।

৩২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩০।

৩৩. 'বঙ্কিমচন্দ্র', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৩৬-৩৭।

৩৪. 'বেনের মেয়ে', *হ-র-সং*-১, পৃ. ৩০৬।

৩৫. *তদেব*, পৃ. ৩১৫-১৭।

৩৬. *তদেব*, পৃ. ৩৭০-৭১।

৩৭. পবিত্র সরকার, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ৩২০।

৩৮. *তদেব*, পৃ. ৩২৪।

৩৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৫।

৪০. 'সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্য পরিষদ: ১৩২৯', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৪৩৫।

৪১. 'ডাক ও খানা', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৭৫৩।

৪২. তদেব, পৃ. ৭৫৪।

৪৩. তদেব, পৃ. ৭৫১-৫২।

৪৪. তদেব, পৃ. ৭৫১।

৪৫. *তদেব*, পৃ. ৭৫৩।

৪৬. 'মুসলমানি বাংলা, গুজ্জু-উজাল বিবির কেচ্ছা', *হ-র-সং*-২, পৃ. ৫৬৯।

৪৭. *তদেব*, পৃ. ৫৬৯।

৪৮. তদেব, পৃ. ৫৬৮।

৪৯. Haraprasad Shastri, *Report of the Bengal Library. 1889*, p.6.

৫০. Haraprasad Shastri, *Report of the Bengal Library, 1894*, p.6.

৫১. 'প্যারীচাঁদ মিত্র', *হ-র-সং-২*, পৃ. ১৫০।

৫২. *তদেব*, পৃ. ১৫১।

৫৩. *তদেব*, পৃ. ১৫১।

৫৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'সাহিত্য শাখার রচনা সংকলনের ভূমিকা', *বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন, অষ্টম অধিবেশনের কার্যবিবরণ*, বর্ধমান, ১৩২২ ব.।

৫৫. *হ-র-সং-২*, পৃ. ৫৫৪।

৫৬. 'বাংলা ভাষা', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৫৬২।

৫৭. অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৩৬৬।

৫৮. *তদেব*, পৃ. ৩৬৭।

৫৯. *তদেব*, পৃ. ৩৬৭-৬৮।

৬০. ভূমিকা, *তদেব*, পৃ. ৩১।

৬১. 'সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং-২*, পৃ. ২৭৬।

৬২. *তদেব*, পৃ. ২৭৬।

৬৩ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ২২৫।

৬৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা, ১২২৩ ব., পৃ. ১।

৬৫. *তদেব*, পৃ. ১- ১৬।

৬৬. Probodh Chandra Bagchi, *Studies in the Tantras*, Part-I, Calcutta, 1975, p.61.

৬৭. "The Language of the caryas in the genuine vernacular of Bengal of its basis." – Suniti Kumar Chatterjee, *The Origin and Development of the Bengali Language*, Vol.I, London, 1970, p. 115.

৬৮. Rahul Sankrityayan, 'Hindi Bhasaki Pracinata', (Antiquity of the Hindi Language), Presidential Address of Hindi Section, *Proceedings and Transaction of Seventh All India Oriental Conference. Baroda, December 1933*, Oriental Institute, Baroda 1935, pp. 665-70

৬৯. দ্র Haraprasad Shastri, 'Northern Buddhism', *IHQ*, March 1925, pp. [illegible] June 1925, pp. 201-13 ; Sept. 1925, pp. 464-72.

৭০. Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Sub-Divisions of Ancient Bengal,* Calcutta, 1967, p.i.

৭১. তদেব, পৃ. III.

৭২. Puspa Niyogi, Buddhism in Ancient Bengal, Calcutta, 1980, p. 22.

৭৩. Sasi Bhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1976, p. 13.

৭৪. তদেব, পৃ. ১৩।

৭৫. Puspa Niyogi, *Brahmanic Settlements in Different Sub-divisions of Ancient Bengal*, Calcutta, 1967, p.14.

৭৬. তদেব, পৃ. ১৮।

৭৭. তদেব, পৃ. ১৮।

৭৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা, ১৩২৩ ব. পৃ. ২।

৭৯. তদেব।

৮০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৯৩।

৮১. Haraprasad Shastri, 'On the manuscript of a work of the biography of the Pala kings of Magadha, Rampala', *Progs. ASB*, March 1900, pp. 70-73.

৮২. Haraprasad Shastri, 'On the authenticity of the two newly discovered Manuscripts of the Vallalacarita by Ananda Bhatta and their importance in tracing the History of the Caste System in Bengal, Part I', *Progs. ASB*, December, 1901, pp 74-75.

৮৩. তদেব, পৃ. ৭৫।

৮৪. Haraprasad Shastri, 'A Note on the existence of the Magi, the Median priesthood in India, at the Present day', তদেব, পৃ. ৭৫।

৮৫. 'বিদ্যাপতি', হ-র-সং-২, পৃ. ৭৬৯।

৮৬. Haraprasad Shastri, *Notices of Sanskrit Mss.* Vol. XI, 1895.

৮৭. Haraprasad Shastri, 'Notes on the Bank of the Hugli in 1495', *Progs ASB*, December, 1892, p. 197.

৮৮. সুকুমার সেন, *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পূর্বার্ধ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২০৯।

৮৯. 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ: ১৩২১', হ-র-সং-২, পৃ. ৩১৭।

৯০. ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে থাকায় পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন সূচিত হয়। তা ছাড়া বৌদ্ধধর্মে নানা ভাগ উপবিভাগ — সহজযান, বজ্রযান, তন্ত্রযান প্রভৃতি —

সৃষ্টি হয়ে বৌদ্ধধর্মের মূলধারা থেকে সরে যেতে থাকে। তার উপর মুসলমান আক্রমণ বৌদ্ধধর্মের উপর আঘাত হানে। (দ্র. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'Buddhism in Bengal Since the Muhammadan Conquest', *JASB*, 1895)। অনেক বৌদ্ধ হিন্দু-সমাজে মর্যাদাহীন অবস্থায় ঠাঁই পায়। কিন্তু আচরণবিধিতে এবং পূজা-পার্বনে তাঁদের মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব থেকে গেল। 'রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল' (হ-র-সং-৩, পৃ. ২০৩ -১৬) এবং *Discovery of Living Buddhism in Bengal* (1897)-এ বাংলায় যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে সেই তত্ত্ব হরপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৯১. 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ: ১৩২১', *হ-র-সং-২*, পৃ. ৩১৬।

৯২. *তদেব*, পৃ. ৩১৬।

৯৩. *তদেব*, পৃ. ৩১৬-১৭।

৯৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২০৫।

৯৫. *তদেব*, পৃ. ২০৫।

৯৬. Haraprasad Shastri, 'Ancient Bengali Literature under Muhammdan Patronage', (1894), *হ-র-সং-২*, পৃ. ৮৩০-৩১।

৯৭. *তদেব*, পৃ. ৮৩৪।

৯৮. 'সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য- সম্মেলনের অভ্যর্থনা - সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং-২*, পৃ. ২৭১-৭২।

৯৯. 'সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্য পরিষৎ: ১৩৩৭', হ-র-সং-২, পৃ. ৪৫৬।

১০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতি পুস্তকের জন্য', *স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১৭২।

১০১. *হ-র-সং-২*, পৃ. ৩১৫।

১০২. 'মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান', *হ-র-সং-২*, পৃ. ২১৯-২০।

১০৩. Haraprasad Shastri, *Preliminary Report on the Operation in Search of Mss. of Bradic Chronicles* (1913), p. 2.

১০৪. *তদেব*, পৃ. ৯।

১০৫. Haraprasad Shastri, *Report of a Tour in Western India in Search of Mss. of Bradic Chronicles* (1909), p. 4.

১০৬. 'মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান', *হ-র-সং-২*, পৃ. ২২৩।

১০৭. Haraprasad Shastri, *Preliminary Report on the Operation in Search of Mss. of Bardic Chronicles* (1913), p. 15.

১০৮. Tessitori, L.P, 'A Scheme for the Bardic and Historical Survey of Rajputana', *JASB*, Vol. X, No.10 (NS), Nov. 1914, p. 375.

উপসংহার

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত হরপ্রসাদের সমসাময়িক কালে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে বহু মনীষী কাজ করেছেন। তাঁদের কাজ সম্পর্কে হরপ্রসাদ ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারা তাঁকে কখনো কখনো প্রভাবিত করেছে; যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র। ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহের মূলে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবার সমসাময়িক ইতিহাসবিদ্‌দের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধও হয়েছে। মতাদর্শের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়— তেমনি হরপ্রসাদের কোনো কোনো ঐতিহাসিক-মত আপাত দৃষ্টিতে গৃহীত না হয়ে ইতিহাস বিদ্‌দের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে বা অন্যান্যদের মধ্যে অনুসন্ধানের স্পৃহা বাড়িয়ে তুলেছে। যেমন মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান দায়ী ছিল বলে হরপ্রসাদ মনে করতেন, কিন্তু তা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতি পায়নি। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নটি মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছে সন্দেহ নেই তেমনি তাঁর অনেক সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়নি, কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সেই বিতর্ক নতুন মত গঠনে সাহায্য করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশীয় মানুষের মধ্যে পুরাবৃত্ত এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এশিয়াটিক সোসাইটির তথ্যানুসন্ধান ; শিলালিপি, মুদ্রা পুথিপত্রের আবিষ্কার ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পুরাবৃত্ত রচনা প্রণালী তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। সেই রচনা প্রণালী বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপযুক্ত মনে হয়েছে। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বাংলার ইতিহাস লিখবেন মনস্থ করেছিলেন। এবং অন্যান্যদের ইতিহাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। হরপ্রসাদও বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থা অনুসরণ করে পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্‌দের রচনা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী কখনোই ছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিল, গবেষণাপ্রণালী শিখিয়ে নিলে টোলের দেশীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কাজ পাওয়া যাবে। তাই এই দেশ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অনভিজ্ঞ ইতিহাস লেখকদের রচনা হরপ্রসাদ মেনে নিতে পারেন নি। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ যে ইতিহাস লিখেছিলেন তা বঙ্কিমচন্দ্র-হরপ্রসাদের মতে যথেষ্ট নয়, যথার্থও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ ছিল। তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাসতত্ত্বের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইতিহাস লেখেন নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইতিহাস-চর্চা করেছেন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্পূর্ণ বইও লিখেছেন। তিনি ছিলেন ইতিহাসের গবেষক রমেশচন্দ্র দত্ত ইতিহাসের গবেষক এবং লেখক। রাজেন্দ্রলাল-রমেশচন্দ্রও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন, এমন নয়। ইতিহাস ভাবনার দিক থেকে হরপ্রসাদ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র-রাজেন্দ্রলাল-রমেশচন্দ্রের উত্তরসূরী। মতাদর্শের দিক থেকে কোনো কোনো বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও তাঁর ইতিহাস বোধ গড়ে উঠেছিল এঁদেরই সাহচর্যে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লেখা স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইগুলিতেও রচনা রীতির নানা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৮৭৪ খৃ.) বইটির সমালোচনা (*বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১৮২১ ব.) করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র "সুবর্ণের মুষ্টি" এই উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, রাজকৃষ্ণের বইটি স্কুলপাঠ্য ইতিহাস। নীলমণি বসাক, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ লেখকগণ স্কুলের ছাত্রদের জন্য ইতিহাস লিখেছেন, তাতে ইংরেজ শাসকদের ভূমিকা, দেশীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচিত। ছাত্রপাঠ্য বইগুলির মধ্যে নানা রকমের দৃষ্টিভঙ্গি — জাতীয়তাবাদী, জাতীয়তাবাদ বিরোধী, কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে বা বিরুদ্ধে মত — প্রকাশ পেয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছাত্রপাঠ্য বইগুলিতে প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক ভারতের ইতিহাস পর্যালোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসই মূলত আলোচ্য বিষয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণও স্থান পেয়েছে।

ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দেশীয় লেখকগণ ইতিহাস-চর্চা করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমেশচন্দ্র দত্ত, নিখিলনাথ রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের একটি রূপরেখা অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস রচনায় স্বদেশ চেতনা, জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হরপ্রসাদের লেখাতেও বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে। তিনিও বাংলার গৌরবময় অধ্যায়গুলির উদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন। এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু হরপ্রসাদ তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের সঙ্গে সব সময়ে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আজীবন ইতিহাস-চর্চা করে গেছেন এবং তাঁর স্বদেশি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃতের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর বি. এ. ক্লাসের পাঠক্রম থেকে জানা যায় তিনি ইংরাজি-সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস পড়েছেন। এর ফলে আধুনিক মন তৈরি হয়েছিল। তার উপর তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধীনে পুথিপত্র নিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণা মূলক কাজ করেছেন। এরমধ্য দিয়েই তাঁর মনে ইতিহাস বোধের জন্ম হয়। তাঁর ইতিহাস-বোধ স্বদেশ-ভাবনার দ্বারা চালিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। হরপ্রসাদ তাঁর অধীত সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দেশ, দেশের মানুষ ও সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাই তাঁর ইতিহাস-চিন্তা সামাজিক ইতিহাসের মাত্রা পেয়েছে।

হরপ্রসাদ যে সমস্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেছেন পরবর্তীকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার পাঠান্তর হয়েছে কিন্তু প্রথম পাঠের গুরুত্ব পরবর্তী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও অনিবার্য হয়ে উঠেছে ; কারণ, তার মধ্যেও অনেক সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে।

হরপ্রসাদের পাঠ পুরোপুরি না মানলেও পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারেন নি। সেই পাঠগুলিকে সামনে রেখেই তাঁরা পাঠান্তর করেছেন ঐ সমস্ত শিলালিপি-তাম্রশাসনাদি ইতিহাস রচনার উপকরণ। হরপ্রসাদ সংগৃহীত উপাদানগুলি ইতিহাসের লুপ্ত দিক উদ্ধার করেছে।

প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের প্রত্ন-নিদর্শন থেকে যেমন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ সম্ভব, তেমনি সেকালের সাহিত্য ও অন্যান্য পুথিপত্র থেকেও ইতিহাসের তথ্য পাওয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ প্রথম যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন তখন প্রধানত মধ্যযুগের মুসলমান লেখকদের কিছু বইপত্রই ছিল তাঁদের অবলম্বন ফলে উপাদানের অভাবের জন্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস তাঁদের আলোচনার বাইরে ছিল। পরবর্তীকালে প্রত্ন-নিদর্শন ও পুথিপত্রের আবিষ্কারের ফলে ভারত ইতিহাসের পরম্পরা ও প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনিও প্রাচীন ভারত ও ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্রতী হন। আবিষ্কার করেন সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* (*এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৯১০), আনন্দভট্টের *বল্লালচরিত* (*বিবলিওথেকা ইন্ডিকা*, ১৬৪ সংখ্যক, ১৯০৪), বিদ্যাপতির *কীর্ত্তিলতা* (১৯২৫), আর্য্যদেবের *চতুঃশতিকা* (*এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার*, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা, ১৯১৪), *সৌন্দরনন্দ* (*বিবলিওথেকা ইন্ডিকা*, ১৯২ সংখ্যক, ১৯১০) প্রভৃতি পুথি। তাঁর আর-একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার *চর্যাপদ*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে তা ১৯১৬ সালে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* নামে প্রকাশিত। এই আবিষ্কার বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। এই আবিষ্কার থেকেই জানা যায় প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবন। ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক আলোচনাতেও তাঁর এই আবিষ্কার যুগান্তর এনেছিল।

নেপাল থেকে এশিয়াটিক সোসাইটিতে আনীত তালপাতার পুথির দুখণ্ড তালিকা প্রস্তুত (১৯০৫ ও ১৯১৫) করেন। তা ছাড়া সংস্কৃত পুথির — *বৌদ্ধপুথি* (১৯১৭), *বৈদিক পুথি* (১৯২৩), *স্মৃতি পুথি* (১৯২৫), *ইতিহাস ও ভূগোল পুথি* (১৯২৮), *পুরাণ পুথি* (১৯২৮), *ব্যাকরণ পুথি* (১৯৩১) — বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করেন। প্রত্যেকটি খণ্ডের সঙ্গে আছে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা। এই ভূমিকাগুলি পড়লে বোঝা যায় তিনি কি ভাবে পুথিগুলির সামাজিক উপযোগিতা ও তৎকালীন সমাজকে বুঝতে চেয়েছেন। বিস্তৃত তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি তিনি সংস্কৃত পুথির *নোটিস* এবং *রিপোর্ট*ও তৈরি করেছেন পশ্চিম ভারতের চারণদের গাথা এবং তাঁদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহও হরপ্রসাদের একটি স্মরণীয় কাজ।

হরপ্রসাদের কার্যাবলীর মধ্যে বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চা উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি *ডিস্কভারি অব লিভিং বুদ্ধিজ্‌ম ইন বেঙ্গল* নামে মাত্র ৩১পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে তিনি দেখান, বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল। সমাজ জীবনে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির বিকাশ হয়। বাংলায় প্রচলিত

ধর্মপূজাকে তিনি বৌদ্ধধর্মের অবশেষ বলে মনে করেন। এই বৌদ্ধধর্ম উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম। এর আবিষ্কারক চোমা দ্য কোরস এবং ব্রায়ান হটন হজসন। হরপ্রসাদ এঁদের আবিষ্কার ও পাঠের সূত্র ধরে গভীর অনুসন্ধান করেছেন। নতুন তথ্যের আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য তাঁর বিশ্বাস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে। সারাজীবন তিনি বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চা করে বাংলাকে বৌদ্ধভূমি হিসেবেই প্রতিপন্ন করেছেন। এমন-কি তাঁর *বেনের মেয়ে* উপন্যাসেও বৌদ্ধ বাংলার একটি খণ্ড চিত্র দেখতে পাই। সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান এবং মুসলমান আগমনের ফলে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবসান হয়। বৌদ্ধদের বিলুপ্তির আরেকটি অন্যতম প্রধান কারণ হল : বৌদ্ধধর্ম তখন সহজযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি নানা যানে বিভক্ত। তন্ত্র-সাধনা ধর্ম ও সমাজকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উত্থান, বিস্তার ও বিলয়ের কথা হরপ্রসাদের রচনাবলীতে বিধৃত হয়েছে। বাংলার সমাজ জীবনে বৌদ্ধধর্ম এত গভীরে প্রবেশ করেছিল যে, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্ম গোটা সমাজকে গ্রাস করলেও মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে, আচার ব্যবহারে, সামাজিক রীতি-নীতিতে বৌদ্ধসমাজের অবশেষ থেকে গেছে। একেই হরপ্রসাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম বলেছেন। অর্থাৎ সমাজে বৌদ্ধধর্মের জের থেকে গেছে। এ ব্যাপারে তাঁর 'রমাইপণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল' (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১৩০৪ ব.) এবং 'বুদ্ধিজম্ ইন বেঙ্গল সিন্স মুহামেডান কনকোয়েস্ট' (জে-এ-এস-বি, ১৮৯৫) প্রবন্ধ দুটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

হরপ্রসাদ বৌদ্ধ-বিষয়টিকে সমস্ত দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন। বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্মের মূল দ্বন্দ্ব কোথায়, তাদের মধ্যে সমন্বয়ের রূপটিই বা কী তা নিয়ে তিনি শুধুমাত্র দার্শনিক বিতর্ক উত্থাপন করেন নি ; তিনি দৈনন্দিন জীবনের, আচার-বিচারের এবং মানসিক অবস্থানের খুঁটিনাটি আলোচনা করে দুই সংস্কৃতির প্রভেদ দেখিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন , নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। বাংলার ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাঁর বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চা বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ্‌গণ নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই ইতিহাসকে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন — নিজেদের তৈরি ইতিহাস ও তার ব্যাখ্যাকে প্রয়োজন মতো গ্রহণ বর্জন করেছেন। ইতিহাসের তথ্য ব্যবহার করেছেন প্রশাসনিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার সূত্রপাতের মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসকগোষ্ঠীর অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। এবং এদেশের ইতিহাস অনুসন্ধানের মূলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্তম্ভগুলিকে পোক্ত করাই ছিল উদ্দেশ্য। ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৈরি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা সম্পর্কে হরপ্রসাদ মন্তব্য করেছিলেন, "ইউরোপের নিয়ম ভারতবর্ষে খাটিবে কি?" (আমাদের গৌরবের দুই সময়', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ৩২৭)। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ্‌দের

লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথও ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও ''ফাঁক''-এর কথা বলেছেন। ('ভারত-ইতিহাস চর্চা', *ইতিহাস*, বিশ্বভারতী ১৩৬২,পৃ. ৭৭-৭৮)। হরপ্রসাদ ভারত ইতিহাসের ধারবাহিকতার অভাবের কথা বলেছেন — ''যেমন কলিকাতার গঙ্গায় বয়া ভাসে, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতগুলি রাজবংশ ভাসিতে লাগিল ; পরস্পর কী সম্বন্ধ, বুঝা গেল না ; সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হইল না। ... যদিও কতকটা ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙা ভাঙা, বেশ ঠাস গাঁথুনি হইল না।'' ('আমাদের ইতিহাস', *হ-র-সং-৪*, পৃ. ৩২৯)।

হরপ্রসাদ ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেননি। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখার ইচ্ছে ছিল, তাও হয়ে ওঠেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধে ও অভিভাষণে পাওয়া যায়। ইংরেজি ও বাংলা পত্র-পত্রিকায় (১৮৭৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত, লেখা তাঁর প্রবন্ধাবলী ইতিহাসের অনালোকিত-অনালোচিত দিকগুলি আলোকিত করেছে। তাঁর নিরন্তর তথ্যানুসন্ধান ভারত ইতিহাসের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যায় সাহায্য করেছে। ইতিহাসের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হরপ্রসাদের কাজ ছড়িয়ে আছে। আর্যতত্ত্ব, জন-বিন্যাস ও তার তত্ত্ব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বৌদ্ধ-জৈন- আজীবিক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক কীর্তির তাৎপর্য, লোকায়ত ধর্মের গুরুত্ব, প্রাচীন বাংলার গৌরবময় দিনগুলির ব্যাখ্যা, মুসলমান আক্রমণের পূর্বে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অবস্থান, মুসলমান শাসকদের প্রযত্নে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, লিপি ও ভাষাতত্ত্বের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, প্রাচীন থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন — এই সমস্ত হরপ্রসাদের আলোচ্য বিষয়। ইতিহাস আলোচনায় পূর্বপক্ষ হিসাবে তাঁকে মেনে নিয়েই অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের উত্তর-সাধকদের আলোচনা শুরু করতে হয়।

হরপ্রসাদের ইতিহাস অন্বেষণের মূল লক্ষ্য রাজবৃত্তের ইতিহাস নয়। ইতিহাস রচনার এমন একটি কাঠামো তিনি তৈরি করতে চেয়েছেন যেখানে মানুষের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে। আর এই সামগ্রিক পরিচয়ের মধ্যেই ইতিহাস নিহিত থাকে। একটি দেশের মানুষের ইতিহাস বুঝতে হলে জানতে হবে, সেখানকার উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার প্রযুক্তি, চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। হরপ্রসাদ ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করে যেমন সমাজের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি *বেনের মেয়ের* মতো উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়েও সামাজিক ইতিহাস উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। *বেনের মেয়ে* শুধু প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসই নয়, এটি ইতিহাস-চর্চারই আরেকটি ফর্ম যা প্রথাগত ইতিহাস রচনা পদ্ধতির বাইরে। এখানে উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু *বেনের মেয়ে* পর্যায়ের নয়। সেখানে সমাজের সাধারণ মানুষের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় মেলে না, যেমন মেলে *বেনের মেয়েতে*। মাত্র দুটি উপন্যাস লিখেও হরপ্রসাদ তাঁর স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। তাঁর আগে বা পরে এ ধরনের ইতিহাস নিষ্ঠ উপন্যাস

আমাদের তেমন নজরে পড়ে না।

হরপ্রসাদ 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির সম্বোধন' (*হ-র-সং-* ৪) এবং 'কনট্রিবিউশনস অব বেঙ্গল টু হিন্দু সিভিলাইজেশন' (জে-বি-ও-আর-এস, ১৯১৯-২০) প্রবন্ধে চাষ-বাস, শিল্পোৎপাদন, উৎপাদনের পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের অনুসন্ধান করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের কাল-কালান্তরের প্রবহমান জন-জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন অনিবার্য কারণে কিভাবে জন-বিন্যাসের পরিবর্তন হয়, সমাজে মানুষের অবস্থানের পরিবর্তন হয়, বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়। এইসব তত্ত্ব ও বাস্তব রূপকে একত্রিত করেই তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন সামাজিক ইতিহাস।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাচ্যতত্ত্ব ও ইতিহাসতত্ত্বের কাঠামো একসময় তৈরি হয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে সেই বিদ্যা-চর্চার সূত্রপাত ও বিস্তার। প্রাচ্যতত্ত্ব এবং ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে শাসক শাসিতের সম্পর্কের দিকটি এড্ওয়ার্ড সইদ তাঁর *ওরিয়েন্টালইজম* (লন্ডন, ১৯৭৮)-এ দেখিয়েছেন। ভারতের অতীত আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ও. পি. কেজারিওয়াল তাঁর *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল অ্যাণ্ড দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়াস পাস্ট* (নিউ দিল্লি, ১৯৮৮)-বইটিতে। প্রাচ্যতত্ত্ব ও ইতিহাস-চর্চায় জোন্স, জেমস মিল, মার্শমান যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন তা রাজেন্দ্রলাল-হরপ্রসাদের চর্চার মধ্য দিয়ে নতুন ধারায় বাঁক নিল, নিজের দেশকে জানার জন্য জনবৃত্তের ইতিহাস-চর্চার মধ্য দিয়ে। পরে হরপ্রসাদ আরও গভীরভাবে বাংলা ও বাঙালির সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস-চর্চা করার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কে কাজের জায়গা হিসাবে বেছে নেন। সাহিত্য-পরিষদের কাজের মধ্যে তাঁর স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এই স্বদেশানুরাগ তাঁর ইতিহাস চেতনাকে প্রভাবিত করেছে।

বাংলার ইতিহাস বুঝতে হলে জাতিতত্ত্ব বুঝতে হবে। হরপ্রসাদ তাঁর 'জাতিভেদ' (*হ-র-সং- ৪*) প্রবন্ধে বর্ণগত প্রভেদের দিকটিই শুধু আলোচনা করেন নি, তিনি দেখিয়েছেন 'বৃত্তি' কিভাবে জাতি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপজাতিদেরও তিনি বাংলার জাতি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রসঙ্গত আর-একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য যে, তাঁর চিন্তনে হিন্দু-মুসলমান সমান গুরুত্ব পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি চিন্তা ছিল তাঁর ইতিহাস-চিন্তার আর-একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক সময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমার বিশ্বাস বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।" ('সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *হ-র-সং-*২, পৃ. ২৬৮)। তিনি একনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর এই আক্ষেপ দূর করতে চেষ্টা করেছেন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থপঞ্জী

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নির্বাচিত রচনাপঞ্জি

ক. প্রাচীন পুথির বর্ণনামূলক তালিকা

Catalogue of Palm-leaf and Selected paper Mss. belonging to the Darbar Library, Nepal. Vol. I, 1905 ; Vol. II, 1915

Catalogue of Manuscripts in the Bishops College Library, Calcutta, 1915

A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government collection under the care of the Asiatic Society of Bengal. Vol. I *Buddhist*

Manuscripts, 1917 : Vol. II *Vedic Manuscripts*, 1923 ; Vol. III, *Smrti*

Manuscripts, 1925 ; Vol. IV, *History and Geography Manuscripts*, 1923.

A descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collection of the Asiatic Society of Bengal. Vol. V, *Purana Manuscripts*, 1928 ; Vol. VI, *Vyakarana Manuscripts.*

Notices of Sanskrit Manuscripts, 1st series, Vol. X, 1890-1892 ; Vol. II, 1895.

Notices of Sanskrit Manuscripts, 2nd Series, Vo. I, 1898-1900 ; Vol. II, 1898-1904 ; Vol. III, 1904-1907 ; Vol. IV, 1911.

খ. পুথি অনুসন্ধানের প্রতিবেদন

Report on the search of Sanskrit manuscripts for 1895-1900, 1901.

Report on the Search of Sanskrit Manuscripts 1901-02 to 1905-06, 1905.

Report on the search of Sanskrit Manuscripts 1906-07 to 1910-11, 1911

Report of a Tour in Western India in search of Mss. of Bardic Chronicles, 1909.

A Report on the Manuscripts in Various Languages of India, Tibet and Indo-china in the Bishops College Library, Calcutta, 1911.

Preliminary report on the Operation · Search of Mss of Bardic Chronicles 1913, 1913.

গ. পুস্তক-পুস্তিকা (ইংরেজি)

Vernacular Literature of Bengal Before the Introduction of English Education, 1891

Discovery of Living Buddhism in Bengal, 1897.

The Educative Influence of Sanskrit, 1916.

Bird's eye-view of Sanskrit Literature, 1917.

Magadhan Literature, 1923.

Sanskrit Culture in Modern India, 1928 (লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ)।

ঘ. ইতিহাস-পাঠ্য পুস্তক

History of India, 1895.

A School History of India, 1899.

Beginners history of India from the earliest times to persent day, 1899.

ঙ. সম্পাদিত গ্রন্থ

শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল : মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত। ১৩১২ বঙ্গাব্দ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

কীর্ত্তিলতা : মহাকবি বিদ্যাপতি-বিরচিত। বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ। ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। ১৮৮৮-৯৭ খ্রি.। *বিবলিওথেকা ইন্ডিকা* ১২০ সংখ্যক।

বৃহৎ স্বয়ম্ভু পুরাণ। ১৮৯৪-১৯০০ খ্রি.। *বিবলিওথেকা ইন্ডিকা* ১৩৩ সংখ্যক।

আনন্দভট্টের বল্লালচরিত। ১৯০৪ খ্রি.। *বিবলিওথেকা ইন্ডিকা* ১৬৪ সংখ্যক।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত। ১৯১০ খ্রি.। *এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার*, তৃতীয় খণ্ড, সংখ্যা-১।

রত্নাকীর্তি, পণ্ডিত অশোক রত্নাকর শান্তি রচিত ৬ খানি বৌদ্ধন্যায়শাস্ত্রের পুথি। ১৯১০ খ্রি.। *বিবলিওথেকা ইন্ডিকা* ১৮৫ সংখ্যক।

সৌন্দরনন্দ। ১৯১০ খ্রি.। *বিবলিওথেকা ইন্ডিকা* ১৯২ সংখ্যক।

আর্য্যদেবের 'চতুঃশতিকা'। ১৯১৪ খ্রি.। *এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার*, তৃতীয় খণ্ড, সংখ্যা-৮।

অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ। ১৯২৭ খ্রি.। গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ৪০ সংখ্যক।

চ. **ইংরেজি প্রবন্ধ**

A short account of an old Gun recently dug up at False point, *Progs ASB*, 1890.

The Account of a Bengali Brahamana who obtained a high position in the Sinhales Buddhsist hierarchy in the 11th Century A. D., *Progs ASB*, 1980.

On Map of ancient Aryavarta prepared by Nagendranath Vasu, *Progs ASB*, 1890.

Notes on the banks of the Hughli in 1495, *progs. ASB*, 1892.

Notes on an inscribed Gun in the Armoury on the Nawab of Murshidabad, *Progs. ASB*, 1893.

Reminiscences of Sea-Voyage in the ancient Bengali literature, *Progs ASB*, 1893.

Anicent Bengali Literature under Muhammadan Patronage, *Progs. ASB*, 1894.

Note on Vishunpur Circular Cards, *JASB*, LXIV (I), 1895.

Discovery of Vidhiviveka a unique manuscripts at Puri, *Progs. ASB*, 1896

A Second set of Vishnupur Circular Cards, *Progs. ASB*, 1896.

On some ancient Burmese incribed pottery, *Progs. ASB*, 1897.

The Diary of Govinda Dasa, *The Calcutta Review*, January and April, 1898.

Topography of Govinda Dasa. *The Calcutta Review*, July, 1998.

India in Lakshmana Sena's time a rare manuscript written in his court, *Progs. ASB*, 1998.

On a Curious System of Tree Worship in Bengal, *Progs. ASB*, 1899.

On the manuscript of a work on the biography of one of the Pala Kings of Magadha, Rampala (*The Ramcarita* by Sandhyakara Nandi), *Progs. ASB*, 1900.

On a Tarquoise Ganesa, *Progs. ASB*, 1900.

Note on the existence of the Magi (the Median Priesthood) in India at the present day, *Progs. ASB*, 1901.

On the authenticity of the two newly discovered manuscripts of the Vallala Carita by Ananda Bhatta and their importance in tracing the history of the caste system in Bengal, *Progs. ASB*, 1901.

Babhan, *JASB*, LXXI (1), 1902.

On the authorshiop of Vidvanmada Tarang[illegible], *Progs. ASB*, 1902.

Note on the Babhana or Bheimhar Brahmans, *Progs. ASB*, 1902.

The Kaivartas during away the palas, *Progs. ASB*, 1902.

On the Organisation of Caste by Vallala Sena, *Progs. ASB*, 1902.

The Saraks of Orissa, *Progs. ASB*, 1902.

Four inscriptions of Mahasiva Gupta and Mahabhava Gupta of Kalinga and Kosala, *Progs. ASB*, 1902.

Dhelai-Candi, a form of tree worship, *JASB*, LXXI (3), 1902.

The identification of Ramgiri, the Starting point of the cloud in the cloudmessanger of Kalidasa with Ramgarha hill in the Sirguja state, *Progs. ASB*, 1902.

Sanskrit Learning in India, *The Calcutta Review* , July, 1903.

Evidences of Slave-Trade in the Mughal Empire, *Progs. ASB*, 1904.

History of Nyaya Sastra from Japanese sources, *JASB*, NS : 1, 1905.

An examination of the Nyaya Sutras, *JASB*, NS : 1, 1905.

A Khorosthi Copper Plate inscription from Taxila or Takhasila, *JASB*, NS : IV, 1908.

The Origin of the Indian Drama,*JASB*, NS : V, 1909.

Causes of the dismemberment of the Maurya Empire, *JASB*, NS : VI, 1910.

Refutation of Max Muller's theory of the Renaissance of Sanskrit Literature in the 4th Century A D. after a lull of Seven centuries from the time of the rise of Buddhism, *JASB*, NS : VI, 1910.

The Bhasapariccheda, JASB, NS . VI, 1910.

Dakshini Pandits at Benaras, *IA*, 1912.

On a newly discoverd Gupta Inscription at Mandasore, *Progs, ASB*, 1912.

The Bardic Chronicles, *JASB*, NS : VIII, 1912.

Exhibition of the genealogical tree of the Rathor family and of a photograph of Sihoji the founder of the family, *Progs. ASB*, 1912.

Theorise to explain the origin of Visen family of Majhawali, *JASB*, NS: VIII, *1912*

Remarks on M. M. Chakravarti's paper on Bhata Bhavadeva of Bengal, *JASB*, NS : VIII, 1912.

Who were the Sungas ?, *JASB*, NS : VIII, 1912.

A shot note on Ayi Pantha, a newly discovered cult in the Bilada District of the Marwary State, *Progs. ASB*, 1912.

A Biography of Santideva, the Author of the Bodhicharyavatara, *Progs. ASB*, 1912.

Note on Bhatti, *JASB*, NS : VIII, 1912.

King Chandra of the Meherauli Iron Pillar Inscription *IA*, 1913.

Mandasore Inscription of the time of Naravarman, The Malava year, 461, *EI*, Vol. XII, 1913 - 14.

On the Vikramadity of the Indian Tradition, *Progs. ASB*, 1914.

The Dramas of Bhasa, T*he Dacca Review*, 1915,

Susunia Rock Inscription of Chandravarman, *EI*, Vol. XIII, 1915-16.

Search of Sanskrit Manuscripts, *JBOHS*, Part-II,1915.

Kalidsa (1) – His Home *JBORS*, Part-II,1915.

Kalidasa (2) – His Age, *JBORS*, Parrt-I,1916.

Kalidasa (3) – Chrnology of his work and his learnings, *JBORS*, Part-II,1916.

Seven Copper-plate Records of Lad Grants form Dhenkanal, *JBORS*, Part-IV, 1916.

Bombay in the eleventh Century, *The Bhandarkar Commemoratior Volume*, 1917.

The Punsavana Ceremony, *JBORS*, Part-IV, 1917.

The Tejpur Rock Inscription, *JBORS*, Part-IV, 1917.

Khandadeuli Inscription of Ranabhanjadeva, *JBORS*, Part - II, 1918.

Grant of Ranastambhadeva, *JBORS*, Part-II,1918.

Tekkali Inscription of Madhyamaraja,the son of Petavyalloparaja, *JBORS*, Part-II, 1918.

Gazetter Literature in Sanskrit, *JBORS*, Part-I, 1918.

Sisunaga Statues, *JBORS*, Part-IV, 1919.

Literary History of the Pala Period, *JBORS*. Part-II, 1919.

Two eternal Cities in the Province of Bihar and Orissa, *JBORS*, Part - I, 1920.

Two copper-plates from the States of Bonai, *JBORS*, Part-II, 1920.

Chronology of the Nyaya System, *JBORS*, Part-I, 1920.

Chronology of the Sankhya Literature,*JBORS*, Part -II, 1923.

A note on 'A working Model of the origin of the Ganges in a Temple in Ganjam', *Memoirs, ASB*, (VIII, 4), 1924.

Lokayata, Dacca University Bulletin, No. 1, 1925.

Bhadrayana, *IHQ*, December. 1925.

Absorption of the Vratyas, *Dacca University Bulletin*, No. 6, 1926.

The Malla Era of Visnupur, *IHQ*, March 1927.

The Maha Puranas, *JBORS*, Part-III, 1928.

The Rg-Veda in the making, *JASB*, NS : XXV, 1929.

Chandogya- mantrabhasya — A Pre-Sayana Commentary on select Vedic Mantras, *IHQ*, Dec. 1930.

ছ. বাংলা রচনা

ভারতী মহিলা, ১৮৮১, কাঁটালপাড়া।

বাল্মীকির জয়, ১৮৮১। (এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ Triupmh of Valmiki. অনুবাদক R. R. Sen চট্টগ্রাম, ১৯০৯)।

মেঘদূত ব্যাখ্যা, ১৯০২।

কাঞ্চনমালা, ১৯১৬।

বেনের মেয়ে, ১৯২০।

ভারতবর্ষের ইতিহাস — 'প্রাচীন আর্য হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্যন্ত'। ১৮৯৫।

প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৯১২। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত আকারে এটি *প্রাথমিক ভারতবর্ষের ইতিহাস* নামে প্রকাশিত।

প্রাচীন বাংলার গৌরব, ১৯৪৬, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ-৫৪, বিশ্বভারতী, ১৯৪৬। (অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতির অভিভাষণ)।

বৌদ্ধধর্ম, ১৯৪৮। (*নারায়ণ*-এ প্রকাশিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন)।

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই, সম্ভবত ১৩২২ ব., বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

হরপ্রসাদ-রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, কলকাতা।

হরপ্রসাদ-রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ সম্পাদক : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, কলকাতা।

জ. বাংলা প্রবন্ধ

আমাদের গৌরবের দুই সময়, *বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ ১২৮৪।

শঙ্করাচার্য্য কে ছিলেন, *বঙ্গদর্শন*, আশ্বিন ১২৮৪।

বেদ ও বেদ ব্যাখ্যা, *বঙ্গদর্শন*, পৌষ, ১২৮৪।

ইক্ষু, *আর্য্যদর্শন*, পৌষ, ১২৮৪।

সমাজেব পরিবর্ত্ত কয় রূপ? *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ় ১২৮৫।

একজন বাঙ্গালী গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব, *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ় ১২৮৫।

এক্সচেঞ্জ, বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৫।

তৈল, বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৫।

স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষাকর, *বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ ১২৮৭।

খাজনা কেন দেই, *বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

শিক্ষা, *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ় ১২৮৭।

কালেজী শিক্ষা, *বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র ১২৮৭।

নূতন খাজনার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউ-এর মত, *বঙ্গদর্শন*, কার্তিক ১২৮৭।

বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য, *বঙ্গদর্শন*, ফাল্গুন ১২৮৭।

স্ত্রী বিপ্লব, *কল্পনা*, শ্রাবণ, ১২৮৭।

নূতন কথা গড়া, *বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

বাঙ্গালা ভাষা, *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ ১২৮৮।

কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে, নব্যভারত, কার্তিক ১২৯০।

সংস্কৃত শিক্ষা, নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।

রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী, *প্রচার*, মাঘ, ১২৯৩।

জাতিভেদ, *বিভা*, আশ্বিন, কার্তিক ১২৯৪।

কুশীনগর, *বিভা*, আশ্বিন,অগ্রহায়ণ, ১২৯৪।

মুসলমানী বাঙ্গালা (শুজ্জু উজাল বিবির কেচ্ছা), *বিভা*, ফাল্গুন ১২৯৪।

ভারতের লুপ্তরত্নোদ্ধার (বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা), *বিভা*, আষাঢ়, ১২৯৫।

মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চা, *বিভা*, মাঘ-ফাল্গুন ১২৯৫।

রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্ম-মঙ্গল, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা, ১৩০৪।

কাঁটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন পিত্তল ফলক, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৪।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা, ১৩০৮।

হিন্দুনাট্যের উৎপত্তি, *রঙ্গমঞ্চ*, ১৩১৭।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালার দারোদঘাটন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ, *রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, নবম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২১।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে? *নারায়ণ*, অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

নির্ব্বাণ, নারায়ণ, পৌষ, ১৩২১।

নির্ব্বাণ কয় রকম, *নারায়ণ*, মাঘ ১৩২১।

কোথা হইতে আসিল, *নারায়ণ*, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২১।

সভাপতির অভিভাষণ, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা, ১৩২১।

সভাপতির সম্বোধন, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২১।

সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২১।

হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২১।

কলিকাতা-সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, *মানসী*, বৈশাখ ১৩২১। উক্ত অভিভাষণের পরিশিষ্ট, *মানসী*, আষাঢ় ১৩২১।

সম্বোধন, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ১৩২২।

বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরব, *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩২২।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি, *প্রবাসী*, বৈশাখ ১৩২২।

সাহিত্য সম্মিলন, *ভারতী*, বৈশাখ ১৩২২।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, *বিজয়া*, ১৩২২।

সাহিত্য শাখার সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন, ৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, *বিজয়া*, ১৩২২।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়, *নারায়ণ*, বৈশাখ ১৩২২।

বঙ্কিমবাবু ও উত্তর চরিত, *নারায়ণ*, বৈশাখ ১৩২২।

হীনযান ও মহাযান, *নারায়ণ*, আষাঢ়, ১৩২২।

মহাযান কোথা হইতে আসিল, *নারায়ণ*, শ্রাবণ, ১৩২২।

সহজযান, *নারায়ণ*, ভাদ্র, ১৩২২।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপাত, *নারায়ণ*, আশ্বিন ১৩২২।

দুর্গোৎসবে নব-পত্রিকা, *নারায়ণ*, কার্তিক ১৩২২।

বৌদ্ধধর্ম্ম কোথায় গেল, *নারায়ণ*, পৌষ ১৩২২।

এখনও একটু আছে, *নারায়ণ*, মাঘ ১৩২২।

উড়িষ্যার জঙ্গলে, *নারায়ণ*, চৈত্র ১৩২২।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, *নারায়ণ*, শ্রাবণ, আশ্বিন, ফাল্গুন, ১৩২৩।

জাতক ও অবদান, *নারায়ণ*, শ্রাবণ ১৩২৩।

মহাসাঙ্ঘিক মত, *নারায়ণ*, মাঘ ১৩২৩।

সম্বোধন, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা ১৩২৩।

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম, *উদ্বোধন*, আষাঢ় ১৩২৪।

মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা, *নারায়ণ*, ভাদ্র ১৩২৪।

বঙ্কিমচন্দ্র, *নারায়ণ*, আষাঢ় ১৩২৫।

চণ্ডীদাস, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ১৩২৬।

বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১৩২৭।

মহাদেব, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৮।

সভাপতির অভিভাষণ, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা, ১৩২৯।

চণ্ডীদাস, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৯।

বাঙ্গালা সাহিত্য, *বাসন্তিকা* (বার্ষিকী), ১৩২৯।

বঙ্কিমচন্দ্র, *মাসিক বসুমতী*, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩২৩।

দলাদলি, *নারায়ণ*, কার্তিক, ১৩২৩।

থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক, নারায়ণ, চৈত্র ১৩২৩।

ডাক ও খনা, *প্রাচী*, শ্রাবণ, ১৩৩০।

বিদ্যাপতি, *প্রাচী*, ভাদ্র ১৩৩০।

পালবংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালার অবস্থা, *প্রবর্ত্তক*, কার্তিক ১৩৩০।

ব্রাত্য, *প্রাচী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

খানাকুল কৃষ্ণনগর (রাধানগর সাহিত্য সম্মিলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ), *মানসী* ও *মর্মবাণী*, কার্তিক ১৩৩১।

কয়টী তারিখ, *নবযুগ* (সাপ্তাহিক), চৈত্র ১৩৩২।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র, *পঞ্চপুষ্প*, আষাঢ় ১৩৩৬।

ভবভূতি, *মাসিক বসুমতী*, মাঘ, ফাল্গুন, ১৩৩৮।

মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারদান, *মাসিক বসুমতী*, চৈত্র ১৩৩৮।

হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাত, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১।

আমাদের ইতিহাস, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩১।

বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৩ ।

সভাপতির অভিভাষণ, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা ১৩৩৫।

বাঙ্গালার বৌদ্ধসমাজ, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৬।

সভাপতির অভিভাষণ, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৭।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৭।

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৭।

রত্নাকর শান্তি, *সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা*, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৮।

বৃহস্পতি রায় মুকুট, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮।

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮।

রমমাণিক্য বিদ্যালংকার, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৮।

সিংহল দ্বীপ, *পঞ্চপুষ্প*, কার্তিক, ১৩৩৯।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ইতিহাস, *বঙ্গশ্রী*, মাঘ, ১৩৩৯।

পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড, *বঙ্গশ্রী*, মাঘ ১৩৩৯।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের মূলসূত্র, *মাসিক বসুমতী*, ফাল্গুন ১৩৫৬।

ভারতের ভক্তিসাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব, *বার্ষিক বসুমতী*, পূজা সংখ্যা ১৩৫৭ ।

অন্যান্য গ্রন্থ

বাংলা

অক্ষয়কুমার দত্ত, *প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার*, কলকাতা, ১৯০১।

,, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৮৮৩।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড় লেখমালা*, রাজসাহী, ১৯১২।

,, *মীরকাশিম*, কলকাতা, ১৯০৬।

,, *সমরসিংহ*, কলকাতা, ১৮৮৩।

,, *সিরাজদ্দৌলা*, কলকাতা, ১৮৯৮।

,, *সীতারাম রায়*, কলকাতা, ১৮৯৮।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *ইতিহাসের মুক্তি*, কলকাতা, ১৯৫৭।

অতুল সুর, *বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, কলকাতা, ১৯৮৬।

অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, কলকাতা, ১৯৮৬।

অমিত সেন, *ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৫৭।

অশীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৯।

অশীন দাশগুপ্ত, বিষয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য বিষয়, কলকাতা, ১৯৯২।

অশোক চট্টোপাধ্যায়, *পাল অভিলেখ সংগ্রহ*, কলকাতা, ১৯৯২।

আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ঢাকা, ১৯৮৭।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৭১।

আবদুল হামিদ খান, *মুসলমানদিগের আদিবৃত্তান্ত*, কলকাতা, ১৯০০।

আদুল ওয়াহাব মাহমুদ (সম্পাদনা), *ইতিহাস-অনুসন্ধান-৯*, (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের একাদশ বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী), কলকাতা, ১৯৯৪।

আদুল ওয়াহাব মাহমুদ, *ইতিহাস-অনুসন্ধান-১০* (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের দশম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী), কলকাতা, ১৯৯৫।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৪৮-৪৯।

কার, ই. এইচ, *কাকে বলে ইতিহাস?* কলকাতা, ১৯৯১।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য, *সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬১।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৩৬৭।

দেবেশ রায়, *আঠার শতকের বাংলা গদ্য*, কলকাতা, ১৯৮৭।

দীনেশচন্দ্র সরকার, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত*, কলকাতা, ১৯৮৫।

,, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত*, কলকাতা ১৯৮২।

,, *শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ*, কলকাতা ১৯৮২।

দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩।

নিখিলনাথ রায়, *জগৎ শেঠ*, কলকাতা, ১৯১২।

নিখিলনাথ রায়, *প্রতাপাদিত্য*, কলকাতা, ১৯০৬।

,, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, বহরমপুর, ১৮৯৭।

,, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯০২।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৯৯৬।

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলকাতা, ১৩৫৮ ব.।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা ১৯০৯।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (গোপাল হালদার সম্পাদিত), *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাসংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ কলকাতা, ১৯৭৭, প্রথম খণ্ড, শেষ অংশ, কলকাতা, ১৯৭৯।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী'. *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, খণ্ড - ৭, কলকাতা ১৩৫৬ ব.।

,, *সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৫৫।

ভবতোষ দত্ত, *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*, কলকাতা ১৩৯৪ব.।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *সিপাহী বিদ্রোহ*, কলকাতা ১৯০৭।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলকাতা ১৮৬৫-৬৬।

,, *সামাজিক প্রবন্ধ* (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৮১।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩৮৩।

যোগেশচন্দ্র বাগল, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা*, কলকাতা, ১৯৬৩।

,, *জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলা, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা*, কলকাতা. ১৯৬৩।

,, *জাতীয়তার নবমন্ত্র বাংলা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৩৫২।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় , *বাঙ্গালার ইতিহাস* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৭৪।

রজনীকান্ত গুপ্ত, *আর্য্যকীর্তি*, ১ম থেকে ৫ম খণ্ড. কলকাতা, ১৮৮৩-৮৫।

রজনীকান্ত গুপ্ত, *ভারত ইতিহাস*, কলকাতা, ১৮৭১।

,, *ভারত কাহিনী*, কলকাতা, ১৮৮৩।

,, *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস* (১ম থেকে ৫ম খণ্ড), কলকাতা, ১৮৭৯ - ১৯০০।

রমাপ্রসাদ চন্দ, *ইতিহাসে বাঙ্গালী*, কলকাতা, ১৯৮১।

,, *গৌড়রাজমালা*, রাজশাহী, ১৩১৯।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, *হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ*, কলকাতা, ১৯৭৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩৬২।

,, *বাংলা ভাষা-পরিচয়*, কলকাতা, ১৯৩৮।

শিপ্রা বক্ষিত দস্তিদার, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্য কর্ম*, ঢাকা, ১৯৯২।

সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ*, কলকাতা, ১৯৭৮।

সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৮০।

,, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, বর্ধমান, ১৯৭৩।

,, *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী*, কলকাতা, ১৯৫৩।

,, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা ১৯৯১।

সুবীর রায় চৌধুরী, *হেনরি ডিরোজিও : তাঁর জীবন ও সময়*, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলকাতা, ১৯৯১।

,, *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*, কলকাতা ১৯৯১।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৩৮৩।

খ. ইংরেজি

Arbery, A. J., *British, Orientalist*, London, 1943.

,, *Asiatic Jones*, London, 1946.

,, *The Library of the India Office : A historical Sketch*, London, 1938.

Alex Aronson, *Europe looks at India*, Bombay, 1946.

Bagchi, P. C. and Santi Bhiksu Sastri (ed.), *Caryagitikosa*, Visva-Bharati, 1956.

Bagchi, P. C., *Pre-Aryan and pre-Dravidian in India*, Calcutta, 1975.

Banerji, Rev. Krishnamohan, "On the nature and Importance of Historical Studies", Reprinted in Gautam Chattopadhyay (ed.) *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century*, Calcutta 1965.

Banerjee, R. D., *The Origin of the Bengali Script*, Calcutta, 1919.

Bapat, P. V., (ed.), *2500 years of Buddhism*, New Delhi, 1976.

Baraclough, Geoffrey, *An Introduction to Contemporany History*, Penguin Books, Middlesex, 1967.

Basham, A. L., *Studies in Indian History and Culture*, Calcutta, 1964.

Basham, A. L., *The Wonder that was India*, London, 1954.

Berkhofer, Robert F., *A Behavioral Approach to historical Analysis*, 1969.

Bearce, G. D., *British attitude towards India*, London, 1961.

Bendall, C., *Catalouge of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge*, Cambridge, 1883.

Bhattacharyya, Benoytosh, *The Indian Buddhist Iconography*, Calcutta, 1968.

,, *An Introduction to Buddhist Esoterism*, Delhi, 1980.

,, *Sadhanamala*, Vol. I & II, Baroda, 1968.

,, *Our Ancestry*, Baroda, 1943.

Bhandarkar, D. R., *Asoka*, Calcutta University, Calcutta, 1969.

Bhattacharyya, Sabyasachi, "Positivisim in the 19th Century Bengal" in R. S. Sharma (ed.) *Indian Society : Historica Probings*, 1974.

Bongard-Levin, G and Vigasim, A., *The Image of India : The study o Ancient Indian Civilization in the U. S. S. R.*, Moscow, 1984.

Chakravarty, Chintaharan, *Tantras : Study on their Religion anc Literature*, Calcutta, 1963

Chanda, Ramprasad, The Indo-*Aryan Races*, Calcutta. 1969.

Chandra, Bipan, *The Rise and Growth of Economic Nationalism ir India*, New Delhi, 1977.

Chatterji, Partha, *The Nation and its Fragments : Colonial anc Post - Colonial Histories*, Princeton & Delhi, 1994.

,, *Nationalist Thought and the Colonial world : A Derivative Discourse* ? Delhi 1986.

Chatterjee Sanjib Chandra. *Bengal Ryots – their Rights anc Liabilities*, Calcutta.

Chatterji, Sunitikumar, *The Origin and Development of the Bengal Language*, Vol. I, (Reprinted), Calcutta 1970.

Chattopadhyay, Alaka, *Atisa and Tibet*, Calcutta, 1967.

,, *Catalogue of Indian (Buddhist) Texts in Tibetan Translatior Kanjur & Tanjur*, Calcutta, 1972.

Chattopadhyay, Bankimchandra, *Bankim -Racharavali*, (Eng. Work) Jogesh Chandra Bagal (ed.), Calcutta, 1969.

Chattopadhyay, Debiprasad, *Lokayata*, Delhi, 1985.

Chattopadhyay, Debiprasad (ed.) *Taranath's History of Buddhism*, Simla, 1970.

Chaudhuri, Sibadas, (Complied & ed.) *Proceedings of the Asiatic Society*, Vol. I, 1784 - 1800, The Asiatic Society. Calcutta, 1980.

Cultural Heritage of India, The Ramkrishna Mission Institute of Culture.

Das, Paritosh, *Sahajiya Cult of Bengal and Pancha Sakha Cult o Orissa*, Calcutta, 1988.

Das, S. C., *Indian Pandits in the Land of Snow*, (Reprinted). Calcutta, 1965.

Das, S. C., *History of the Rise, Progress and Downfall of Buddhism in India*, Calcutta, 1908.

Dasgupta, S. B., *Introduction to Tantric Buddhism*, Calcutta, 1974.
,, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1976.

Dasgupta, S. N. and De. S. K., *History of Sanskrit Literature*, Calcutta, 1972.

Davids, Rhys, *History and Literature of Buddhism*, (Reprinted), Delhi, 1975.

De, S. K., *History of Sanskrit Literature*, Calcutta, 1947.

Dutta, Romesh Chandra, *The Economic History of India* (1757-1857), Vol. I, London, 1906.
,, *England and India, Record of Progress During a Hundred years* : 1785-1885, London, 1897.
,, *A History of Civilization in Ancient India Based on Sanskrit Literature*, Vols. I, II and III,Calcutta, 1889-1890.
,, *Peasantry of Bengal*, Calcutta, 1874.
,, *A School History of Ancient and Modern India*, Calcutta, 1900.
,, *Open Letters to Lord Curzon, Speeches and Papers*, Calautta, 1904.

Gaekward's Oriental Series, Baroda.

Guha, Ranajit, *An Indian Historiography of India : A Nineteenth Century Agenda and its implications*, Calcutta, 1988.

Gupta, A. C. (ed.) *Studies in the Bengal Renaissance*, Calcutta, 1958.

Gupta J. N., *Life and Works of Romesh Chander Dutt, C. I. E.*, London, 1911.

Hobsbwam, E. J., *Industry and Empire* (The Pelican Economic History of Britain, Vol. 3, From 1750 to the Present Day), Penguin Books, Middlesex, 1969

Hunter, W. W., *The india of the Queen and other Essay* , London, 1903.
,, *Life of Brian H.Hodgson, London*, 1896.

Kejariwal,O. P. , *The Asiatic Society of Bengal and the Discovery of India's past*, New Delhi, 1988.

Kaviraj, Sudipta, *The unhappy conciouness : Bankim Chandra Chattopadhyay and the Formation of Nationalist Discourse in India*, Delhi, 1995.

Kosambi, D. D., *The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical outline*, New Delhi, 1990.

Maha - Mahopadhyay Haraprasad Shastri, M. A., C. I. E., F. A. S. B., Calcutta, 1916.

Majumdar, Bijaychandra, *The History of the Bengali Language*, Calcutta, 1920.

Majumdar. Dipika, *Ramendrasundar Trivedi : A Study of his Socia and Political Ideas*, Calcutta, 1988.

Majumdar, R. C., *Ancient India*, Delhi, 1974.

Majumdar R. C. (ed.) *History of Bengal*,Vol. I, Dacca, 1943.

Malalasekara, G. P. (ed.), *Encyclopaedia of Buddhism*, Ceylone, 1966.

Mitra,Debala, *Buddhist Monuments*, Calcutta, 1971.

Mitra, Rajendralal, *Antiquities of Orissa*, Vol. I & II, Calcutta, 1875, 1880.

,, *Astasahasrika, A Collection of discourse on the metaphysics of the Mahayaa School of the Buddhists*, Calcutta, 1888.

,, *Buddha Gaya,The Hermitage of Sakyamuni*, Calcutta, 1878.

,, *Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal*, Part-I, *History of the Society*, Calcutta, 1884.

,, *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the library of Asiatic Society of Bengal*, Part- I : *Grammar*, Calcutta, 1877.

,, *Indo-Aryans*, Vol. I, London, 1881, Vol-II, Calcutta, 1881.

,, *Notices of Sanskrit manuscrupts*, Vol. I, Calcutta, 1871.

,, "On a land grant of Mahendrapala Deva of Kanauj", *JASB*, XXXIII, 1864.

,, *A Report on Sanskrit Manuscripts in Native Libraries in Bengal*, Calcutta, 1875.

,, "On the ruins of Buddha Gaya", *JASB*, XXXIII, 1864.

,, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Calcutta, 1882.

,, "On the sena Rajas of Bengal as commemorated in an inscription from Rajshahi", *JASB*, XXXIV, 1875.

Mukherjee, S.N., *Sir William Jones : A Study in Eighteenth Century British Attitudes to India*, Cambridge, 1968.

Niyogi,Puspa, *Buddhism in Ancient Bengal*, Calcutta, 1980.

Ray Chaudhuri, Hemchandra, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1972.

,, Studies in Indian Antiquities, Calcutta, 1958.

Raychaudhuri,Tapan, *Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, New Delhi, 1988.

Roy, N. R. and Chakravarti, P. N., *Studies in Cultural Development in India* (Collection of Essays in Honour of Prof. Jagadish Narayan Sarkar), Calcutta, 1991.

Rawson, Philip S., *Tribes and Castes of Bengal : Ethnographic Glossary*, Vol. I, Calcutta, 1891.

Roerich, George N., *The Blue Annals*, Delhi, 1979.

Royal Asiatic Society of Bengal, *Sir Willam Jones : Bicentenary of his Brith, Commemoration Volume, 1747-1946*, Calcutta, 1948.

Sankrityayan, Rahul and others (ed.), *Buddhism : The Marxist Approach*, New Delhi, 1985.

Sarkar, J.N. (ed.), *The History of Bengal*. Vol.-II, Dacca, 1972.

Sarkar, Sumit, *Writting Social History*, Delhi, 1997.

Sarkar, Susobhan, *Bengal Renaissance and other Essays*, New Delhi, 1981.

Sehoff, W. H. (ed.), *Periplus of the Erythraean Sea*, London, 1912.

Sen Mujumdar, Gayatri, *Buddhism in Ancient Bengal*, Calcutta, 1983.

Sircar, D. C., *Cosmography and Geography in Early Indian Literature*, Calcutta, 1967.

Smith, Vincent A, *The Oxford History of India*, 4th Edn., London, 1967.

Smith. Adam, *The Wealth of Nations* (1776), Edwin Canon Edn., New York, 1937.

Thapar, Romila, *Asoka and the Decline of the Mauryas*, Oxford, 1963.

,, *A History of India*, Vol. -I, London, 1966.

Waddell, L. Austine, *Buddhism and Lamaism*, New Delhi, 1974.

Williams, M, M., *A Sanskrit -English Dictionary*, Reprinted, London, 1974.

অনুক্রমণী